আবু লুবাবা শাহ মানসুর

ফিলিস্তিনের ইতিহাস : অতীত ও ভবিষ্যতের দর্পণে

# আকসার কান্না



Scanned by CamScanner

আবু লুবাবা শাহ মানসুর

# আকসার কান্না

[ফিলিস্তিন ও বায়তুল মাকদিসের ইতিহাস : ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র]

Scanned by CamScanner

# আকসার কান্না

[ফিলিস্তিন ও বায়তুল মাকদিসের ইতিহাস : ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র]

আবু লুবাবা শাহ মানসুর

অনুবাদ : মহিউদ্দিন কাসেমী

সম্পাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

Scanned by CamScanner

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৬০, US $ 16. UK £ 11

প্রচ্ছদ : ওসামা আদনান

প্রকাশক
**কালান্তর প্রকাশনী**
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

**ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র**
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
**নহলী**, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
**রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 90472 7 8

**Aqsar Kanna**
by **Abu Lubabah Shah Mansoor**

Published by
**Kalantor Prokashoni**
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
**www.kalantorprokashoni.com**

**All Rights Reserved**
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Scanned by CamScanner



# উৎসর্গ

বুদ্ধিমান মানুষেরা অনেক সময় মিথ্যা বলে।
একজন বিচক্ষণ মানুষড়
যাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, শ্রদ্ধেয় পিতা
**আবু বকর মুহাম্মদ সিদ্দীক**

*—অনুবাদক।*



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

# প্রকাশকের কথা

মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর। মুসলিমবিশ্বে এক সুপরিচিত নাম। তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অনলাইন ঘেঁটে খুব বেশি কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর জীবন্ত কাজগুলোই ভারত উপমহাদেশে তাঁকে এনে দিয়েছে আকাশচুম্বী খ্যাতি ও মর্যাদা। শেষ জামানার ফিতনা সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলো বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। তাঁর এমনই এক অনবদ্য গ্রন্থ *আকসা কে আঁসু*; যার অনুবাদ আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ *আকসার কান্না*।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মহিউদ্দীন কাসেমী। এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। প্রথম হিসেবে অনুবাদে কাজটি অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।

গ্রন্থটির সম্পাদনা করতে গিয়ে আমাদের বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। মূল বইয়ের প্রুফে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভুল থেকে যাওয়ায় বেশ কিছু জায়গায় এর অনুবাদও এসেছিল ভুল। আবার কিছু বিষয় ছিল এমন, যেগুলোতে টীকা সংযোজন না করলে সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্ভেদ্য মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। এমনও কিছু বিষয় আছে, যেগুলোতে খোদ লেখকই টীকা সংযোজন করেননি বা প্রয়োজনীয় রেফারেন্স সংযোজন করেননি। লেখক কেন এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এভাবে এড়িয়ে গেছেন, তা আমাদের বোধগম্য হয়নি। অন্যদের দ্বারা সংযোজিত অতিরিক্ত টীকা প্রায়শই পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে; বিধায় আমরাও একান্ত প্রয়োজনীয় জায়গাগুলো ছাড়া খুব বেশি টীকা সংযোজন করিনি।

আমাদের সম্পাদনা পরিষদ ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ঘেঁটে যথাসম্ভব সঠিক তথ্যগুলো তুলে এনেছেন। বিশেষ করে ইংরেজি নামগুলোতে অনেক ভুল ছিল। দীর্ঘ সময় নিয়ে সেগুলো ঠিক করতে গিয়েও বেশ ঝক্কির শিকার হতে হয়েছে। এরচেয়ে বড় সমস্যা যা দেখা দিয়েছিল—বইটি প্রথমবার আলী হাসান উসামা সম্পাদনা করার পর দুর্ঘটনাবশত ফাইলটি নষ্ট হয়ে যায়। ব্যাকআপ ফাইল থেকে এর এক-চতুর্থাংশ উদ্ধার করা গেলেও বাকিটা সময় নিয়ে পুনরায় সম্পাদনা করতে হয়েছিল। বইয়ের সম্পাদনায় আলী হাসান উসামা এবং প্রুফ-সমন্বয়ের কিছু বিষয়ে হাফিজুর রহমান সহযোগিতা করেছেন। প্রুফ-সমন্বয় এবং

Scanned by CamScanner

সম্পাদনা শেষ হওয়ার পর আলী হাসান উসামা পুরো বইটি আবারও নিরীক্ষণ করেছেন। আল্লাহ সবাইকে তাঁদের শান অনুযায়ী উত্তম প্রতিদান দান করুন।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করার পরও বইয়ের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে শতভাগ গ্যারান্টি দিতে পারি না। আমরা দুর্ভেদ্য জায়গাগুলোতে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছি। আর এটা আমরা করেছি সাধারণ পাঠকদের কাছে বইটি সুখপাঠ্য করার জন্য। আমরা চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করিনি। অনুবাদ অনেক আগে শেষ হয়ে গেলেও বই প্রকাশে দেরি হওয়ার এটাই ছিল মূল কারণ।

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, বইয়ে কোনো ধরনের ত্রুটি বা অসামঞ্জস্য নজরে পড়লে আমাদের অবগত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলো শুধরে নেব এবং আপনাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ থাকব।

**আবুল কালাম আজাদ**
সম্পাদক ও প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮

Scanned by CamScanner

# লেখকের কথা

## সোনালি মুক্তা

সাধারণত কাগজের বুকে কলমের কালিতেই বই লেখা হয়। তেমনই কাগজের সমারোহে এটিও একটি বই। কিন্তু এর আলোচনাগুলো কলমের কালির নয়; বরং কলজে নিংড়ানো রক্তে লেখা কথামালায় সাজানো।

বায়তুল মাকদিস আমাদের এমন সম্মানিত ঐতিহ্য; যার সংরক্ষণ এবং দেখাশোনার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা আমাদের দিয়েছেন। ইহুদি-নাসারারা যখন এ সম্মানিত ইবাদাতখানার পবিত্রতা রক্ষা না করে তাঁর পবিত্র পরিবেশকে পাপের বিষাক্ততায় ভরিয়ে তোলে এবং বারংবার সতর্ক করার পরও অন্যায় কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে তখন মহান প্রতিপালক তাদের নির্বাচিতদের তালিকা থেকে বঞ্চিত করে উম্মাতে মুহাম্মাদির ওপর এ পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেন।

যে দিন থেকে সাহাবায়ে কিরাম রা. আসমানি সাহায্যে বায়তুল মাকদিস বিজয় করেছিলেন, সে দিন থেকেই এ আমানত আমাদের আত্মমর্যাদা এবং ইমানের পরীক্ষার কষ্টিপাথরে পরিণত হয়েছে। বায়তুল মাকদিসের সংরক্ষণের ব্রত পালনে যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হতে পারার মধ্যে আমাদের উন্নতির স্থায়িত্বের মূলমন্ত্র নিহিত রয়েছে। একইভাবে তার পবিত্রতায় একটু আঁচড়ই আমাদের নির্বাচিত উম্মাত হওয়ার মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে দিতে পারে।

আল্লাহর অপার মহিমায় আমরা এমন একটি যুগে বসবাস করছি, যখন কপালপোড়া ইহুদিদের ছোঁয়া এ পবিত্র ভূমির আঙিনাকে স্পর্শ করছে। যার স্পষ্ট অর্থ হলো, হক-বাতিলের এমন মহাযুদ্ধ আমাদের সামনে অপেক্ষমাণ, যেখানে আমরা হকের পক্ষে অংশ নিয়ে অফুরন্ত সাওয়াবের পাশাপাশি সৌভাগ্যের তিলক নিজেদের ললাটে নিশ্চিত করতে পারি আর সেটিই হবে আমাদের মুক্তির সনদ।

সাধারণত বলা হয়, আমাদের মাঝে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নেই, যার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা সম্ভব। বাস্তবতা হচ্ছে, আইয়ুবি তো অনেক আছে; কিন্তু এমন নুরুদ্দিন জঙ্গি নেই, যিনি সালাহুদ্দিনকে সুলতান সালাহুদ্দিনে পরিণত করবেন। আমাদের

Scanned by CamScanner

মধ্যে কাদির খান অনেক আছে; কিন্তু তাকে ডক্টর আবদুল কাদির খানে পরিণত করবে—এমন কারিগরের বড়ই অভাব। অপরদিকে কোনো অচেনা তারকা নিজের আলোতে কখনো দীপ্তিমান হতে চাইলে সাধারণত তাকে অবজ্ঞা-অবহেলাই করা হয়। আমাদের উচিত, এ ধ্বংসাত্মক আচরণ পরিহার করে যোগ্যকে উৎসাহ প্রদান ও ব্যক্তি গঠনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মাটি বড় উর্বর প্রিয়, অপেক্ষা শুধু সিঞ্চনের।

এ জগতের সবচে বড় ফিতনা হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা। এ ফিতনার কেন্দ্রভূমি হবে সেই পবিত্র ভূমি। আবার সেই ফিতনার বিনাশ ও সমাপ্তিও হবে এ ভূমিতেই। এ ফিতনার প্রারম্ভিকতা আমরা ইতিমধ্যে দেখতেই পাচ্ছি। আর যারা তাকওয়া ও জিহাদি বলে বলিয়ান হয়ে মাঠে নামবে, তাদের সফলতাও আমরা দেখতে আশাবাদী। সৌভাগ্যবান তারা, যারা কিনা এ ফিতনার বিরুদ্ধে লড়াকু সৈন্যদের সহযোদ্ধা হবে। এ সামান্য অশ্রুর নজরানা সেই মহামানবদের জন্যই।

আশাবাদী থাকব, যেন এ অশ্রু অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের না হয়; বরং এ অশ্রু যেন হয় বিধ্বংসী বিস্ফোরকের ফিউজতুল্য। যে অশ্রুতে থাকবে না মৃত্যুর শীতলতা; বরং সে তপ্ত অশ্রুতে থাকবে অগ্নিকুণ্ডের বিভীষিকা।

অশ্রুবিন্দুর এক ফোঁটা হবে মসজিদে আকসার নামে, যা ছিল সর্বোচ্চ সম্মানিত বান্দাগণের সিজদাবনত হওয়ার স্থান। আরেক ফোঁটা সঞ্চিত থাকবে সোনালি গম্বুজ—Dome of the Rock (ডোম অব দ্য রক)-এর ওই সোনালি মুক্তার নামে, যার আশেপাশে পবিত্র মহামানবেরা সারিবদ্ধ হয়ে দাজ্জালের ফৌজের বিরুদ্ধে ত্যাগের বীরত্বগাঁথা রচনা করবেন। আল্লাহ আমাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

**আবু লুবাবা শাহ মানসুর**
১ মুহাররাম, ১৪২৮

Scanned by CamScanner

# সূচি


| | |
|---|---|
| মসজিদে আকসা | ১৩ |
| একজন মুতাসিম বিল্লাহর খোঁজে | ২১ |
| ফিলিস্তিনের স্মরণ | ২৬ |
| জেরুসালেমের স্মৃতি | ৩৩ |
| আল কুদুস | ৩৯ |
| পাথরটি সম্মানিত কেন? | ৪৭ |
| দাউদ আ.-এর সিংহাসনের পুনরুত্থান | ৫৫ |
| টাইগ্রিস থেকে নীলনদ | ৬১ |
| সুয়েজ খালের পাড়ে | ৬৬ |
| ফিলিস্তিনের সমস্যা | ৭০ |
| জেরুসালেম থেকে ব্যাবিলন | ৮৪ |
| ইসরাইল শব্দের অর্থ কী | ৮৭ |
| ব্যাবিলন থেকে জেরুসালেম | ৯৪ |
| দুই ডাক্তারের গল্প | ১০০ |
| আগামী বছর জেরুসালেমে | ১০৭ |
| রহস্যময় বর্ণের ব্যাখ্যা | ১৯৩ |
| জাতীয় গাদ্দারদের উপাখ্যান | ১২৭ |
| ফিলিস্তিন বিক্রেতাদের গল্প | ১৩৩ |
| চক্রান্তের শুরু | ১৩৯ |
| রোম থেকে তেলআবিব | ১৪৮ |
| আহ ফিলিস্তিন! | ১৫৩ |
| ফিলিস্তিনি মুজাহিদের সাথে এক বিকেল | ১৬২ |
| হে আমার গোত্রের লোক | ১৭২ |
| দুটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত | ১৮০ |
| অন্বেষণের সফর | ১৮৮ |
| বিচ্ছুর চক্রান্ত | ১৯৪ |


Scanned by CamScanner

বহুরূপী ব্যক্তি ১৯৯
ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ২০৫
দাউদি পাথরের আঘাত ২১১
সুলায়মানি কাঠামো : রূপকথা না বাস্তবতা ২১৬
সামেরির গো-বৎস ২২২
বৃহত্তর ইসরাইল বলতে কী বোঝায় ২২৩
আল কুদুসের আত্মত্যাগীদের স্মরণ ২২৭
হে বনি ইসরাইল ২৩৩
লুদ-এর দরজায় ২৪৯
কাসাব্লাংকা থেকে ইসরাইলের রাজধানী ২৫৬
গাস এমিউনিম (Gush Emunim) ২৬৫
তাওরাত কী বলে ২৭৭
নিকৃষ্ট শত্রু যখন উত্তম বন্ধু ২৮২
কিয়ামাতের ছায়া ২৮৮
অত্যাচারীদের কে বোঝাবে? ২৯৩
শেষ প্রত্যাবর্তন ২৯৭
'পশ্চিমা বিশ্ব সমগ্র ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের কর্তৃত্ব...' ৩০৬
ইসলামি বিশ্বের সামনে নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ৩১৫
তরবারির ছায়ায় ৩২০



Scanned by CamScanner

# মসজিদে আকসা

মসজিদে আকসা মুসলমানদের সম্মানের প্রতীক, বিজয়ের চিহ্ন। সম্প্রতি ইহুদিরা অসহায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে রচিত হিংস্র হামলায় ট্যাংক ও গানশিপ হেলিকপ্টার ব্যবহার করে মসজিদে আকসায় মুসলমানদের রক্তনদী প্রবাহিত করেছে; যা দেখে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানরা রক্তাশ্রু প্রবাহিত করতে বাধ্য হয়েছে। *জরবে মুমিন* ইতিহাসের এ স্পর্শকাতর সন্ধিক্ষণে নিজেদের কর্তব্য আদায়ের জন্য বিশ্লেষণধর্মী আঙ্গিকে বিপ্লবাত্মক ইতিহাসের তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক আলোচনার অবতারণা করছে; যার মধ্যে এ পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের মর্যাদা ও গুরুত্ব থেকে শুরু করে এ সম্মানিত হারামের পরিচয় ও ইতিহাস তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনে ইহুদি শাসন প্রতিষ্ঠার অবৈধ প্রয়াস, এমনকি বায়তুল মাকদিসকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জঘন্য মানসিকতাসহ ভয়াবহ চক্রান্তের স্বরূপ উন্মোচন করা হবে। এখানে পাঠকেরা এমন নির্ভরযোগ্য তাত্ত্বিক আলোচনা ও রোমহর্ষক রহস্যের সন্ধান পাবেন, যা ইতিপূর্বে কোনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এ লেখাগুলো শুধু একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেই নয়; বরং জিহাদি জজবার প্রাণভোমরারূপে এবং জাগরণের মূলমন্ত্র হিসেবে ইনশাআল্লাহ যুগ যুগ ধরে বিবেচিত হবে।

## বিশ্বাসঘাতকতা

এতে কোনো সন্দেহ নেই, বিশ্বাসঘাতকতা একটি মন্দ অভ্যাস। শিষ্টাচার এবং সুশীলসমাজের চোখে বিশ্বাসঘতকতা চূড়ান্ত পর্যায়ের নিন্দিত একটি স্বভাব। বর্তমান যুগের মুসলমানরা বায়তুল মাকদিসের সাথে যে ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অমানবিকতা প্রদর্শন করেছে, ইতিহাসে তার উপমা খুঁজে পাওয়া দুরূহপ্রায়। মসজিদে আকসা মুসলমানদের তৃতীয় সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান। তার রক্ষণাবেক্ষণ, অপবিত্র ইহুদি-নাসারাদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা মুসলমানদের সর্বোচ্চ জিম্মাদারি। কিন্তু বায়তুল মাকদিসের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক শুধু এতটুকুই

Scanned by CamScanner

অবশিষ্ট রয়েছে—বছরে একবার মিরাজের আলোচনা করতে গিয়ে এ ঐতিহাসিক স্থানের আলোচনা করা হয়, অথবা ইসরাইলের পক্ষ থেকে তার অসম্মানের কোনো সংবাদ পত্রিকায় এলে মুসলিম যুবক ঘুমকাতুরে মানুষের মতো শুধু তা শুনে রাখে।

এতদভিন্ন তার অন্তরে আর কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না। এ লজ্জাজনক ঘটনা, যা কিনা তার জীবনকালেই ঘটে যাচ্ছে, এতে তার ভেতরে কোনো অনুভূতি খেলা করে না। পৃথিবীর সবচে ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত জাতি ইহুদিরা শুধু তা দখল করে এবং বহিরাগত সকল মুসলমানের জন্য সেখানে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্তি দেয়নি; বরং সেখানে রীতিমতো তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতি-আচারপ্রথা পালন করা আরম্ভ করেছে। আজ হয়তো তারা সেখানে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের প্রবেশ করার সুযোগ দিচ্ছে; কিন্তু তাদের অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সক্ষমতা আর মুসলমান শাসকদের উপলব্ধিহীনতা এ আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে, অচিরেই তারা সকল মুসলমানের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে বায়তুল মাকদিসকে একমাত্র নিজেদের উপাসনালয় হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করবে।

## অবস্থার ভয়াবহতা

মিরাজের রাত্রিকে আমরা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করি; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মিরাজের কেন্দ্রবিন্দু মসজিদে আকসা ইহুদিদের দখলে চলে যাওয়ার শোক সেদিন কেউ পালন করে না। মিরাজের রাত্রিতে আমাদের এখানে মসজিদগুলো আলোয় ঝলমল করে; কিন্তু ঠিক একই সময়ে মসজিদে আকসার ওপর ঘন কালো আঁধার এবং ইহুদিদের রাজত্ব ছেয়ে থাকে।

মিরাজ উপলক্ষে আমাদের মসজিদগুলোতে বড় ধরনের লোক সমাবেশ হয়; কিন্তু মসজিদে আকসার শোকার্ত পরিবেশে তখন শুধু নির্জনতার সমাগম ঘটে। শবে মিরাজকে আমাদের মুসলিম সমাজে শরিয়তের কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হলেও মিরাজের সন্ধিস্থল পবিত্র বায়তুল মাকদিস রক্ষার জন্য জিহাদকারীদের ন্যূনতম মর্যাদাও দেওয়া হয় না। আমাদের বক্তারা মিরাজের ঘটনার বৃত্তান্ত এবং শবে মিরাজের মর্যাদা ও গুরুত্বের আলোচনা করতে গিয়ে রাত কাটিয়ে দেন; কিন্তু এ পবিত্র ভূমির ওপর যে শোকের আঁধারকালো রাত্রি ছেয়ে আছে তার সমাপ্তি কবে হবে, কীভাবে হবে—তার আলোচনা কোনো বক্তাই করেন না। সে প্রগাঢ় অন্ধকারকে দূর করে বিজয়ের সোনালি সকাল নিকটবর্তী করার ভাবনা কেউই ভাবেন না।

Scanned by CamScanner

ইহুদিরা বারবার চাপ প্রয়োগ করছে, যেন মুসলমানরা বায়তুল মাকদিসের দাবি ছেড়ে দিয়ে জেরুসালেমের বাইরে 'আবু দেস' নামক গ্রামকে সম্মানিত ভূমি হিসেবে গ্রহণ করে। এ জন্য তারা ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ওপর সব ধরনের চাপ প্রয়োগ করছে, নির্যাতন এবং বলপ্রয়োগ করে তাদের এটা মেনে নিতে বাধ্য করছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের না এটা জানা আছে, আর না তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য কোনো উদ্যোগ আছে।

ইহুদিরা ফিলিস্তিনের সীমানাকে বিশ্ব মুসলিমের জন্য চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরের কোনো মুসলমান সেখানে কোনোভাবেই প্রবেশ করতে পারছে না। ফিলিস্তিনের নিরীহ মুসলমানরাও উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। মসজিদে আকসার একটি দেয়ালকে তারা নিজেদের ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছে। বায়তুল মাকদিসের জায়গায় সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের নামে পবিত্র কাঠামোকে ধ্বংস করতে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কিন্তু অবস্থার প্রচণ্ড ভয়াবহতার অনুভূতিটুকুও আমাদের নেই। ইহুদিদের গুলি ও ট্যাংকের বিরুদ্ধে পাথর এবং গুলতি নিয়ে প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়া নিরীহ ফিলিস্তিনিদের অসহায়ত্ব এবং অক্ষমতার অনুভূতিও নেই। এ অবস্থায় মসজিদে আকসা চিৎকার করে আমাদের ডাকছে—হে মুসলমানরা, তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধের কী হলো? শুধু নামাজ আদায় করেই কি তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে? ইসলামের প্রতীকসমূহ সংরক্ষণ না করেই কি তোমাদের মর্যাদা রক্ষা হবে? মসজিদে আকসার পর অন্য মসজিদগুলোর নিরাপত্তা কি বহাল থাকবে? কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের অবস্থার ওপর আনন্দেই রয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে জুমআ এবং ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ, শবে মিরাজ উদযাপনই হচ্ছে ইসলামের সাথে পরিপূর্ণ সম্পর্ক রাখার মাপকাঠি।

এ কাজগুলো যে সঠিকভাবে করবে, পরকালে মসজিদে আকসা সম্পর্কে তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না, নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের পক্ষে অভিশপ্ত ইহুদিদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারেও তাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। মুসলমানরা ভাবছে, ইহুদিদের এ অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কোনো ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা তাদের ওপর ফরজ নয়। করুণ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিতকারী অত্যাচারিত মা-বোনের জন্য, হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরানো আহত যুবকদের জন্য কিছু করা তাদের ধর্মীয় ও মানবিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়।

Scanned by CamScanner

# ঝড়ের পূর্বাভাস

বিক্ষুব্ধ ঝড়ের পূর্বে যেমনিভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে একধরনের চাপা শান্ত ভাব বিরাজ করে, তেমনিভাবে কিছুদিন যাবৎ ফিলিস্তিনে হানাদার ইহুদিদের কোনো ধরনের বড় অভিযানে লিপ্ত না হওয়া মূলত একটি বিধ্বংসী পরিকল্পনার পূর্বাভাস ছিল; যা অতীতে মসজিদে আকসায় সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনা স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত সকল মুসলমানের অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল; যা রীতিমতো চোখে আঙুল দিয়ে উম্মাতে মুসলিমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল—নিরীহ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সুবিচার এবং মসজিদে আকসার পুনরুদ্ধার গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে অর্জিত হবে না; জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের নজরানা দিয়েই তা অর্জন করে নিতে হবে। আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকার মাধ্যমে তার কোনো সমাধান আসবে না, মিছিল-মিটিং করেও তা অর্জন করা যাবে না; বরং অদৃশ্য শক্তির ওপর ভরসা রেখে ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে দিতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে সচেষ্ট হতে হবে।

২২ হাজার মুসলমানের সমাবেশে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করে তাদের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের মসজিদ ত্যাগ করতে বাধ্য করার সাহস অভিশপ্ত ইহুদিরা কোত্থেকে পেল? এর কারণ কি শুধু এই নয় যে, তারা মুসলমানদের নিরস্ত্র থাকতে বাধ্য করতে পেরেছে এবং অপরদিকে ইহুদি সৈনিকরা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রতিটি নাগরিক সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে গড়ে উঠেছে।

ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মধ্যেও জিহাদি জজবার ঘাটতি নেই; কিন্তু তাঁদের যেসব নেতৃবৃন্দ বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে, তারা অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য আর জিহাদি জজবাশূন্য। তাই ইহুদি আগ্রাসনের মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করা, তার প্রতিরোধে সময়োপযোগীভাবে ফিলিস্তিনিদের প্রস্তুত করার পদক্ষেপ না নিয়ে তারা নামসর্বস্ব কমিটি গঠন করে আলোচনার নামে যে সময়ক্ষেপণ করছে, তা একদিকে মুসলিমবিশ্বকে প্রতারিত করছে, অন্যদিকে ইহুদি গোষ্ঠীকে নিজেদের আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে।

ফিলিস্তিনি জনসাধারণ এবং জিহাদি জজবায় উদ্বুদ্ধ আলিমগণের মাধ্যমে পরিচালিত সংগঠনগুলো কোনো ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছে না। সারা পৃথিবীর দানশীল ব্যক্তিবর্গের সাথেও তাদের যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই। এভাবেই একদিকে সাধারণ ফিলিস্তিনিরা অসহায়ত্বের গ্লানি নিয়ে ইহুদিদের

Scanned by CamScanner

জালে আবদ্ধ হচ্ছে। অন্যদিকে আল্লাহর অভিশপ্ত, নবিদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণকারী ইহুদিরা ধীরে ধীরে নিজেদের অন্যায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

## শেষাবধি এতটা অবহেলা কেন?

এবার ইহুদিরা যে নৃশংস পন্থা অবলম্বন করেছে, তা তাদের ইচ্ছা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। এবার তারা শুধু মসজিদে আকসার ভেতরে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং গানশিপ হেলিকপ্টারের মাধ্যমে রকেট হামলা করে মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, ট্যাংক নিয়ে রাজপথে নেমে বেসামরিক মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে সরাসরি হামলা করে তাদের প্রতিবাদকে দমিয়ে দিয়েছে। তাদের আচরণের উগ্রতা কোনো বড় ধরনের পরিকল্পনার ভূমিকা বলে মনে হচ্ছিল। এতদিন চুপচাপ থেকে ইহুদিরা মূলত অভিযানের পটভূমি তৈরি করছিল এবং মুসলমানদের প্রতিবাদের তীব্রতার হিসাব কষছিল।

ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমির প্রতি অন্যান্য মুসলমানদের অমনোযোগিতা এবং ফিলিস্তিনের মুসলমানদের অসহায়ত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই তারা এ ধরনের ভয়াবহ অভিযান পরিচালনা করে। এ অভিযানের ভয়াবহ বিবরণে যুবকদের ধরে ধরে ব্রাশফায়ার, নারী ও শিশুদের ভয়াবহ আর্তনাদ এবং ফিলিস্তিনি নাগরিকদের অসহায়ত্বের যে দৃশ্য ফুটে ওঠে তা রীতিমতো মানবহৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়, কলজে দীর্ণ করে অন্তরাত্মাকে প্রতিশোধ-স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

হে মুসলমানরা! একটু চিন্তা করো। আর কী দেখতে চাও? বাবরি মসজিদের ক্ষত এখনো শুকায়নি, এরই মধ্যে আজ পবিত্র ভূমি আক্রান্ত। জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হও। লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দাও। নির্যাতিত নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়াও। নিরীহদের ডাকে সাড়া দাও। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তা নিয়েই এ নির্যাতিত ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের পরিত্রাণের পথ সুগম করো।

পৃথিবীর সকল ইহুদি আজ ইসরাইলকে তাদের স্বপ্নভূমি মনে করে তার উন্নতির জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছে। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য ব্যর্থতাই নির্ধারিত। তাহলে কেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের স্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা আজ অসহায় ফিলিস্তিনিদের ভুলে বসে আছে?

Scanned by CamScanner

## শাসকদের অনাগ্রহ

এ ব্যাপারে সবচে বড় দায়িত্ব ছিল মুসলমান শাসকদের। জনসাধারণ তো শুধু প্রতিবাদ কর্মসূচি দিতে পারে; কিন্তু বাস্তবিকভাবে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের পক্ষে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখা মুসলমান শাসকদের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ইসরাইলের সীমাহীন নির্যাতন এবং তা রোধ করার কার্যকারী পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা সত্ত্বেও শুধু আমেরিকার ভয়ে তাদেরই পালিত বন্য শূকরের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলছে না। তারা ভয় পাচ্ছে, আমেরিকাকে ক্ষেপিয়ে তুললে যদি তাদের নিজেদের সিংহাসনেই আগুন লেগে যায়।

আল্লাহর শপথ, এ জঘন্য অত্যাচার দেখেও মুখে কুলুপ এঁটে থাকা এত বড় অন্যায় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হবে, যার শাস্তি এ পৃথিবীতেই ভোগ করতে হবে। আমেরিকার রোষানলে পড়ে তো আল্লাহর আশ্রয় নেওয়া যায়; কিন্তু আল্লাহর প্রকোপে পড়লে কি কোথাও আশ্রয় নেওয়া সম্ভব?

## এ পুষ্পোদ্যানের ভবিষ্যৎ কী?

এ সময়ে মুসলিম উম্মাহ এতটাই বিভ্রান্তির শিকার এবং নিরুপায় যে, এত বড় একটি ভয়ানক ঘটনায় শোকবার্তা আর মৌখিক প্রতিবাদ কর্মসূচি ব্যতীত কার্যকারী কোনো প্রতিরোধই তারা গড়ে তুলতে পারেনি। অন্যদিকে অমুসলিম শক্তিগুলো ইসরাইলের সাথে নিজেদের এতটাই একাত্ম করেছে, শুধু ফিলিস্তিনের মুসলমানরা কেন, আরব-অনারব কোনো রাষ্ট্রই তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারছে না। সবাই শুধু গোলটেবিল বৈঠকের প্রতি গুরুত্বারোপ করছে এবং তাতেই সফলতার প্রত্যাশা করছে। অথচ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো জাতি তাদের পাওনা গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে বুঝে পায়নি। আর ইহুদিদের মতো প্রতারক জাতি যদি গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমেই মুসলমানদের পাওনা তাদের বুঝিয়ে দিতে চাইত তাহলে ইসরাইল নামক জারজ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই করত না।

ফিলিস্তিনের মুসলমানরা তো সাহস হারিয়ে ফেলেনি। অত্যাধুনিক অস্ত্রের মোকাবিলা তারা গুলতি দিয়ে হলেও করে যাচ্ছে। আর তাদের কাছে এমন একটি অস্ত্র রয়েছে, যা এমন সময় কাজে আসে, যখন অন্য সকল অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়; আর তা হচ্ছে ফিদায়ি হামলা।

Scanned by CamScanner

মসজিদে আকসাকে যদি ফিরে না-ও পাওয়া যায়; কিন্তু তার জন্য জীবনটাকে বিসর্জন তো দেওয়া যায়। আর তারা তা-ই দিচ্ছে। কিন্তু অন্য মুসলমানদের ভাবার বিষয় হচ্ছে, যদি পরিস্থিতি এমন চলতে থাকে তাহলে মুসলিম উম্মাহর এ পুষ্পোদ্যানের কী হবে? এ ভয়াবহ সময়েও যদি ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানো না হয় তাহলে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যেখানেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে, তাদের পরিত্রাণের কী উপায় হবে?

## হে আইয়ুবির সন্তানেরা

হায়, আজ কোনো সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নেই, যে ইতিহাসের গতিপথকে পাল্টে দিতে পারে! কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তো আজও বন্ধ্যা হয়ে যায়নি। আজও সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির উত্তরসূরি জন্ম নিতে পারে। কিন্তু এর জন্য আবশ্যক হচ্ছে, মুসলমান যুবকদের বিনোদনের নামে অশ্লীলতার অন্ধকার জগতে হারিয়ে যাওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করে উন্নত জীবনের সন্ধান দেওয়া, পাপাচারের নোংরামি থেকে বের করে এনে তাদের অন্তরে জিহাদের আলোকিত স্বপ্ন এবং শাহাদাতের তীব্র অভিলাষ তৈরি করা, লাগামহীন জীবনযাত্রার স্বপ্নজগত থেকে বের করে এনে পরহিতের মানসিকতা তৈরি করা, আল্লাহকে ভয় করে সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন করার স্পৃহা জাগ্রত করা। আল্লাহর শপথ, আইয়ুবির এমন কত উত্তরসূরি রয়েছে, যারা আজ নোংরা পৃথিবীর বাঁকে বাঁকে ঘুরপাক খাচ্ছে! এমন কত মুসলমান যুবক রয়েছে, যারা তাদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে মসজিদে আকসার হারিয়ে যাওয়া জান্নাতি পরিবেশ মুসলিম উম্মাহকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম; কিন্তু তাদের জিহাদ ও শাহাদাতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে সরিয়ে লক্ষ্যহীন অশ্লীল বিনোদনের জগতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

হে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির উত্তরসূরি, নিজের যোগ্যতা এবং দায়িত্বের প্রতি আস্থাশীল হও। মসজিদে আকসার শোকার্ত আর্তনাদে ব্যথিত হও। হতভাগা ইহুদিদের পরাস্ত করার প্রস্তুতি নাও। অন্যথায় যেভাবে এ পৃথিবী আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছে, কবরও হয়তো আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসবে।

হে মসজিদে আকসা, ওই সত্তার শপথ, যিনি তোমাকে সম্মানিত করেছেন, তোমার সন্তানেরা তোমার সম্মান ফিরিয়ে দিতে জীবনবাজি রাখতে অবশ্যই

Scanned by CamScanner

আসবে। যদি তোমার কাছে না-ও আসতে পারে, তবুও তোমার চতুর্পার্শ্বে নিজেদের রক্তাক্ত দেহকে এমনভাবে বিছিয়ে দেবে, যা পাড়ি দিয়ে তোমার শত্রুরা তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না।

## সমাধান কোন পথে?

পৃথিবীর বুকে আজ সবচে বেশি নির্মমতার প্রদর্শনী চলছে ফিলিস্তিনের বুকে। ফিলিস্তিনের শত বছরের স্মৃতিবিজড়িত আরব নাগরিকদের দিনে দিনে গৃহহীন করে দেওয়া হচ্ছে। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পৃথিবীর তাবৎ ইহুদিদের সেখানে নিয়ে ইসরাইলি রাষ্ট্রকে বর্ধিত করে স্থানীয় আরবদের নির্যাতনের শিকার বানানো হচ্ছে।

ফিলিস্তিনের ওপর স্থানীয় আরবদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এ তথ্যগুলো মৌলিক ভূমিকা রাখতে পারে। এ তথ্যগুলো ইসলামি ইতিহাসের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব সাউদি বাদশাহ শাহ ফয়সালের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রদত্ত বক্তব্যে ফুটে উঠেছিল।

- ইহুদিরা ফিলিস্তিনের আদি বাসিন্দা নয়।
- ইহুদিরা ছিল মূলত ফিলিস্তিনের হানাদার, যারা অল্প কিছুদিন পরেই বহিষ্কৃত হয়েছিল।
- ফিলিস্তিনে তাদের অবস্থানকাল খুবই স্বল্প ছিল।
- হজরত সুলায়মান আ. থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কখনো ফিলিস্তিনে ইহুদি রাজত্ব ছিল না।
- ফিলিস্তিনে কখনো ইহুদিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না।
- যখন ফিলিস্তিন থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করা হয়েছিল, তখন সেখানে শুধু স্থানীয় অধিবাসীরাই ছিল, যারা শুরু থেকে সেখানে বসবাস করে আসছে।
- ১৬০০ বছরের ইতিহাসে ফিলিস্তিনে কখনো ইহুদি বসতি ছিল না।
- সপ্তম শতক থেকেই ফিলিস্তিনে আরবদের রাজত্ব ছিল।
- ফিলিস্তিনের প্রাচীন নির্মাণশৈলী আজও সেখানে মুসলমানদের অতীতের স্মৃতি বহন করে।

Scanned by CamScanner

# একজন মুতাসিম বিল্লাহর খোঁজে

## আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি

অসহায় সেই নারীর আর্তনাদ যতটাই তীব্র হচ্ছিল দানবের মতো, ততটাই গগনবিদারী স্বরে হেসে যাচ্ছিল ইউরোপীয় রোম শহরের লোকটি। তীব্র একটি চপেটাঘাত সম্ভ্রান্ত সেই নারীর গাল স্পর্শ করল। নির্যাতনের তীব্রতায় তার মুখ থেকে একটি চিৎকার বের হলো, 'হে মুতাসিম, তুমি কোথায়? হে আমাদের শাসক, কে আমাদের সাহায্য করবে?' লোকটি এ কথা শুনে আরও জোরে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। বিদ্রূপের সুরে বলল, 'হে নির্বোধ মহিলা, তোমার ডাকে কি অর্ধ-পৃথিবীর বাদশাহ সাড়া দেবেন?'

এটা সেই সময়ের কথা, যখন মুসলমানরা নিজেদের একই শরীর ভাবত। এটা সম্ভব ছিল না যে, কেউ একজন বিপদাক্রান্ত হবে বা শত্রুর হাতে বন্দি হবে আর অন্যজন স্বাভাবিক জীবনযাপনে মগ্ন থাকবে! বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর করা পর্যন্ত সে স্বস্তিবোধ করত না। মুতাসিম বিল্লাহ তখন বাগদাদের সিংহাসনের অধিপতি ছিলেন। আর বাগদাদ থেকে হাজার মাইল দূরে রোমের আমুদিয়া নামক কেল্লা থেকে এ নারী চিৎকার করে তাকে ডাকছিল।

মুতাসিম বিল্লাহ যদিও তার পূর্বসূরিদের মতো প্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন না; কিন্তু তার রক্তেও পূর্বপুরুষদের আত্মমর্যাদাবোধ বিরাজমান ছিল। মূলত আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বজাতীয় চেতনায় তৎকালীন সকল শাসকই পরিপূর্ণ ছিলেন। কোনোভাবে মুতাসিম বিল্লাহর কাছে ওই মহিলার আর্তনাদের সংবাদ পৌঁছলে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। সভাসদদের তিনি এ প্রশ্ন করলেন না, ওই দুর্গের মোট সৈন্য কত? বরং তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন, ওই কেল্লা কোথায় অবস্থিত?

এরপর দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে দূর্গের ওপর। উপর্যুপরি আক্রমণে সে দুর্গকে অবরোধ করে ফেললেন।

Scanned by CamScanner

মুসলমানদের আক্রমণের তীব্রতা দুর্গকে কাঁপিয়ে তুলল এবং দুর্গবাসীদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করল। সেই অত্যাচারী ব্যক্তিকে যখন বাদশাহের সামনে উপস্থিত করা হলো তখন তার অনুভূতি হলো, সত্যিই এরা এমন জাতি, যারা নিজেদের একজন সদস্যের জন্য সকলে নিজেদের জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। একজনের দুঃখে অন্য সবাই এমনভাবে ব্যথিত হয়, যেন তাদের নিজেদের শরীরেরই কোনো অংশ আক্রান্ত।

## বর্তমানকালের কথা

মুসলমানদের এ গর্ব করার মতো নীতিকেই আজ বিধর্মীরা নিজেদের অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে। পৃথিবীর কোথাও যদি একজন আমেরিকান নাগরিক বিপদগ্রস্ত হয়, আমেরিকান প্রশাসন নিজেদের সর্বস্ব নিয়ে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা স্বজাতির প্রতি নির্মম অত্যাচারের সংবাদকেও সাধারণ সংবাদের মতো শ্রবণ করে নিত্যকার কাজে স্বাভাবিকভাবে ব্যস্ত থাকে।

বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন কোথাও মুসলমানরা আক্রমণের শিকার হলে ইসলামি বিশ্বে প্রতিবাদের জোয়ার উঠত, উৎসবের দিনগুলোতে আনন্দ উদযাপন বন্ধ করে দেওয়া হতো, নির্যাতিতদের সাহায্য-সহযোগিতার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন করা হতো। কিন্তু যখন থেকে পশ্চিমা মিডিয়া এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি মুসলমানদের মন-মানসিকতায় বস্তুবাদের ইনজেকশন পুশ করল এবং তাদের ভোগ বিলাসে উন্মত্ত করে তুলল তখন থেকে তারা উম্মাহর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে ভোগ-বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলো।

## হয়তো-বা...

ফিলিস্তিনি কন্যারা বুঝতে পেরেছে, তাদের ডাকে কোনো হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বা মুতাসিম বিল্লাহরা সাড়া দেবে না। তারা অনুভব করতে পেরেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শাসকেরা তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি এতটুকু ভ্রূক্ষেপও করবে না, যতটুকু তারা নিজেদের পোশাক পরিপাটি রাখা নিয়ে চিন্তিত। তাই তারা কল্পনার জগতে বসবাস না করে নিজেরাই ময়দানে নেমে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর ফলশ্রুতিতে এই তো সে দিনও দেখা গেল, সম্ভ্রান্ত তিনজন ফিলিস্তিনি যুবতী ফিদায়ি হামলার পথ বেছে নিয়েছে। তারা যেন নিজেদের রক্তাক্ত

Scanned by CamScanner

দেহের টুকরোগুলো দ্বারা সারা বিশ্বের মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। হয়তো-বা কোমলমতি যুবতীদের আত্মত্যাগে কেউ চেতনা ফিরে পেয়ে অবাধ বিনোদনের জোয়ার থেকে ফিরে এসে তাদের মুক্তি-সংগ্রামে পাশে দাঁড়াবে। হয়তো-বা এ আত্মত্যাগে কারও আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে আসবে। হয়তো-বা...! হয়তো-বা...!

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ইসরাইলের অমানবিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে জাপানে প্রতিবাদ হচ্ছে, ফ্রান্সে ইহুদিদের সম্পত্তিতে হামলা হচ্ছে; কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিনের এমন অসহায়ত্বেও তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে না। সম্প্রতি লেবাননে আরব রাষ্ট্রগুলোর বৈঠক হলো, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বৈঠক হলো; কিন্তু তারা ফিলিস্তিনের পক্ষে কোনো কার্যকারী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। সেখানে তারা জাতিসংঘকে অনুরোধ জানাল, যেন তারা তাদেরই লালিত-পালিত লাগামহীন বুনো শূকরকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসে, আর যেন ফিলিস্তিনিদের আর্তনাদ মুসলিম শাসকদের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়।

প্রতাপশালী মুসলিম শাসকদের এ সামর্থ্য হয়নি, তারা অর্থনৈতিকভাবে ইহুদিদের বয়কট করে তাদের ব্যাংকগুলো থেকে নিজেদের মুদ্রাগুলো সরিয়ে নেবে। এতটা দুঃসাহসী তারা হতে পারেনি—ইহুদিদের কাছে তেল রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করবে। তাদের এমন চেতনাবোধ জাগ্রত হয়নি—ইহুদিদের পৃষ্ঠপোষকতাকারীদের আনুগত্যকে বিদায় জানিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের ঐতিহ্য-স্বকীয়তাকে বহাল রাখবে।

একবারও তারা ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানো বা অসহায় ফিলিস্তিনিদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার কথা ভাবেনি। কী আশ্চর্য! মেনে নিলাম, ১ বিলিয়ন মুসলমানের প্রতিনিধি হয়েও কয়েক লাখ ইহুদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস তাদের হচ্ছে না; কিন্তু এরা কি ওই অসহায় নারী ও শিশুদেরও কোনো কাজে আসতে পারে না, যারা আজ শত্রুর বিরুদ্ধে পাথরের মাধ্যমে লড়াই করে যাচ্ছে।

যদি মৃত্যুর ভয় বা সন্ত্রাসবাদের দায়ে দায়ী হওয়ার ভয়ে ফিদায়ি হামলাকারীদের পক্ষে তারা দাঁড়াতে নাই-বা পারে, তবে কি শরণার্থীশিবিরের হাজারও অসহায় নর-নারী ও আহত শিশুদের কোনো কাজেও তারা আসতে পারে না? বাস্তবে আত্মমর্যাদাহীন মানুষ হচ্ছে হাত মোছার টিস্যুর মতো—

Scanned by CamScanner

তাকে ব্যবহার করে যেখানেই ফেলে রাখা হোক না কেন, এতে তার কিছু যায়-আসে না।

হায়, এ উম্মাতের মধ্যে যদি আজ উমর ইবনে আবদুল আজিজ না হোক, অন্তত একজন মুতাসিম বিল্লাহও থাকত তাহলেও ফিলিস্তিনিদের এ করুণ আর্তনাদ আজ আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হতো না।

## ইতিহাসের চোখে বায়তুল মাকদিস

- খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৩০০০ সালে কেনানিরা [জিবুতীয়] বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করেছিল।
- খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫০ সালে হজরত ইবরাহিম আ. এখানে এসেছিলেন এবং এখানের শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।
- খ্রিষ্টপূর্ব ৯৩১ থেকে ৯৭০ সাল পর্যন্ত এখানে হজরত সুলায়মান আ.-এর শাসন ছিল।
- খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে বুখতেনাসারের হাতে বায়তুল মাকদিসের পতন ঘটে এবং ইহুদিরা বন্দি হয়।
- খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৫ সালে রোমের শাসক হাদরিয়ান এ ভূমি থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করে।
- ৪০০ থেকে ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ভূমি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- ১৫ হিজরি মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা এ এলাকাগুলো স্বাধীন করেছিলেন।
- ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ৩ হাজার সাহাবি সম্পূর্ণ শহর বিজয় করেছিলেন এবং এখানের পাদরি সাফরনাওয়িসি শহরের চাবি হজরত উমর ইবনুল খাত্তাবের হাতে তুলে দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছি নিয়েছিল।
- ৪৯৩ হিজরি মোতাবেক ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানরা বায়তুল মাকদিস দখল করে।
- ৫৮৩ হিজরি মোতাবেক ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে হিত্তিনের যুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি খ্রিষ্টানদের পরাজিত করে বায়তুল মাকদিস স্বাধীন করেন।

Scanned by CamScanner

- ৬৫৮ হিজরি মোতাবেক ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে আইনে জালুত যুদ্ধে ফিলিস্তিনকে তাতারিদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়।
- ৯৩৪ হিজরি মোতাবেক ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে বায়তুল মাকদিসকে উসমানি খিলাফাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ১৩৩৬ হিজরি মোতাবেক ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় এবং উসমানি খিলাফাতের সমাপ্তি ঘটে। এতে করে বায়তুল মাকদিস ব্রিটেনের উপনিবেশে পরিণত হয়।
- ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার আওতায় এখানে ইহুদি সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।
- ১৩৬৮ হিজরি মোতাবেক ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়।
- ১৩৮৭ হিজরি মোতাবেক ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের বাকি অংশকেও ইহুদিরা কব্জা করে নেয়।
- ১৪০৭ হিজরি মোতাবেক ১৯৮৭ সালে ইহুদিদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়।

Scanned by CamScanner

# ফিলিস্তিনের স্মরণ

## ঘোলাটে বাস্তবতা

সময়ের বিবর্তন কত চিরন্তন সত্যকেই না ঘোলাটে বাস্তবতায় পরিণত করে দেয়! আর কোনো জিনিসের বাস্তব মালিক যদি সে বস্তুর প্রতি অবহেলা-অবজ্ঞার পরিচয় দেয় তাহলে অনেক সহজেই সে বস্তুটা তার কাছ থেকে অন্যের দখলে চলে যায়। যার বাস্তব উদাহরণ হতে পারে পৃথিবীর ঐতিহাসিক পবিত্র ভূমির মসজিদে আকসা।

মসজিদে আকসা এমন পবিত্র ভূমি, যা সকল নবির ইবাদাতের স্থান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। কত বুজুর্গের কপাল এ মসজিদের আঙিনা চুম্বন করেছিল। কত নবির ওপর এখানে ওহি অবতীর্ণ হয়েছিল। কুরআনে কারিমের ভাষ্যমতে আল্লাহর ধারাবাহিক নিয়ামাতসমূহ সর্বদা এ পবিত্র ভূমিতে বিরাজমান। এখান থেকেই রাসুলে কারিম ﷺ-এর মিরাজের সফর আরম্ভ হয়েছিল। এটি মুসলমানদের প্রথম কিবলা। এক বর্ণনামতে, এখানে এক রাকআত নামাজে ৫০ হাজার রাকআত নামাজের সাওয়াব পাওয়া যায়।[১]

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকের মুসলমানরা এ পবিত্র ভূমির সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত। বহির্বিশ্বের মুসলমানদের জন্য বায়তুল মাকদিসের জিয়ারাত এবং এতে নামাজ আদায় করা নিষিদ্ধ। এখানে আমি জেরুসালেম শহর এবং মসজিদে আকসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পরিচিতি এবং এ ব্যাপারে ইহুদিদের দাবিসমূহের খণ্ডন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। হতে পারে এ আলোচনা কোনো হৃদয়বান ব্যক্তির অন্তরকে নাড়িয়ে দেবে এবং সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে অভিশপ্ত ইহুদিদের রাজত্ব ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

---

[১] আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة

অন্যান্য জায়গার নামাজের ওপর মসজিদুল হারামে নামাজের শ্রেষ্ঠত্ব এক লক্ষ নামাজের সমপরিমাণ। আমার মসজিদে (তার শ্রেষ্ঠত্ব) এক হাজার নামাজের সমপরিমাণ। আর বাইতুল মাকদিসে (তা) পাঁচ শ নামাজের সমপরিমাণ। (মুসনাদুল বাজজার : ৪১৪২। ইমাম বাজজার রাহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।)—*আলী হাসান উসামা*

Scanned by CamScanner

# ইতিহাসের আয়নায় আল কুদুস

আল কুদুস জেরুসালেমের আরবি নাম। যাকে ইসলামপূর্ব সময়ে 'ইলিয়া'ও বলা হতো। এটি ৩১ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ হতে ৩৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ শহরটি ভূমধ্যসাগর হতে ৭৫০ মিটার উচ্চতায় এবং মৃতসাগর হতে ১১৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। ভূমধ্যসাগর হতে এর দূরত্ব ৫২ কিলোমিটার, মৃতসাগর হতে ২২ কিলোমিটার এবং লোহিত সাগর হতে ২৫০ কিলোমিটার।

আল কুদুস পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম শহর। মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহুদি প্রত্যেকের কাছেই একটি স্মৃতিবিজড়িত বরকতময় সুন্দর আবহাওয়ার স্বাস্থ্যকর একটি শহর। শহরটি সুমিষ্ট এবং সুস্বাদু ফলের জন্য বিখ্যাত। ঐতিহাসিকদের মতে, এ শহরের ইতিহাস ৪৫ শতাব্দী ধরে বিদ্যমান। আজ থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে এখানে আরবের শাখা কেনানি এবং জিবুতিদের বসবাস ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে তারা এখানে বসবাস করত এবং তারা দুর্গও নির্মাণ করেছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব ১০৪৯ সালে এ শহরটি হজরত দাউদ আ.-এর হস্তগত হয় এবং তদীয় সন্তান হজরত সুলায়মান আ.-এর যুগে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে বুখতেনাসারের নেতৃত্বে এ শহরটি পারসিকদের আয়ত্তে আসে। তখন ইহুদিদের পাইকারিহারে হত্যা করা হয় এবং অবশিষ্টদের দাস বানিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার কর্তৃক এ অঞ্চল দখলে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি পারসিকদের অধীনে ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমানরা এ শহরের শাসনভার গ্রহণ করে। তাদেরই একজন শাসক হেবারডোস ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে এ শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে সেখানে ইলিয়া কাবতুলিনিয়া নামে একটি নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করে। রোমানদের শাসনামলে এ শহরটিকে ইলিয়া নামে ডাকা হতো এবং এখানে খ্রিষ্টধর্মের জয়জয়কার ছিল। কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের মা রানি হিলানা ৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দে এখানে একটি গির্জা নির্মাণ করেন, যা কানিসাতুল কিয়ামাহ নামে পরিচিত।

৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে পারসিকরা আবার এ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য অর্জন করে এবং সকল গির্জা ধ্বংস করে দেয়। এটি ছিল রাসুল ﷺ-এর যুগ এবং তখন পারসিকদের এ বিজয়ে মক্কার কাফিররা উল্লসিত হয়েছিল এই ভেবে—তারাও

Scanned by CamScanner

মুশরিক আর আমরাও মুশরিক। কিন্তু কুরআনে কারিমের ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী ৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দেই হিরাক্লিয়াস বাদশাহর হাতে অপ্রত্যাশিতভাবে পারসিকদের পতন ঘটে এবং সেখানে আবার খ্রিষ্টরাজ আরম্ভ হয়।

## ইসলামের ছায়াতলে আল কুদুস

সর্বপ্রথম হজরত উমর রা.-এর যুগে জেরুসালেম শহরটি মুসলমানদের হস্তগত হয়। আব্বাসি এবং উমাইয়া শাসনামলে এ শহরটি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এগারো শতকে [৪৯২ হিজরি, ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ] ইউরোপের খ্রিষ্টানরা পুনরায় এ শহরটি দখল করে হজরত উমর রা.-এর বিপরীতে শহরবাসীর ওপর নির্যাতনের এমন স্টিমরোলার চালায়, যা মানবতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত।

বহুসংখ্যক মুসলমানকে মসজিদে আকসায় এনে জবাই করে হত্যা করা হয়। মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়ে ঠাট্টাস্বরূপ 'আস্তাবলে সুলেমান' নামে ডাকা হতে থাকে। ৮০ বছর খ্রিষ্টানদের অধীনে থাকার পর ১১৮৭ সালে ইসলামের সাহসী সৈনিক সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাত ধরে এ শহরটি পুনরায় মুসলমানদের হস্তগত হয়। তিনি মসজিদে আকসাকে পুনঃনির্মাণ করে সেখানে ব্যাপকভাবে মসজিদ, মাদরাসা এবং ওয়াকফ অ্যাস্টেট প্রতিষ্ঠা করেন। এসবের ধারাবাহিকতা ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি ইংরেজরা এ শহরটিকে দখল করার আগ পর্যন্ত বহাল ছিল।

হেবার্ট স্যামুয়েল নামে এক ইহুদি ইংরেজদের পক্ষ থেকে এ শহরের প্রথম কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিল। প্রথম দিন থেকেই খ্রিষ্টবাদের ধ্বজাধারী হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেন এখানে ইহুদি স্বার্থ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। তাই সুদূর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমেই এখানে ইহুদি কমিশনার নিযুক্ত করে। কমিশনার নিযুক্ত হয়েই সে এ শহরকে ইহুদিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আমেরিকার খ্রিষ্টান সংস্থাগুলোও এ অঞ্চলে ইহুদিদের জমি ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করেছিল।

আস্তে আস্তে ইহুদিরা শক্তি সঞ্চার করে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের সহায়তায় এ অঞ্চলে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ১৯৬৭ সালের ৭ জুন অভিশপ্ত ইহুদিরা বায়তুল মাকদিসকে করায়ত্ত করে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়াসহ পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নতুন ইহুদিরা এ শহরে আসছে।

Scanned by CamScanner

এদের বাসস্থান নির্মাণে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ইহুদি বসতি স্থাপন করা হচ্ছে। শহর বিনির্মাণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের অজুহাতে প্রতিনিয়ত প্রাচীন আরব ঐতিহ্য এবং ইসলামি স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হচ্ছে। লাখ লাখ ফিলিস্তিনি নাগরিক ইহুদিদের বিভিন্ন কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে নিজেদের গ্রাম-শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। প্রতিনিয়ত তারা সিরিয়া লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থী হয়ে পাড়ি জমাচ্ছে। হয়তো একদিন আল্লাহর কোনো নির্বাচিত বান্দা জিহাদি পতাকা নিয়ে এ পবিত্র ভূমিকে তৃতীয়বার মুসলমানদের আয়ত্তাধীন করার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবেন।

## মসজিদে আকসা এবং সুলায়মানি কাঠামো

অনেকের কাছে এটাই প্রসিদ্ধ, মসজিদে আকসার প্রথম নির্মাতা হলেন হজরত দাউদ আ.। এরপর হজরত সুলায়মান আ. এটাকে পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয়। *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে হজরত আবু জর রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে, কাবা এবং মসজিদে আকসার নির্মাণের ব্যবধানকাল হচ্ছে ৪০ বছর।[২] বায়তুল্লাহ নির্মাণ প্রাথমিকভাবে হজরত আদম আ. করেছিলেন।[৩]

এতে করে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, হজরত দাউদ আ. এবং হজরত সুলায়মান আ.-এর বহু আগেই বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করা হয়েছিল। বায়তুল মাকদিসের সর্বপ্রথম নির্মাণ হজরত সুলায়মান আ.-এর হাতে হয়েছিল; ইহুদিদের এ দাবির ভ্রান্তি এখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যদিও এটা সত্য, সুলায়মান আ. বায়তুল মাকদিসের পুনঃনির্মাণ করেছিলেন; কিন্তু হজরত সুলায়মান আ.-এর নির্মাণের বহু আগে থেকেই এখানে ইবাদাতখানার কাঠামো ছিল।

---

[২] আবু জর রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ: قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَقْصَى: قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ

হে আল্লাহর রাসুল, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজদি তৈরি করা হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললনে, মসজদি আকসা। আমি বললাম, উভয় মসজিদের (তৈরির) মধ্যে কত ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, ৪০ বছর। এরপর তোমার যেখানেই নামাজের সময় হবে, সেখানেই নামাজ আদায় করে নেবে। কারণ, তার মধ্যে ফজিলত নিহিত রয়েছে। (*সহিহ বুখারি* : ৩৩৬৬)—*আলী হাসান উসামা*

[৩] হজরত ইবরাহিম আ.-এর নির্মাণ হজরত আদম আ.-এর নির্মাণকাঠামোর ওপর ছিল।

Scanned by CamScanner

বর্তমান ঐতিহাসিকদের মতে, কেনানি এবং জিবুতিদের সময়কাল থেকেই এখানে মসজিদের কাঠামো নির্মাণের ধারাবাহিকতা ছিল। হজরত সুলায়মান আ.-এর পরেও বেশ কয়েকবার এখানে মসজিদকে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছিল। কখনো ভূমিকম্প, কখনো বহিঃশত্রুর আক্রমণে মূল ভবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পরে নতুনভাবে মসজিদটিকে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। যে পুনঃনির্মাণ কখনো ইহুদিদের শত্রু খ্রিষ্টানরা করেছিল, আবার কখনো মুসলমানদের হাত ধরে নতুন কাঠামো নির্মিত হয়েছিল। তাহলে ইহুদিরা কোন যুক্তিতে মসজিদে আকসাকে নিজেদের বলে দাবি করে?

এমন কালও অতিবাহিত হয়েছে, যখন দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ ছাড়া এখানে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সুরা বনি ইসরাইলের[৪] শুরুতে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বনি ইসরাইলের মাত্রাহীন খোদাদ্রোহীতার ফলস্বরূপ খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ব্যাবিলনের শাসক বুখতেনাসারের হাতে জেরুসালেম শহর ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইহুদিদের ধর্মীয় পুস্তকসমূহ আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অগণিত ইহুদিদের জবাই করে প্রায় ১ লাখ ইহুদিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়।

অভিশপ্ত ইহুদিদের এ শাস্তি ভোগের প্রায় ১৫০ বছর পর্যন্ত এ শহরটি সম্পূর্ণ অনাবাদ ছিল। যুগের পরিক্রমায় মিসরীয়, পারসিক এবং রোমান সম্রাটরা বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলকে শাসন করে। বিভিন্ন শাসনামল ও তাদের হাতবদলের যুদ্ধে কখনো উন্নতি, কখনো অবনতির শিকার হওয়া এ শহরের নিত্তনৈমত্তিক ব্যাপার ছিল।

বিভিন্ন শাসনামলের এ পরিক্রমায় কোন সূত্র ধরে এখন ইহুদিরা এ ভূমিকে নিজেদের বলে দাবি করে? তাদের এ অহেতুক দাবি মূলত পৃথিবীর সকল জাতির হাতে নির্যাতিত হয়ে এখন মুসলমানদের বিরোধিতায় দাঁড়িয়ে নিজেদের চিরতরে ধ্বংস করার প্রাথমিক পদক্ষেপ।

## মসজিদে আকসা বিজয় এবং পুনঃনির্মাণ

অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবতার মুক্তির দিশারী হয়ে ইসলামের সূর্য যখন পূর্বাকাশে উঁকি দিচ্ছিল, সে সময়ে হিজরতের পর প্রায় ১৬/১৮ মাস রাসুল ﷺ বায়তুল মাকদিসকে কিবলা বানিয়ে নামাজ পড়তেন। এ জন্যই মসজিদে আকসাকে

[৪] সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত-৫।

Scanned by CamScanner

মুসলমানদের প্রথম কিবলা এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান ধরা হয়। মসজিদে আকসা বলতে পবিত্র ভূমির একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বোঝানো হয়, যার চতুর্পার্শ্বে পাচিল দিয়ে ঘেরাও করা আছে। বিভিন্ন স্থাপনা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যার মধ্যে প্রথম কিবলা হচ্ছে এই স্থাপনাটি, যার ওপর সোনালি সুদর্শন গম্বুজ বিদ্যমান রয়েছে। হজরত উমর রা.-এর যুগে মুসলমানরা এই শহরকে বিজয় করেছিল। খ্রিষ্টান শাসক এবং পাদরিদের বেআদবিমূলক অবহেলায় সম্পূর্ণ জায়গাটি অনাবাদি ছিল। সম্মানিত স্থাপনাগুলোতে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ ছিল। হজরত উমর রা. স্থানটিকে পরিষ্কারের আদেশ দিয়ে স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলে জায়গাটিকে পরিষ্কার করেন। *মুসনাদে আহমদে* সহিহ রিওয়ায়াতে বর্ণিত রয়েছে, হজরত উমর রা. কাব আহবারকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'আমি কোথায় নামাজ পড়ব?' কাব আহবার রাহ. বললেন, 'যদি আমার পরামর্শ মানেন, তাহলে বড় পাথরখণ্ডের পেছনে নামাজ পড়ুন, যাতে করে পুরো শহর আপনার সামনে থাকে।' হজরত উমর রা. বললেন, 'আপনি আমাকে এমন প্রস্তাব দিয়েছেন, যা ইহুদিদের কথার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমি তো সেখানেই নামাজ পড়ব, যেখানে রাসুল ﷺ নামাজ পড়েছিলেন।' এরপর তিনি বিজয়ী সাহাবিদের নিয়ে পবিত্র স্থাপনার কিবলার দিকের অংশে গেলেন এবং রাসুল ﷺ-এর বোরাক বাঁধার জায়গাটির পাশে নামাজ আদায় করেন।[৫] এরপর তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। কাঠ এবং গাছের পাতা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা হলো। উমাইয়া খিলাফাত-আমলে যখন রাজধানী সিরিয়াতে স্থানান্তরিত করা হলো তখন মসজিদে আকসা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে দাঁড়াল। তখন উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ করেন। এই নতুন নির্মাণ হজরত উমর রা. নির্মিত মসজিদকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। মসজিদে আকসার বর্তমান নির্মাণও উমাইয়া শাসকদের নির্মিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিকদের মতে, মসজিদে আকসা বিজয়ের গৌরব যেমনিভাবে হজরত উমর রা. অর্জন করেছিলেন, তেমনি এর জাঁকজমকপূর্ণ পুনঃনির্মাণ উমাইয়া শাসকদের কীর্তি হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকগণও সংস্কার ও সাজসজ্জা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন।

---

[৫] ইবনে কাসির রাহ. *আল বিদায়া ওয়াননিহায়া* (৭/৫৮) গ্রন্থে এই রিওয়ায়াতের সনদকে জায়্যিদ বলেছেন।

Scanned by CamScanner

সম্মানিত ভূমিতে নির্মিত মসজিদটির আয়তন ৪২ হাজার বর্গ গজ। মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশ এবং তার আঙিনা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ সৌন্দর্যমণ্ডিত করে নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের মূল স্তম্ভগুলো মূল্যবান মার্বেল পাথর এবং মিহরাব ও গম্বুজের ভেতরের অংশ অত্যন্ত কারুকার্য-খচিত টালির মাধ্যমে করা হয়েছে। মসজিদের চতুর্পার্শ্বে পাঁচিল দিয়ে ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছে। মসজিদে আকসা তখন যে ভিত্তিমূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্তমানকালেও সেই ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মসজিদে আকসা বলতে যদিও পাঁচিলঘেরা পূর্ণ অঞ্চলকেই বোঝানো হয়; কিন্তু কখনো শুধু এই বিশেষ মসজিদটিকে মসজিদে আকসা বলে ব্যক্ত করা হয়। এই পাঁচিল দিয়ে প্রবেশের মোট ১৪ টি দরজা ছিল; কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নির্দেশে নিরাপত্তাজনিত কারণে ৪টি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত ১০টি দরজাই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মসজিদের বাইরে বড় প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। বারান্দার মোট ৭টি দরজা রয়েছে। বারান্দার বাইরে বিস্তৃত মাঠে বিভিন্ন স্থাপনা, পানির ব্যবস্থাপনা এবং স্মৃতিবিজড়িত ছোট ছোট গম্বুজ রয়েছে। এর মধ্যে সবচে বড় হচ্ছে পাথরের[৬] ওপর নির্মিত সেই সুদর্শন গম্বুজবিশিষ্ট স্থাপনা, যার বিবরণ সামনে দেওয়া হবে। দুঃখের বিষয়, আজ আমরা এসব ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। এই আঙিনাতেই জুমআ এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এই পবিত্র ভূমিতে নামাজ আদায় হওয়াকে ইহুদিরা নিজেদের জন্য অনেক লাঞ্ছনার ব্যাপার মনে করে। তাই কখনো তারা এখানে আগুন লাগিয়ে, কখনো মসজিদে আকসার নিচে সুড়ং বানিয়ে, কখনো অন্য কোনো অজুহাতে মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করে এখানে চিরতরে নামাজের পরিবেশকে বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনায় লিপ্ত রয়েছে। এমন নিদারুণ পরিস্থিতিতে মুসলিমদের কাছে মসজিদে আকসা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের আর্তনাদ করে যাচ্ছে।

---

[৬] সাখরা।

Scanned by CamScanner

# জেরুসালেমের স্মৃতি

[পবিত্র ভূমিতে এমন কিছু স্মৃতিবিজড়িত স্থান রয়েছে, যার আলোচনায় স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করার জিহাদি চেতনা জাগ্রত হয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানের আলোচনা করা হলো। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এই আলোচনা আমাদের আল্লাহমুখী করা ও পবিত্র ভূমিকে হানাদারমুক্ত করার চেতনা জাগ্রত করার কারণ হতে পারে।]

## বোরাক দেয়াল

এ দেয়ালটি পবিত্র ভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

বর্ণিত আছে যে, রাসুল ﷺ মিরাজের রাতে এই দেয়ালের পাশেই নিজের বাহন বেঁধেছিলেন। এ কারণেই এই দেয়ালকে 'বোরাক দেয়াল' বলা হয়। মুসলমানরা এই দেয়ালের সাথেই 'মসজিদে বোরাক' নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইহুদিরা পবিত্র ভূমিকে দখল করে বিভিন্ন স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার ধারাবাহিকতায় এই মসজিদটিকেও ধ্বংস করে দেয় এবং বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে নিজেদের ইবাদাতের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করে। তারা এই দেয়ালকে সুলায়মান আ.-এর নির্মাণের অবশিষ্টাংশ মনে করে এবং এখানে এসে কান্নাকাটির পাশাপাশি বিভিন্ন চিঠি লিখে রেখে যায়। এ দেয়ালকে তারা 'কান্নার দেয়াল' (Wailing wall) নামে নামকরণ করে এবং নিজেদের সম্পত্তি বলে দাবি করে। তাদের বোকামিপূর্ণ ভিত্তিহীন এই দাবির কারণে ১৯২৯ সালে মুসলমানদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। তখন মুসলমানরা এখানে ইহুদিবাদের পতাকা স্থাপন এবং তাদের বিভিন্ন রীতিনীতি পালনের কারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠেছিল। মুসলমানরা এখানে রাখা চেয়ার-টেবিলগুলো ভেঙে ফেলে এবং দেয়ালে লাগানো তাদের পোস্টারসমূহ ছিঁড়ে ফেলে। এ সমস্যা সমাধানে তখন একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি প্রমাণাদির ভিত্তিতে ১৯৩০ সালে এই ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় যে, এই দেয়াল এবং তৎসংলগ্ন এলাকা বাস্তবিক পক্ষে মুসলমানদের মালিকানাধীন সম্পত্তি।

Scanned by CamScanner

কিন্তু যুগ যুগ ধরে অভিশপ্ত লাঞ্ছিত ইহুদি সম্প্রদায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের সাথে আঁতাত করে স্মৃতিবিজড়িত হওয়ার দোহাই দিয়ে গায়ের জোরে এই স্থান নিজেদের দখলে রাখে এবং নামাজের সময় বিউগল বাজিয়ে নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

এখানে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যে ইহুদিরা নবিদের জীবদ্দশায় তাদের কথার অবাধ্য ছিল, আজ কিনা তারাই সেই নবিদের স্মৃতির দোহাই দিচ্ছে! এ কি স্পষ্ট প্রতারণা নয়? বনি ইসরাইল নিজেদের নবি তথা সুলায়মান আ.-এর উত্তরসূরি বলে কীভাবে দাবি করে? একই নির্মাণশৈলীতে নির্মিত হাজার ফুট দেয়ালের কিয়দাংশ কী করে সুলায়মানি স্থাপনার অবশিষ্টাংশ হয়, যেখানে অন্য অংশটুকু মুসলমানদের নির্মিত? বাস্তবতা হচ্ছে, ভিত্তিহীন দাওয়াকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে শান্ত করা যায় না; বরং গোঁয়ার্তুমির ওষুধ হচ্ছে শক্তি প্রদর্শন।

## সোনালি গম্বুজ

এটা মসজিদে আকসার মূল মসজিদ থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বে একটি উঁচু চত্বরের ওপর নির্মিত। এটিই কুব্বাতুস সাখরা নামে পরিচিত। কুব্বাহ অর্থ গম্বুজ আর সাখরা অর্থ হচ্ছে পাথর। এই গম্বুজ পবিত্র ভূমির আঙিনায় অবস্থিত একটি কুদরতি পাথরের ওপর নির্মিত। তাই এটিকে কুব্বাতুস সাখরা বা ডোম অব দ্য রক বলা হয়। এই স্থাপনাটি অষ্টভুজ আকৃতিতে নির্মিত। যার প্রতিটি বাহু ৬৬ ফুট দীর্ঘ। যার ভেতরের ব্যাস ১৯২ ফুট আর গম্বুজের ভিত্তিমূলের ব্যাস ৬৬ ফুট। এই গম্বুজ ৯৯ ফুট উচ্চতায় কাঠনির্মিত। যার বাহিরের দিক থেকে পিতল দিয়ে আবৃত করে সোনালি প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। ভেতরের দিকে চিনামাটির আস্তর দেওয়া হয়েছে, যাতে সূক্ষ্ম জাঁকজমকপূর্ণ সোনালি কারুকাজ করা হয়েছে। উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ৬৬ হিজরি মোতাবেক ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। ৭২ হিজরি মোতাবেক ৬৯১ সালে তদীয় পুত্র ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের হাতে নির্মাণকাজ পূর্ণতা লাভ করে।

প্রসিদ্ধি আছে যে, উমাইয়া শাসকদের মিসর থেকে প্রাপ্ত সাত বছরের ট্যাক্স এই নির্মাণকাজে পরিপূর্ণরূপে ব্যয় করা হয়। বর্তমান স্থাপনা ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্ক সম্রাট সুলতান আবদুল হামিদ এবং ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আবদুল আজিজ কর্তৃক সংস্কারকৃত। যার ফলে বহির্দেয়ালের কারুকার্য, ৩৮ টি রঙ্গিন

Scanned by CamScanner

গ্লাসের জানালা এবং সাজসজ্জায় তুর্কি নির্মাণশৈলীর ছাপ বিদ্যমান। দেয়ালের বাইরে চতুর্দিকে পাথরের ওপর 'সুরা বনি ইসরাইল' ও 'সুরা ইয়াসিন' অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর লিপিশৈলীতে খোদাই করা হয়েছে। এই আয়াতসমূহ সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ লিখিয়েছিলেন। জানালার নির্মাণে উন্নত নির্মাণশৈলীর কারুকার্যখচিত জালির কাজ করা হয়েছে।

এই গম্বুজ একটি বর্গাকৃতির উঁচু চত্বরের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেখানে পৌছার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিঁড়ির শেষ মাথায় মিহরাবের দরজা রয়েছে, যেখান থেকে প্রশস্ত চত্বর আরম্ভ হয়। সেই চত্বরের ঠিক মাঝখানে গম্বুজটি অবস্থিত। গম্বুজের ভেতরে স্তম্ভগুলো দুটি সারিতে বিন্যস্ত। প্রথম সারিতে পাথর-সংলগ্ন চারটি বৃহদাকার ও ১২টি গোলাকার ছোট স্তম্ভ রয়েছে। কিছুদূরে দ্বিতীয় সারিতে ৮টি বড় এবং ১৬টি ছোট স্তম্ভ রয়েছে। এভাবে চত্বরের ভেতরের অংশকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ—যেখানে পাথরটি রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগ—যেখানে সুবিন্যাস্ত স্তম্ভগুলো সারিবদ্ধভাবে বিদ্যমান। তৃতীয় ভাগে দরজা-সংলগ্ন জায়গা। বর্তমানে দরজা-সংলগ্ন জায়গায় সবুজ এবং স্তম্ভের মাঝের জায়গাগুলোতে লাল কার্পেট বিছানো আছে। মুসলমানরা এখানে বসে কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করে এবং কিবলামুখী হয়ে নামাজও আদায় করে থাকে। এ কারণে কোনো কোনো ইতিহাসে এটিকে মসজিদে কুব্বাতুস সাখরা নামেও অভিহিত করা হয়। যদিও মূলত এটিকে মসজিদ আকারে নির্মাণ করা হয়নি। বাস্তবে এটি এমন একটি স্থান, যাকে মুসলমানরা শুধু স্মৃতির জায়গা হিসেবে গ্রহণ না করে তাতে নামাজও আদায় করে থাকে।

## ইখলাসের সুফল

এই গম্বুজের নির্মাণের দায়িত্বশীল ছিলেন প্রখ্যাত তাবেয়ি রাজা বিন হাইওয়াহ ও ইয়াজিদ বিন শারিক। রাজা বিন হাইওয়াহ হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের সঙ্গী ও অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফিলিস্তিনের বিসান নামক জায়গার অধিবাসী ছিলেন আর তার সহকর্মী ইয়াজিদ বিন শারিক জেরুসালেমের বাসিন্দা ছিলেন। কর্তব্যপরায়ণতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নির্মাণকাজ সমাপ্তির পর তারা সুলতানকে জানালেন যে, কাজ শেষ করেও ১ লাখ স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট রয়েছে। ফিরতি পত্রে বাদশাহ জানালেন যে, 'এটা আপনাদের আমানতদারির পুরস্কার। আপনারা তা গ্রহণ করুন।' তারা উত্তর পাঠালেন,

Scanned by CamScanner

'এই সৌভাগ্যজনক কাজের অংশীদার হয়ে আমাদের তো উচিত ছিল নিজেদের স্ত্রীদের স্বর্ণ-গয়নাও এই কাজে ব্যয় করা। আমরা এর বিনিময় গ্রহণ করতে অক্ষম।' এরপর বাদশাহ সেই স্বর্ণ গলিয়ে গম্বুজের ওপর সোনালি প্রলেপ দিতে আদেশ দিলেন। আজ সোনালি গম্বুজের যে চমক দেখা যায়, তা তৎকালীন মুসলমানদের হালাল উপার্জন এবং এ দুজন তাবেয়ির আমানতদারি এবং ইখলাসের চমক।

## পাথর এবং গুহা

এই গম্বুজ একটি কুদরতি পাথরের ওপর নির্মিত; যা আকারে একজন মানুষের বুক সমান, ৫৬ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৪২ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট প্রায় অর্ধ গোলাকার অবিন্যস্ত একটি পাথর। যার পশ্চিম দিক কিছুটা ঢালু ও নিচু আকৃতির এবং পূর্ব দিক উঁচু ধরনের। এই পাথরটি মূলত জেরুসালেমের অন্যান্য পাথরখণ্ডের মতো সুরমা রঙের অমসৃণ অবস্থায় যুগ যুগ ধরে এই স্থানেই রাখা আছে। এগারো শতকে খ্রিষ্টানরা যখন এই অঞ্চল দখল করে তখন এই পাথরটিকে ঘিরে ইহুদি পণ্ডিতদের পূজার একটি ঘৃণ্য দৃশ্য দেখা যায়; যারা ইঞ্জিল বিক্রি করে নিজেদের পেটপূজা করত। সেসব বড় বড় পণ্ডিতরা এই পাথরের জিয়ারতকারীদের কাছে স্বর্ণের ওজনে এ পাথরের অংশ বিক্রি করত। খ্রিষ্টান শাসকদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তারা পণ্ডিতদের এ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে পাথরটিকে মার্বেল পাথর দ্বারা আবৃত করে দেয়। ৮০ বছরের ব্যবধানে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি জেরুসালেম পুনর্দখল করলে গম্বুজের ওপর থেকে ক্রুশ চিহ্নসহ খ্রিষ্টানদের যাবতীয় প্রতীক এবং রীতিনীতি নিষিদ্ধ করেন।

এই পাথরের নিচে একটি প্রাকৃতিক গুহা রয়েছে, যাতে প্রায় ৭০ জন মানুষ একসাথে অবস্থান করতে পারে। বর্গাকৃতির এই গুহাটির প্রতিটি দেয়াল প্রায় সাড়ে চার মিটার এবং ছাদ তিন মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট। ছাদের দিকে প্রায় এক মিটার দৈর্ঘ্যের ফাটল রয়েছে। এই গর্তের দিকে প্রায় ১১টি ধাপ নামার পর একটি মার্বেল পাথর নির্মিত পকেট গেট দেখা যায়। এই গুহার মেঝেও মার্বেলপাথর দ্বারা নির্মিত। এই গুহার মধ্যে দুটো মিহরাব রয়েছে। ডান দিকের মিহরাবের সামনের চত্বরকে 'মাকামে খিজির' ও বাম দিকের মিহরাবের সামনের চত্বরকে 'বাবুল খলিল' বলা হয়।

Scanned by CamScanner

## নির্মাণের কারণ

এখানে একটি প্রশ্ন তৈরি হয় যে, কী উদ্দেশ্যে মুসলমানরা এই পাথরটিকে কেন্দ্র করে গম্বুজ নির্মাণ করেছেন? এর উত্তরে বলা যায়, যখন মুসলমানদের হাতে সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন বিজয় হয় তখন এখানকার জনসাধারণ দীর্ঘদিন রোমানদের অধীনে থাকায় তাদের কীর্তিতে প্রভাবিত ছিল। এ ক্ষেত্রে উমাইয়া শাসকগণ ইসলামি ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; যাতে করে ইসলামি ঐতিহ্যও এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। এই স্থাপনাটি ইসলামি ঐতিহ্যের প্রথম এমন নিদর্শন, যা কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলমানদের শান-শওকতের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে থাকবে। অমুসলিম ঐতিহাসিক এবং স্থাপত্যবিদদের কাছে এই স্থাপনাটি ইসলামের উন্নতির যুগের শ্রেষ্ঠ স্মারক হিসেবে বিবেচ্য। অনেক বিধর্মী স্থাপত্যবিদ এবং পুরাতত্ত্ববিদরা নিজেদের অনিচ্ছায় হলেও এই স্থাপনার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। ফ্রান্সের একজন ইঞ্জিনিয়ার—যিনি মিসরের কায়রো ইউনিভার্সিটির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন—তিনি বলেন, 'এ স্থাপনাটি শুধু একটি স্মরণীয় স্থাপনাই নয়; বরং মানুষের হাতে নির্মিত অনন্য নিদর্শনগুলোর একটি, যা সকল দর্শককে নিজ সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। এর সৌন্দর্য মানুষের কল্পনাকেও হারিয়ে দেয়।'

এ গম্বুজ নির্মাণের পটভূমি নিয়ে ঐতিহাসিকরা বলেন, যেহেতু এই অঞ্চলের মানুষের কাছে এই পাথরটি এবং তার নিচের গুহা কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, সাথে সাথে এ স্থানটি অন্যান্য স্থানের তুলনায় উঁচু অবস্থানে ছিল, আর খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক নির্মাণকাজে উন্নত রুচির অধিকারী ছিলেন। মসজিদে নববির বর্ধনকাজ, দামেস্কের জামে মসজিদের ঐতিহাসিক কাঠামো নির্মাণ, মসজিদে আকসার সুদর্শন ইমারত নির্মাণ তার নির্মাণকাজের উন্নত রুচির পরিচয় বহন করে। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত এই সুন্দর জায়গাটিতে একটি চত্বর ও তার ওপর একটি গম্বুজ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেন, যা মূলত বিশেষ কোনো ধর্মীয় স্মারক নয়; বরং মসজিদে আকসার আঙিনায় নির্মিত অন্যান্য স্থাপনাগুলোর মতো জাঁকজমকপূর্ণ নির্মাণশৈলীর একটি অনন্য উদাহরণ মাত্র।

অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, এ অঞ্চলে 'কানিসাতুল কিয়ামাহ' ও 'কানিসাতুল মাহদ' নামে খ্রিষ্টানদের দুটো সুন্দর গির্জা ছিল, যা দেখার জন্য তারা দূরদুরান্ত থেকে আসত এবং যার নির্মাণশৈলী নিয়ে তারা গর্ববোধ

Scanned by CamScanner

করত।[৭] তাই খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক এ দুটি গির্জার চেয়েও জাঁকজমকপূর্ণ একটি স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

## বদদুআর প্রভাব

কোনো কোনো দার্শনিকের মতে, ইহুদিরা এ স্থানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কারে বিশ্বাস করত। যেমন তাদের কিছু বোকা ব্যক্তির বিশ্বাস ছিল, এ পাথরের নিচেই মূল তাওরাত প্রোথিত রয়েছে। মুসলমানরা যখন এখানে আগমন করল, তারা দেখল ইহুদিদের সাথে বিদ্বেষবশত খ্রিষ্টানরা এই স্থানটিকে আবর্জনায় পরিপূর্ণ করে রেখেছে। মসজিদে আকসার অংশ হওয়ায় হজরত উমর রা. স্থানটিকে নিজ হাতে পরিষ্কার করেছিলেন। হাস্যকর কথা হচ্ছে, বিজ্ঞানের উন্নতির এ যুগেও কিছু ইহুদি স্থানটিকে পৃথিবীর নাভি বলে দাবি করে। আবার কেউ বলে, এ স্থানটি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় ১৮ মাইল আকাশের নিকটবর্তী।

মোদ্দাকথা, স্থানটিকে ঘিরে তাদের অনেক মিথ ছিল। হয়তো খলিফাতুল মুসলিমিন ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক এসব কারণেই এসব কুসংস্কারকে মুছে দেওয়ার জন্য স্থানটিকে নির্মাণ-কারুকার্যের অনন্য নিদর্শন হিসেবে ইসলামি ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই গম্বুজটি মুসলমানদের শান-শওকতের পরিচায়ক এবং দূরদুরান্ত থেকে মসজিদে আকসার বিশেষ পরিচয় বহন করে।

## বিজয়ী বীরের সন্ধান

ইসলামি বিদ্বান ব্যক্তিদের দায়িত্ব হচ্ছে, উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে জিহাদি আগ্রহ তৈরি করা। হতে পারে এই জিহাদি স্ফুলিঙ্গ কোনো যুবকের অন্তরে জাগ্রত হয়ে তাকে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মতো মুক্তির সেনানায়কের আসনে আসীন করবে।

আহ, যদি আমরা সেই সময়টি দেখতে পেতাম, যখন তৃতীয়বারের মতো ইসলামের বীরসেনানীরা এই শহরকে বিজয় করে নিজেদের বীরত্বগাঁথা রচনা করবে!

---

[৭] যা আজও অবশিষ্ট রয়েছে।

Scanned by CamScanner

# আল কুদুস

## আহত আর্তনাদ

জেরুসালেমের পবিত্র ভূমি যুগ যুগ ধরেই মুসলমান শাসক, সাধক, জ্ঞানতাপস ও সাধারণ মুসলমানদের আবেগ ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মুসলিম শাসকগণ উন্নত নির্মাণশৈলীর মাধ্যমে একে দর্শনীয় স্থানে পরিণত করেছিলেন। এর ফলে মুসল্লিদের সুবিধার্থে ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক হিসেবে নির্মিত ছোট ছোট বেশ কিছু স্থাপনা, মাদরাসা, গম্বুজ, চত্বর, পানির চৌবাচ্চা ও রোদঘড়ির দেখা পাওয়া যায়; যেগুলোর নির্মাণশৈলী স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন হিসেবে এই স্থানটিকে পরিচিত করেছে।

মসজিদে আকসা প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ অভিশপ্ত ইহুদিদের হাতে বন্দি। তাই দীর্ঘদিন যাবৎ আধুনিক কোনো স্থাপনা এখানে নির্মিত হয়নি। প্রাচীন যে স্থাপনাগুলো এখানে দেখা যায়, তা অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং সুন্দর নির্মাণশৈলীর অধিকারী। কিন্তু প্রয়োজনীয় দেখাশোনা ও সংস্কারের অভাবে ধীরে ধীরে এর সৌন্দর্য মলিন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে মসজিদে আকসার পরিবেশে একটি শোকার্ত বেদনাময় পরিবেশ বিরাজ করে, যা ইমানদার ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করতে পারেন। যা হৃদয়ে একধরনের চিনচিনে ব্যাথার অনুভূতি জাগ্রত করে। কে জানে হয়তো-বা এ বেদনার পরিসমাপ্তি এ যুগের কোনো সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে হবে অথবা জিহাদ পরিত্যাগের শাস্তি হিসেবে এই বেদনা নিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।

বায়তুল মাকদিসের বিভিন্ন মর্যাদা ও বরকতময় আবহাওয়ার প্রেক্ষিতে অনেক মহান বিদ্বান আলিম এখানে জ্ঞানের আসর বসাতেন। বহু সাধক এখানে ইতিকাফ করতেন। অনেক বুজুর্গ এখানে আত্মশুদ্ধির মজলিস করতেন। আর শুধু জিয়ারাত এবং নামাজের জন্য শ্রেণি-বর্ণ নির্বিশেষে সব ধরনের মুসলমানদের সারা বছরব্যাপী ভিড় লেগে থাকত।

Scanned by CamScanner

এ অধ্যায়ে বায়তুল মাকদিসের কিছু প্রসিদ্ধ স্থাপনা এবং সেখানে অবস্থান নেওয়া কয়েকজন নামকরা বিদ্বান ব্যক্তির আলোচনা করা হবে। আফসোস, আজ আমাদের আর পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া আমানতের মধ্যখানে ইহুদিরা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে অন্তরায় দূর করতে হলে হয়তো আমাদের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে হবে। পরিস্থিতি শহিদ এবং গাজিদের এমন রক্তের নজরানা চাচ্ছে, যে রক্ত কোনো ভূমিতে পতিত হলে সেখানে আল্লাহর রহমত বিরাজমান থাকে; যে রক্ত পাপের কালিমাকে মুছে দেয়।

## জেরুসালেমের পবিত্র ভূমির স্থাপনাসমূহ

জেরুসালেম শহরের প্রসিদ্ধ আলিমগণের আলোচনার পূর্বে সেখানের পবিত্র ভূমির অন্তর্ভুক্ত কিছু স্থাপনার আলোচনা করা হচ্ছে। যেসব স্থাপনা ফিলিস্তিনিরা ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য মুসলমানরা এখন আর জিয়ারত করতে পারছে না। এই স্থাপনাগুলো বিভিন্ন ধরনের। উমাইয়া খলিফাগণ মসজিদে আকসা নির্মাণ করেছিলেন। তবে পরবর্তী অতিরিক্ত স্থাপনাগুলোকে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়—আইয়ুবি যুগ, অন্য শাসকদের যুগ, উসমানি শাসকদের যুগ। বিশেষত দ্বিতীয় যুগের শাসকগণ এখানে নির্মাণকার্যে ব্যাপক অংশগ্রহণ করেন এবং বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপনা নির্মাণ করেন। কিন্তু সেই আলোচনার পূর্বে মসজিদের অন্তর্গত ঐতিহাসিক স্থানগুলোর আলোচনা করা হচ্ছে।

## মসজিদ-কম্পাউন্ড

মসজিদের কিবলার দিকের দেয়ালে একটি মিহরাব রয়েছে, যাকে 'মিহরাবে দাউদ' বলা হয়। মিহরাবের সাথে একটি মিম্বার আছে, যেটি ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরব সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি হালাব থেকে আনিয়েছিলেন। যা মূলত সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গি বায়তুল মাকদিস বিজয় হলে মিহরাবের পাশে স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার উত্তরসূরি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এই ইচ্ছা পূর্ণ করে এই মিম্বারকে বায়তুল মাকদিসে স্থাপনের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালে ইহুদিরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বায়তুল মাকদিসে অগ্নিসংযোগ করলে এই ঐতিহাসিক মিম্বারের বেশিরভাগ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কম্পাউন্ডের পশ্চিম দিকে একটি লোহার কুঠুরি আছে। সেখানে 'মিহরাবে মুআবিয়া' নামে একটি মিহরাব

Scanned by CamScanner

রয়েছে। পূর্ব দিকের লম্বাকৃতির অংশটি মসজিদের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদাভাবে দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এটা মূলত মসজিদে আকসার প্রাচীন ওই অংশ, যা হজরত উমর রা. নির্মাণ করেছিলেন। এ কারণে এই অংশকে 'জামে উমর'ও বলা হয়। তার মধ্যেও ছোট একটি মিহরাব রয়েছে। জামে উমরের উত্তর দিকে একটি সুন্দর জায়গা রয়েছে, তাকে 'উজায়ের গ্যালারি' বলা হয়। ইওয়ানে উজায়েরের[৮] উত্তর দিকে আরেকটি ছোট সুন্দর মিহরাব রয়েছে, যেটা 'মিহরাবে জাকারিয়া' নামে পরিচিত। এটি লম্বায় ৬ মিটার, প্রস্থে ৬ মিটার।

এবার আসুন, মসজিদের আঙিনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুন্দর স্থাপনাগুলো একনজরে দেখে নিই। হতে পারে, এর সৌন্দর্যের সরোবরে অবগাহন করে আকসা পুনরুদ্ধারের চেতনাবোধ জাগ্রত হবে।

## মাদরাসাসমূহ

হারাম এরিয়ার উত্তর-পশ্চিম দিকে যে পাচিল রয়েছে, তার সাথে একটি প্রশস্ত বারান্দা আছে। যার আন্ডারগ্রাউন্ড ও ওপরের তলাগুলোতে ক্লাসরুম এবং ছাত্রাবাস অবস্থিত। এর মধ্যে কিছু স্থাপনা মুসলমান ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাদের ও তাদের পরিবারের ইসালে সাওয়াবের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। এর সাথে ছোট-বড় আরও বেশ কিছু কক্ষ ছাত্রদের থাকার জন্য নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি মাদরাসা হচ্ছে—মাদরাসায়ে গাজিয়াহ, মাদরাসায়ে কারিমিয়া, মাদরাসায়ে বাসেতিয়া, মাদরাসায়ে তুলুনিয়া, মাদরাসায়ে উসমানিয়া। সেখানে আজও কয়েকটি ছোট ছোট লাইব্রেরি আছে। আর এর বাইরে অন্যান্য স্থানগুলোতে হতাশার এমন দৃশ্য দৃশ্যমান হয়, যা কলিজা বিদীর্ণ করে দেয়। পশ্চিমের বারান্দায় মাদরাসায়ে খাতুনিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে ছোট্ট একটি কক্ষে এ উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ নেতা ও বক্তা মুহাম্মাদ আলি জাওহারের কবর রয়েছে। কথিত রয়েছে, তিনি স্বাধীন দেশে কবরস্থ হওয়ার জন্য ভারত উপমহাদেশে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু হায়, তিনি কি জানতেন; যেই ইংরেজদের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি লড়াই করেছিলেন, সেই ইংরেজরাই মুসলমানদের জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার সুযোগে এই পবিত্র ভূমিকেও পরাধীন করে নেবে।

---

[৮] উজায়ের গ্যালারি।

Scanned by CamScanner

## গম্বুজসমূহ

ছোট ছোট বেশ কিছু গম্বুজ জ্ঞান চর্চা, আল্লাহর ধ্যান, ইবাদাতের নির্জন জায়গা অথবা ঐতিহাসিক স্মারক হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল; যা আজও মসজিদে আকসার আঙিনার শোভা বর্ধন করছে। এই গম্বুজগুলো বিভিন্ন শাসকেরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদে আকসার উপরিভাগ থেকে তোলা ছবিগুলোতে এই ছোট গম্বুজগুলো ছোট ছোট পাথরের ভাস্কর্যের মতো দৃষ্টিগোচর হয়। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি হচ্ছে 'মিরাজ গম্বুজ', যা রাসুল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের মিরাজ গমনের স্মারক হিসেবে নির্মাণ করা হয়। অবশ্য এটাতে ইহুদিদের গোলাগুলির আঘাতের দাগ বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া কুব্বাতুস সিলসিলা, কুব্বাতুন নাহবিয়া, ইউসুফ গম্বুজ ও শায়খ খলিলি গম্বুজ প্রসিদ্ধ।

## চত্বরসমূহ

নামাজ আদায়, জ্ঞান চর্চা, জ্ঞানের আসরের জন্য বেশকিছু চত্বর বানানো হয়েছিল। মাটি থেকে কিছুটা উচ্চতায় এই চত্বরগুলো বর্গাকৃতির বা আয়তাকার আকৃতিতে নির্মাণ করা হয়। সাধারণভাবে সুন্দর পাথর দ্বারা এগুলো নির্মাণ করে কিবলার দিকে একটি মিহরাবসদৃশ কাঠামো নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছিল। এ চত্বরগুলো বেশিরভাগ পবিত্র ভূমির পূর্ব দিকের আঙিনায় অবস্থিত। কারণ, ওদিকটায় গাছের ছায়া থাকত যথেষ্ট পরিমাণ, ওখানকার পরিবেশটাও ছিল বেশ মনোরম। চত্বরগুলো বেশিরভাগ উসমানি খিলাফাত-আমলে নির্মাণ করা হয়। এ ধরনের মোট ২৪টি চত্বর রয়েছে; যার মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হচ্ছে—কর্কের চত্বর, বসিরি চত্বর, সুলতান জাহেরের চত্বর।

## মিনারসমূহ

বায়তুল মাকদিস থেকে শহরের বসতি উত্তর-পশ্চিম দিকে থাকায় সেদিকে আজান দেওয়ার জন্য চারটি মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল। মসজিদে আকসা যেহেতু প্রাচীন জেরুসালেম শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত, যে জায়গাটা তুলনামূলক উচ্চতায় অবস্থিত, তাই এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কোনো বসতি ছিল না। অবশ্য বর্তমানে সেদিকেও বসতি স্থাপন করা হয়েছে। বিমান থেকে নেওয়া জেরুসালেম শহরের ছবিগুলো থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই

Scanned by CamScanner

চারটি মিনার এ শহরের বিনির্মাণের দ্বিতীয় যুগে ৬৭৭ হিজরি থেকে ৭৬৯ হিজরি পর্যন্ত ১২৮৭ থেকে ১৩৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্মাণ করা হয়। এই মিনারগুলো বর্তমানেও বিদ্যমান রয়েছে এবং তা দূর থেকে মসজিদের চিহ্ন বহন করে। এ মিনারগুলো মসজিদের চারটি দরজা-সংলগ্ন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। এ জন্য এই মিনারগুলোর নাম হচ্ছে পশ্চিম ফটকের মিনার, সিলসিলা ফটকের মিনার, গাওয়ানেমা ফটকের মিনার, আসবান ফটকের মিনার।

## পানির ফোয়ারাসমূহ

নামাজ এবং দর্শকদের সুবিধার্থে এই স্থাপনার নির্মাতারা বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক পরিমাণে পানির ফোয়ারা, কুয়া, চৌবাচ্চা নির্মাণ করেছিলেন। পুরো মসজিদে আকসার এরিয়ায় মোট ২৫টি কুয়া রয়েছে; যার মধ্যে ১৭টি মসজিদের আশেপাশে। বাকি আটটি সোনালি গম্বুজবিশিষ্ট স্থাপনার আশেপাশে অবস্থিত। এ ছাড়াও আরও ৯টি ফোয়ারা নির্মাণ করা হয়েছিল। কাসুল ফাওয়ারাহ নামে একটি সুদর্শন হাউজ মসজিদের দরজার সামনে ছিল। এটি ৫৭৯ হিজরিতে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নির্মাণ করেছিলেন। এই হাউজটি মসজিদের কেন্দ্রীয় দরজার সামনে থেকে নেওয়া ছবিগুলোতে দৃশ্যমান হয়। শহরের বিভিন্ন কুয়া থেকেও পাইপের মাধ্যমে মসজিদের আঙিনায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

## সূর্যঘড়ি এবং আন্ডারগ্রাউন্ড

মসজিদে আকসায় দুটো রৌদ্রঘড়ি ছিল; যা সঠিকভাবে নামাজের সময় জানতে সহযোগিতা করত। এর একটি ছিল মসজিদের সামনে, আরেকটি ছিল সোনালি গম্বুজবিশিষ্ট চত্বরের সামনে। এ ছাড়া মসজিদের মূল হলের নিচে একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষ ছিল, যেটাকে খ্রিষ্টানরা আস্তাবলে সুলায়মানি নাম দিয়ে ঘোড়া বাঁধার কাজে ব্যবহার করতো। স্তম্ভের ওপর নির্মিত এই ভূগর্ভস্থ কক্ষটিকে পুরাতন মসজিদে আকসাও বলা হয়। শেষদিকে মসজিদে আকসার একটি কক্ষকে জাদুঘর হিসেবে নির্ধারণ করে ইসলামি স্মৃতিবিজড়িত জিনিসগুলো রাখা হয়েছিল; যা দর্শকদের আত্মার খোরাক জোগাত।

Scanned by CamScanner

# জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে বায়তুল মাকদিসের অবস্থান

দীর্ঘদিন পর্যন্ত মসজিদে আকসা মুসলমানদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সর্বপ্রথম হজরত উমর রা.-এর আদেশে দুইজন সাহাবি ধর্মীয় জ্ঞানের আলো ছড়ানোর লক্ষ্যে এখানে অবস্থান শুরু করেন। তাদের একজন হজরত উবাদাহ ইবনে সামিত রা. (মৃত্যু ৩৪ হি.)। অপরজন হজরত শাদ্দাদ বিন আউস রা.। (মৃত্যু ৫৮ হি.)। হজরত উবাদাহ ইবনে সামিত রা. ফিলিস্তিনের প্রথম বিচারকও ছিলেন। উভয়েই সারাজীবন এই অঞ্চলে জ্ঞানের আলো ছড়ানো ও মানুষের আত্মশুদ্ধির কাজে নিয়োজিত থেকে এখানেই ইনতেকাল করেছেন। তাঁদের কবর মসজিদে আকসার পূর্ব দেয়ালের পাশে 'মাকবারায়ে রহমত' নামক কবরস্থানে অবস্থিত।

এরপর সারাবিশ্ব থেকে অসংখ্য আলিম-উলামা মসজিদে আকসার ফজিলত অর্জন এবং জ্ঞানের আলো ছড়ানোর লক্ষ্যে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হচ্ছেন—প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন হজরত মুকাতিল ইবনে সুলায়মান (মৃত্যু ১৫০ হি.), সিরিয়ার বিখ্যাত ফকিহ ইমাম আবদুর রহমান ইবনে আমর আওজায়ি (মৃত্যু ১৫৭ হি.), ইরাকের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হজরত সুফইয়ান সাওরি (মৃত্যু ১৬১ হি.), মিসরের প্রসিদ্ধ আলিম হজরত লাইস ইবনে সাদ (মৃত্যু ১৭৫ হি.)। এ ছাড়াও ফিকহে শাফেয়ির প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস শাফেয়িও এ অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। যেসব বুজুর্গ সাধক এ অঞ্চলে আগমন করেছিলেন, তাদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন দুঃসাধ্য ব্যাপার। পঞ্চম শতকে তখন মসজিদে আকসা ইসলামি জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যখন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাজালি রাহ. (মৃত্যু ৪৮৮ হি.) এখানে জ্ঞানচর্চার আসর তৈরি করেন। তিনি যে কক্ষে অবস্থান করতেন, তা প্রথমে নাসিরিয়া নামে থাকলেও পরবর্তীতে গাজালিয়া নামে পরিচিত হতে থাকে। তৎকালীন সময়ে ইমাম গাজালি রাহ.-এর ভাষ্যমতে পবিত্র ভূমির সীমানায় প্রায় ৩৬০টি মাদরাসা ছিল, যা ইলম-পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করত।

হিজরি ষষ্ঠ শতকে প্রায় ৮০ বছর পর্যন্ত এখানে খ্রিষ্টান রাজত্ব ছিল। তখন জ্ঞানচর্চার এ বরকতময় ধারা এখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহ. এ অঞ্চলকে বিজয় করে আবার জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতা শুরু করেন। এখনো আবার প্রায় ৮০ বছর যাবৎ এখানে ইসলামি জ্ঞানচর্চার আসর

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণ বন্ধ। মসজিদে আকসার আঙিনায় এখন 'কালাল্লাহ, কালার রাসুল'-এর জায়গায় আহত মুসল্লিদের আর্তনাদ গুঞ্জন করে ফেরে।

## লেখকদের লিখনীতে বায়তুল মাকদিস

বায়তুল মাকদিস নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর তালিকা লেখকদের জীবনকাল অনুসারে দেওয়া হলো।

১. *আল জামিউল মুসতাকসা ফি ফাজায়িলিল মাসজিদিল আকসা*। লেখক : ইমাম বাহাউদ্দিন আবুল কাসেম। যিনি হাফিজ ইবনে আসাকির নামে পরিচিত। (মৃত্যু : ৬০০ হিজরি)

২. *ফাজায়িলু বাইতিল মাকদিস*। লেখক : আবুল মাআলি মুশাররাফ ইবনে মুরজি আল মাকদিসি। (মৃত্যু : ৪৯২ হিজরি) তিনি পঞ্চম শতকের জেরুসালেমের স্থানীয় প্রসিদ্ধ আলিমগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

৩. *বায়িসুন নুফুস ইলা জিয়ারাতিল কুদসিল মাহরুস*। লেখক : শায়খ বুরহানুদ্দিন জুরারি। যিনি ইবনে কুরকাহ নামে পরিচিত। (মৃত্যু ৭২৯ হিজরি)

৪. *মুসিরুল গারাম ইলা জিয়ারাতিল কুদসি ওয়াশশাম*। লেখক : শিহাবুদ্দিন আল মাকদিসি। (মৃত্যু : ৭৬৫ হিজরি)

৫. *ইতহাফুল আখসা বিফাজায়িলিল মাসজিদিল আকসা*। লেখক : শামসুদ্দিন সুয়ুতি আল মাকদিসি। (মৃত্যু : ৮৮০ হিজরি)

৬. *বায়তুল মাকদিস ওয়াল মাসজিদুল আকসা*। লেখক : মুহাম্মাদ হাসান শাররাব। (দারুল কলম, দামেস্ক প্রকাশিত)।

এ ছাড়াও নাসির খসরু (মৃত্যু : ৪৩৮ হি.), প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ইয়াকুত হামাওয়ি (মৃত্যু : ৬২৬ হি.), বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা (মৃত্যু : ৭৭৯ হি.) এবং সিরিয়ার প্রসিদ্ধ হানাফি ফকিহ সাধক শায়খ আবদুল গনি নাবুলুসি—যিনি সুবিখ্যাত ফকিহ ইবনে আবেদিন শামির উস্তাদ ছিলেন—তারা সকলেই বায়তুল মাকদিসের সফরনামা লিখেছেন। নাসির খসরুর সফরনামা ফার্সি ভাষায় লিখিত। আর শায়খ আবদুল গনি নাবুলুসির সফরনামার নাম *আল হাদরাতুল আনিসাহ ফির রিহলাতিল কুদসিয়্যাহ*, যা ১০১১ হিজরি সনে লেখা হয়েছিল।

Scanned by CamScanner

বর্তমানকালেও এ বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এই—

১. ইবরাহিম গানি প্রণীত *আল মাসজিদুল আকসা ওয়াস সাখরাতুল মুশাররাফাহ*। (মাকতাবাতুশ শারুক, বৈরুত প্রকাশিত)।

২. মুহাম্মাদ আবদুল মুনইম আল হিময়ারি প্রণীত *আর রাওজুল মিতার ফি খবরিল আকতার*। (মাকতাবা লুবনান প্রকাশিত)।

৩. ফিলিস্তিন আরবি উচ্চপরিষদ প্রণীত *আল মুকাদ্দাসাতুল ইসলামিয়াহ ফি ফিলিস্তিন ওয়াল মাতামিয়িল ইহুদিয়াহ আলখাতিরাহ*।

৪. মুহাম্মাদ কুরদ আলি প্রণীত *খুতাতুশশাম*-এর ৬ষ্ঠ খণ্ড। (মাকতাবা নুরি, দামেস্ক প্রকাশিত)।

৫. ডক্টর আবদুল ফাত্তাহ উমর উয়াইসি প্রণীত *মাকানাতু ওয়া তারিখু বায়তিল মাকদিস ফিল ইসলাম*।

Scanned by CamScanner

# পাথরটি সম্মানিত কেন?

সম্মানিত পরিচালক সমীপে,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জনাব, *জরবে মুমিন* প্রতিবছর অত্যন্ত সুদর্শন ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে থাকে। আল্লাহ আপনাদের এই প্রকাশনীর ধারাবাহিকতা স্থায়ী করুন। এবারের 'আল কুদুস' ক্যালেন্ডারে একটি বাক্য লেখা ছিল এমন—'এটি এমন পবিত্র সম্মানিত পাথর, যার ওপর সোনালি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে।' পাথরটিকে কেন সম্মানিত বলা হয়েছে, দয়া করে বিষয়টি স্পষ্ট করবেন। পাশাপাশি পাথরটির ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং অন্য ধর্মের আলোকে এর গুরুত্বের দিকগুলো জানিয়ে বাধিত করবেন।

সালামান্তে
**আসেম বাজওয়াহ**
শিয়ালকোট।

---

**শ্রদ্ধেয় বাজওয়াহ সাহেব।**

ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

পাঠকগণের কাছ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন আমরা কামনা করছিলাম। বাস্তবে এই পাথরখণ্ডটি প্রতিটি আসমানি ধর্মমতে[৯] বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং ভবিষ্যতের যে বৈপ্লবিক ঘটনাগুলোর আমরা আশাবাদী, তা-ও কোনো না কোনোভাবে এই পাথরটির সঙ্গে সম্পর্কিত। এ দিকটি লক্ষ করেই ছবির নিচে এই কথাগুলো বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ, পাঠকগণ এই শব্দগুলোকেও গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ করেছেন। এখন আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার যথার্থতা অনুভব করছি, যা পাঠকদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।

---

[৯] ইসলাম, খ্রিষ্টবাদ ও ইহুদিধর্ম।

Scanned by CamScanner

হয়তো এটাই বাস্তবতা যে, বর্তমানে অধিকাংশ পাঠক ইরাকের আবু গারিব কারাগারে অসহায় বন্দিদের ওপর নির্যাতনের খবরাখবর পড়তে বেশি আগ্রহবোধ করে থাকে। কিন্তু ইরাকের বাস্তবিক অবস্থাকে ফিলিস্তিনের বাস্তব অবস্থার চেয়ে ভিন্ন কল্পনা করা মোটেও ঠিক না। আবু গারিব কারাগারের অসহায় বন্দিদের ওপর প্রয়োগকৃত অত্যাচারের ফর্মুলা মূলত ইহুদিদেরই আবিষ্কৃত। ফিলিস্তিনের অসহায় নারী-শিশুদের সাথে যে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে, আবু গারিব কারাগার মূলত তার একটি প্রদর্শনী মাত্র। কী আশ্চর্য, উভয় স্থানের অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতরা পুরোপুরি অভিন্ন! আবু গারিব কারাগারের চিফ ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত রয়েছে যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, সে হলো এক উন্মাদ এবং বিকৃত রুচিবিশিষ্টা জঘন্য ইহুদি মহিলা, যার অধীনে ৮০০ সেনা কর্মরত। এই মহিলা সেখানে অত্যাচারের এমনসব নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে, যা ইসরাইলের 'এবিসি রিসার্চ সেন্টার'-এর আবিষ্কৃত।[১০]

মানবতা-বিবর্জিত ইসরাইলি সৈন্যরা যখন ফিলিস্তিনি যুবকদের মুখে পায়খানা এবং গোবর ছুড়ে দেওয়া, নিতম্বে ইলেকট্রিক কেটলির ডাঁট ঢুকিয়ে শক দেওয়ার মতো অন্তরাত্মা প্রকম্পিতকারী জঘন্য ও ভয়াবহ সব নির্যাতন করে নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সর্বশেষ বন্দিদের ধরে সেই রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে যায়, যেখানে তারা এই যুবকদের ওপর বিভিন্ন রাসায়নিক অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। ইবলিস তখন নগ্ন নৃত্য করে, মানবতা তখন মুখ লুকিয়ে গুমরে কাঁদে যখন গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা করার মতো ভয়ানক আবিষ্কারগুলো সেই অসহায় যুবকদের ওপর প্রয়োগ করা হয়।

এই রিসার্চ সেন্টারগুলোতে প্রবেশের সময় একজন ফিলিস্তিনি যুবক বন্দিরূপে প্রবেশ করলেও বের হওয়ার সময় ইসরাইলি নরপশুদের হাতে নিহত লাশে পরিণত হয়। এ ধরনের কিছু চিত্রই আবু গারিব কারাগারে চিত্রিত হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীবাসী নিজেদের চতুর্পার্শ্বের সবকিছুকে ইহুদিদের চশমা দিয়ে দেখবে, ততদিন পর্যন্ত এ নির্যাতন চলতেই থাকবে। আমেরিকার শাসকেরা এ কারাগারের জঘন্য নির্যাতনগুলো সামনে এলে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলে—এ ঘটনায় তাদের জাতীয় মূল্যবোধ নষ্ট হয়েছে। দায়সারা গোছের এসব বিবৃতির মাধ্যমে তারা মূলত ইসরাইলি সৈন্যদের অনবরত করে আসা এসকল পিশাচীয় নির্যাতন থেকে অন্যদের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।

---

[১০] ABC-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Atomic Bacterial & Chemical.

Scanned by CamScanner

এবার আসুন, আমরা মূল কথায় ফিরে যাই। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রাচীন ইসলামি নিদর্শনসমূহে জেরুসালেম শহরটি পরিপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের কাছ থেকে এই শহরটি ততটা মর্যাদা পায়নি। জনসাধারণ তো পরের কথা, বিশেষ ইসলামি ব্যক্তিত্বরাও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত নন। এ জন্যই তো ছোট একটি মসজিদের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেওয়া মুসলমানদের উত্তরসূরিরা নিজেদের তৃতীয় পবিত্রতম স্থানে ইহুদিদের নগ্ন হস্তক্ষেপের খবর শুনেও তাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে আগ্রহী হচ্ছে না। তাদের এই পবিত্র ঐতিহ্যকে ইহুদিরা চিরতরে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর; কিন্তু সমগ্র ইসলামি বিশ্বের এই ব্যাপারে কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাই ইসলামি লেখক, গবেষক ও সংবাদ সংস্থাগুলোর উচিত, এই ভুল ধারণাকে দূর করা যে, ফিলিস্তিনিরা শুধু নিজেদের রাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য লড়ে যাচ্ছে অথবা মসজিদে আকসা শুধু ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সম্পদ। বাস্তবে মসজিদে আকসা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসরত ১৫০ কোটি মুসলমানের ঐতিহ্য এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ প্রত্যেক ওই ব্যক্তির দায়িত্ব, যে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে এবং যে ব্যক্তি হাদিসে বর্ণিত সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোকে বিশ্বাস করে, যেখানে বলা হয়েছে এই পবিত্র ভূমিতে কিয়ামাতের আগে হক ও বাতিলের এমন মহাযুদ্ধ হবে, যা মানবেতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা করবে।

এই পাথর-সংক্রান্ত আলোচনা মূলত গত বছরের কয়েকটি প্রবন্ধে প্রকাশিত এ প্রশ্নের আলোকে এসেছিল যে, মসজিদে আকসা বলতে কী বোঝায়? মসজিদে আকসা বলতে কি সবুজ গম্বুজবিশিষ্ট মিহরাবসমৃদ্ধ ওই স্থানকে বোঝায়, যেখানে নামাজ আদায় করা হয়, নাকি সোনালি গম্বুজবিশিষ্ট ওই স্থাপনাকে বোঝানো হয়, যা মসজিদের সামনে একটি প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত; নিজস্ব সৌন্দর্যের কারণে যা অষ্টম আশ্চর্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করতে পারে? তাজমহল তো শুধু একটি রাজকীয় রুচি ও অস্থায়ী প্রেমের স্মারক, অপরদিকে এই গম্বুজ এক মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে নির্মিত। এবং আজ পর্যন্ত তা সেই উন্নত চেতনারই প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে, যার বাস্তবায়নে দুইজন প্রখ্যাত তাবেয়ি এর নির্মাণকাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বাস্তবে জোবায়দা ফোয়ারা এবং এই কুব্বাতুস সাখরা মানবনির্মিত এমন দুটি স্থাপত্য, যা যেকোনো বিবেচনায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থাপত্যশৈলীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; বরং নির্মাণের পটভূমি ও নির্মাণের উদ্দেশ্যের বিবেচনায় অন্যান্য যেকোনো

Scanned by CamScanner

নির্মাণের চেয়ে ঢের উৎকৃষ্ট হিসেবে অভিহিত হওয়ার দাবিদার। কিন্তু পশ্চিমাদের হিংসাত্মক মনোভাবের কারণে এই স্থাপনাগুলো সেভাবে মূল্যায়িত হয়নি।

এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে মুসলিম ঐতিহাসিক ও গবেষকদের দুটি মত লক্ষ করা যায়। কেউ কেউ প্রথমটিকে মসজিদে আকসা মনে করেন, আবার কেউ মনে করেন দ্বিতীয়টিকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের ওপর প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। চিন্তা করতে গেলে মূলত এই প্রশ্নটি এমন—যেন কোনো ব্যক্তি লাহোরের শাহি মসজিদ সম্পর্কে প্রশ্ন করল যে, শাহি মসজিদ বলতে কী বোঝায়? সামনের দিকের ওই ছাদযুক্ত ভবন, যেখানে গম্বুজ এবং দরজা সংযুক্ত রয়েছে, নাকি পেছন দিকের ওই খোলা আঙিনা, যার সাথে ছোট ছোট কক্ষ নির্মিত রয়েছে? অথবা যেন কেউ করাচির বায়তুল মুকাররাম মসজিদ নিয়ে প্রশ্ন করল যে, মসজিদাকৃতির মূল স্থাপনাটি মসজিদ, নাকি উত্তর দিকের গম্বুজবিশিষ্ট ভবনটি মসজিদ?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এটাই হতে পারে যে, মূলত মসজিদ কম্পাউন্ডের অন্তর্গত সব স্থাপনাগুলো মিলেই পরিপূর্ণ মসজিদ। পুরো ওই সম্পত্তিটিকেই মসজিদ হিসেবে অভিহিত করা হবে, যা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে। হ্যাঁ, তন্মধ্যে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। কিছু জায়গা নামাজ পড়ার জন্য, কিছু জায়গা জ্ঞানচর্চার জন্য, কিছু জায়গা অন্যান্য কাজের জন্য। এমনিভাবে মসজিদে আকসা শব্দটির প্রয়োগ চার দেয়ালের ভেতরে পরিপূর্ণ ওই স্থানের ওপর করা হয়, যা ইবাদাতের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে। এই চার দেয়ালের ভেতরের প্রতিটি ইট, প্রতি ইঞ্চি জায়গা কিয়ামাত পর্যন্ত সময়ের জন্য মসজিদ হিসেবে নির্ধারিত। এর প্রতিটি কণার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সমস্ত মুসলমানের কাঁধে বর্তাবে, যতক্ষণ তাদের হৃদয়-স্পন্দন বাকি থাকবে। এই চার দেয়ালের ভেতরে বেশ কিছু স্থাপনা রয়েছে। যেমন : বেশ কয়েকটি মাদরাসা, ওয়াজ ও জ্ঞান চর্চার আসরের জন্য নির্মিত চত্বর, লাইব্রেরি, ইসলামি জাদুঘর, ফোয়ারা, কুয়া এবং বাগান। কিন্তু তন্মধ্যে দুটি স্থাপনা অধিক পরিচিত। একটি হচ্ছে কিবলার দিকে নির্মিত সবুজ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদাকৃতির স্থাপনা, যেখানে মিহরাবে দাউদ রয়েছে এবং যাকে মানুষেরা 'মসজিদে উমর' নামে অভিহিত করে। অন্যটি হচ্ছে মসজিদের আঙিনায় অবস্থিত সোনালি গম্বুজ, যা একটি প্রাকৃতিক গুহাপৃষ্ঠে অবস্থিত পাথরের ওপর নির্মিত।

Scanned by CamScanner

এখান থেকে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি যে, মুসলমানদের প্রথম কিবলা বলতে কোন স্থাপনাটি বোঝানো হয়? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেই বর্ণিত পাথরটির মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আমরা জানতে পারব।

কুরআনে কারিমে দ্বিতীয় পারার শুরুতে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি পূর্ববর্তী কিবলাকে কিবলা বানিয়েছি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে...'—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রায় সকল মুফাসসির লিখেছেন, 'প্রথম কিবলা বলতে এই প্রাকৃতিক পাথরখণ্ডটিকে বোঝানো হয়'।[১১] যে অল্প কয়েকজন মুফাসসির এই কিবলাকে 'বায়তুল মাকদিস' বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তারাও পরিপূর্ণ বায়তুল মাকদিস বলতে শুধু এই পাথরটিকেই বুঝিয়েছেন। তাদের কিতাবে এ কথা রয়েছে যে, এই পাথরটি ইসা আ.-সহ পূর্ববর্তী সকল নবির কিবলা ছিল। এবং সেদিকে ফিরেই রাসুল ﷺ হিজরতের পর ১৬ মাস যাবৎ নামাজ পড়েছিলেন। সে সময় মসজিদে আকসার বর্তমান কাঠামো নির্মিত ছিল না। পূর্বনির্মিত কাঠামো যা-ই ছিল, কিন্তু তা-ও অনেকটাই পরিত্যক্ত ছিল। এমনকি ইহুদিদের সাথে বিদ্বেষবশত খ্রিষ্টানরা এই পাথরটিকে ময়লা-আবর্জনার স্তূপে পরিণত করেছিল। হজরত উমর রা. সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে এই পাথরটিকে পূর্বের মতো পরিচ্ছন্ন করেন।

আজকালের ইহুদি এবং তাদের গৃহপালিত চতুর গবেষকরা এই পাথরের ব্যাপারে মুসলমানদের এ দাবির কথা উল্লেখ করে যে, এখান থেকে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ মিরাজে গিয়েছিলেন। তারপর এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বাস্তবে এই পাথরের সবচে বড় মর্যাদা হচ্ছে এই যে, এটি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-সহ অন্যান্য নবিগণের এবং মুসলমানদের সর্বপ্রথম কিবলা ছিল।

এই পাথরের অন্যান্য মর্যাদাও বিভিন্ন রিওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন : এ পাথরের সঙ্গে জান্নাতের চারটি ফোয়ারার সম্পৃক্ততা, অথবা এর সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত মিষ্টি পানির সম্পৃক্ততা, এ পাথর আকাশের সঙ্গে ঝুলন্ত হওয়া, এই স্থানে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া। কিন্তু এই বর্ণনাগুলো প্রতিটিই বিতর্কিত। অবশ্য الصخرة من الجنة (অর্থাৎ, 'এই পাথরটি জান্নাতের

---

[১১] *রুহুল মাআনি : ২/৮; আল বাহরুল মুহিত : ১/৪২৩; তাফসিরে কুরতুবি : ২/১৫১; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৫৯; তাফসিরে মাদারিক : ১/৮৮; আদ দুররুল মানসুর : ২/৩৪৩; তাফসিরে তাবারি : ১/১০৬* ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

অংশ'[১২])—এই হাদিসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে মানগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য 'হাসান' পর্যায়ের হাদিস। তাই এ কথা প্রায় নিশ্চিত যে, হাজরে আসওয়াদের মতো কুব্বাতুস সাখরার পাথরটিও জান্নাত থেকে এসেছে এবং উভয়টিই মুসলমানদের কাছে সম্মানিত।

এই পাথরটি যেহেতু ইহুদিদেরও কিবলা ছিল, তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উপাখ্যানমতে তাওরাতের মূল কপি এই পাথরের আশেপাশে কোথাও প্রোথিত রয়েছে এবং সুলায়মানি কাঠামো এই পাথরের ওপর নির্মিত ছিল, তাই তারা এই পাথরের ওপর থেকে মুসলমানদের কাঠামো ধ্বংস করে তাদের কল্পনাপ্রসূত সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের তোড়জোড় দেখাচ্ছে। যদিও তাদের অযৌক্তিক পরিকল্পনায় মূলত ধর্মীয় অনুভূতির চেয়ে রাজনৈতিক কারণই প্রাধান্য পেয়েছে। ইহুদি বিশ্বাসমতে যুগ যুগ ধরে তাদের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার সমাপ্তি দাজ্জালের হাত ধরে পৃথিবীব্যাপী ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। আর দাজ্জালের আবির্ভাবের জন্য তার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া হচ্ছে পূর্বশর্ত। দাজ্জালের রাজসিংহাসন হবে এই গম্বুজের নিচে অবস্থিত পাথরটির ওপর। তাই তারা যেকোনো উপায়ে এই গম্বুজটিকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। এ ক্ষেত্রে অনেক গবেষককে ব্রেকিং নিউজ স্টাইলে এই গবেষণা পেশ করতে দেখা যায় যে, 'আসল মসজিদ তো ওই হলরুমের নাম, যেখানে নামাজ আদায় করা হয়। তাই সোনালি গম্বুজকে মসজিদে আকসা হিসেবে পরিচয় করানো ঠিক নয়।' কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মসজিদে আকসা বলতে মসজিদ কম্পাউন্ডের চার দেয়ালের ভেতরে অবস্থিত সম্পূর্ণ স্থাপনাকেই বোঝায়। এ মসজিদের প্রতি ইঞ্চি জায়গাই পবিত্র ভূমির অংশ ও ইসলামি ঐতিহ্যের স্মারক এবং উভয় স্থাপনাই স্ব স্ব গুরুত্ব ও ঐতিহ্য বহন করে। তাই এই মসজিদের কোন অংশটি আসল আর কোনটি আসল না—এ আলোচনায় লিপ্ত হওয়া অহেতুক, নির্বোধোচিত তর্ক।

মূলত ইহুদিরা এই চার দেয়ালের সম্পূর্ণ এরিয়াকেই নিজেদের করে পেতে চায়। যা তাদের সুলায়মানি টেম্পলের[১৩] পরিকল্পিত ডিজাইন দেখে বোঝা যায়। তাই আমাদের উচিত গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বহীন অংশের তর্কে লিপ্ত না হয়ে সম্পূর্ণ ঐতিহ্যকেই সংরক্ষণের জিম্মাদারি নেওয়া। সম্প্রতি হিংস্রতা ও

---

[১২] *মুসনাদে আহমদ* : ৭/২৯৭ হাদিস নং ২০৩৬৬; *মুসতাদরাকে হাকিম* : ৩/৬৭৮ হাদিস নং ৬৫৪২ এবং *সুনানে ইবনে মাজাহর* চিকিৎসা অধ্যায়ে ২৪৭ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে।

[১৩] সুলায়মানি কাঠামো : তাদের ধারণামতে সুলায়মান আ.-এর হাতে নির্মিত কাঠামো।

Scanned by CamScanner

অমানবিকতার পতাকাবাহী অবৈধ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন ঘোষণা করেছে যে, ১৪ মে ইসরাইলের বিজয় দিবস মসজিদে আকসায় উদযাপন করা হবে। ইতিপূর্বে এখানে সুলায়মানি কাঠামোর পুনঃনির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনেরও চেষ্টা করা হয়েছে। এসব মূলত তাদের মূল পরিকল্পনার জন্য টেস্ট কেস হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। তারা মুসলমানদের ইমানি শক্তির পরীক্ষা নিচ্ছে। ইহুদি ইঞ্জিনিয়াররা সিনাই উপদ্বীপে বায়তুল মাকদিসের মডেল নির্মাণ করে সেখানে কমান্ডো হামলার পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী করে। এ ধরনের হিসাব-নিকাশ করে যে, যদি এই স্থাপনাকে ডিনামাইট দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে এর ধ্বংসস্তূপ কোন দিকে পড়বে। কারণ, এর পাশেই ইহুদিদের বসতি রয়েছে। সাথে সাথে তারা এই স্থাপনার মূল ভিত্তিকে এতটা দুর্বল করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, যেন ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে তা এমনিতেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এ ছাড়াও তারা ছক কষছে, কীভাবে 'উইলিং ওয়াল' বাদে পুরো মসজিদটি ধ্বসিয়ে দেওয়া যায়।

তাদের সামনে এখন সবচে বড় বাধা হচ্ছে তাদের যেকোনো কৌশলকে হার মানিয়ে দেওয়া ফিদায়ি হামলায় উদ্বুদ্ধ ফিলিস্তিনি জনগণ। যদিও তারা পুরো পৃথিবীকে নিজেদের কৌশলে আয়ত্তাধীন করতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু ফিলিস্তিনি জনগণ এটা ধরে নিয়েছে যে, শত্রুরা যদিও তাদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছে; কিন্তু মৃত্যুর অধিকার তো তাদের নিজেদের হাতেই রয়েছে। তাই ফিদায়ি হামলার মাধ্যমে তারা সেই অধিকারকে প্রয়োগ করছে।

ফিলিস্তিনের উলামায়ে কিরাম এই আত্মঘাতী হামলাকে শুধু বৈধতা নয়; বরং শাহাদাতের সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে ফাতওয়া দিয়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এই ফাতওয়া তখন দেওয়া হয়েছে যখন কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামীরা এই পদ্ধতির সাথে পরিচিতই ছিল না। ফিলিস্তিনের বীরসেনানীরা পৃথিবীর কোনো প্রান্ত থেকে সাহায্য না পাওয়া সত্ত্বেও হতাশ না হয়ে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। তারা ফিদায়ি বোমা হামলার এমন টেকনোলজি প্রয়োগ করে যাচ্ছেন, যার প্রতিরোধ-কৌশল পৃথিবীর জঘন্যতম মেধার অধিকারী ইহুদিরা আজ পর্যন্ত বের করতে পারেনি। তাই এখন তারা মসজিদকে ধ্বংস করার প্রকাশ্য পরিকল্পনাকে নিজেদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে পরিত্যাগ করলেও বিভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। সম্প্রতি তারা সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের অন্য একটি প্রক্রিয়া পরিকল্পনাধীন রেখেছে। আর তা হচ্ছে, সোনালি

Scanned by CamScanner

গম্বুজের ওপর অত্যাধুনিক লেজার টেকনোলজি প্রয়োগ করে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ করা।[১৪] যেটি ত্রিমাত্রিকভাবে শূন্যে সোনালি গম্বুজের ওপর স্থাপন করা হবে।

ইসহাক হাতেমিন নামক এক ইহুদি প্রকৌশলী এই প্রস্তাবনা পেশ করেছে। তারপর ধর্ম বিকৃতকরণে পারদর্শী ইহুদি পণ্ডিতরা এই প্রস্তাবনা নিয়ে তাদের ধর্মীয় পুস্তকাদি খুঁজে ফিরছে যে, এতে করে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পূর্বশর্ত বাস্তবায়ন হয়েছে বলে ধরা হবে কি না? এই পদ্ধতি অবলম্বনে তাদের মুক্তির দিশারী দর্শন দেওয়ার মাধ্যমে দাউদি বংশের বিশ্ব নেতৃত্বের স্বপ্ন পূরণ করবে কি না? এভাবে কি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে? তাদের হারিয়ে যাওয়া সাকিনা[১৫] এবং নবিদের বরকতময় চিহ্নগুলো কি তারা ফিরে পাবে?

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ইহুদিরা তাদের ধর্মগুরুদের মিথ্যা মনগড়া প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে। তাই এভাবে হলেও তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; চাই এর জন্য বাস্তবতা-বিবর্জিত উপায়ই অবলম্বন করা হোক না কেন। কিন্তু মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে শত্রুবেষ্টিত হওয়ার পরও ইবলিসের তাগুতি শক্তির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত নয়। হজরত দাউদ আ.-এর উত্তরসূরি হওয়ার মিথ্যা দাবিদাররা তার নামের ডঙ্কা বাজিয়ে চলছে আর তার সত্যিকার উত্তরসূরিরা ওই পাথরকে চুম্বন করাই যথেষ্ট মনে করছে, যা যুগের জালুতদের মস্তক বিদীর্ণ করে দিতে পারে। গুয়ানতানামো বে থেকে শুরু করে আবু গারিব কারাগার পর্যন্ত এই তিক্ত সত্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাতেরা পূর্বপুরুষদের সাহসিকতার প্রতি অবিচার করে তাদের আত্মাকে কষ্ট দিয়েই চলছে। এর মৌলিক কারণ হচ্ছে এই যে, এরা وهن অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও শহিদি মৃত্যুর প্রতি অনাগ্রহ এবং سمن তথা বিনোদন-আসক্তিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে তারা ইমানের ওই উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা সচেতনতাকে জাগ্রত করে মৃত আত্মায় ইমানি প্রাণের সঞ্চার করত। আবু গারিব কারাগারের ভয়ানক ঘটনাগুলো সামনে আসার পর এরচে জঘন্য কোনো ঘটনার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, যা আমাদের পশ্চিমা নীতির পূজা এবং সাময়িক কর্মসূচিকে বাদ দিয়ে ধারাবাহিক কার্যকারী পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করবে?

---

[১৪] এ থেকেই বোঝা যায়, সোনালি গম্বুজ ধ্বংস করা তাদের একটি মৌলিক পরিকল্পনা।

[১৫] শান্তি; স্বস্তি।

Scanned by CamScanner

# দাউদ আ.-এর সিংহাসনের পুনরুত্থান

[পাঠকদের এ অধ্যায়ে দাউদ আ.-এর সিংহাসন সম্পর্কে জানানো হবে। অনেকেই এই পরিভাষাগুলো সম্পর্কে অবহিত নন। কিন্তু এখন আর কোনো দশকের দূরত্ব নয়; বরং কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো পৃথিবী এই বস্তুগুলোকে চিনে নেবে। হয়তো আজ যে বস্তুগুলো সবার কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছে, কালকের প্রজন্মের প্রত্যেকের কাছে সে বস্তুগুলো অত্যন্ত পরিচিত হয়ে থাকবে।]

## লাল বাছুরের কুরবানি

পবিত্র এই পাথরের ব্যাপারে সামনে জানতে পারবেন যে, ইহুদিরা এর ওপর কর্তৃত্ব এবং অধিকার লাভের জন্য তাদের ক্রয়কৃত এজেন্টদের মাধ্যমে জীবনবাজি রেখে চেষ্টা করে চলছে। তাদের ধর্মবিশ্বাসমতে তারা এই পাথরের ওপর বিশুদ্ধ লাল রঙের গরু কুরবানি দিতে চায়। যার অভাবে এতদিন ধরে তারা ধর্মীয় অভিশপ্ততায় ভুগছে। এই গোত্র ধর্মীয়ভাবে পবিত্র ছিলই বা কবে! কিন্তু এদের দ্বিতীয় বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের মুক্তির দিশারী দাজ্জালের আবির্ভাবের প্লাটফর্ম তৈরি করা। আর সেই প্লাটফর্ম হচ্ছে এই পাথরের ওপর 'তৃতীয় সুলায়মানি কাঠামো' নির্মাণ করা। তাদের ধর্মীয় ভাষায় একে তৃতীয় কাঠামো এ জন্য বলা হয় যে, এই কাঠামোর প্রথম নির্মাণ খ্রিষ্টপূর্ব ১ হাজার সালে হয়েছিল; কিন্তু তাদের পাপকর্মের ফলশ্রুতিতে দুইবার এই কাঠামো ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। এই উভয় হামলার কথা কুরআনে কারিমের ১৫ তম পারার প্রথমাংশে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমবার খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে ইরাকের সম্রাট বুখতেনাসার মসজিদে আকসাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। ইহুদি নারী ও শিশুদের বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায় এবং এ অঞ্চলকে পরিত্যক্ত অঞ্চলে

Scanned by CamScanner

পরিণত করে। কিন্তু পুনরায় ইহুদিদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয় এবং ১৫০ বছর পর তারা এর পুনঃনির্মাণ করে। কিন্তু অভিশপ্ত এই সম্প্রদায় তাদের অন্যায় অপকর্ম থেকে বিরত না থাকায় আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রোমানদের চাপিয়ে দেন এবং হজরত ইসা আ.-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার ৪০ বছর পর রোমান সেনাপতি টাইটিস সেই কাঠামোকে ধূলিসাৎ করে দেয়।

৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত সেই কাঠামো পুনঃনির্মিত হয়নি এবং ইহুদিরা অভিশাপের বোঝা নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই ঘটনার প্রায় ২ হাজার বছর অতিবাহিত হতে চলছে আর বর্তমানে তারা দাবি করছে, এখন তারা এখানে মসজিদ এবং গম্বুজ গুঁড়িয়ে দিয়ে তৃতীয় সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ করতে ইচ্ছুক। তাদের ধারণামতে, এতে করে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে দাউদ আ.-এর সিংহাসনে আরোহণ করবে। সেই দাজ্জালের হাত ধরেই ইহুদিদের নতুন পৃথিবীর বিপ্লব সংঘটিত হবে। এর মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে শুধু ইহুদিদের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তখন তারা সিদ্ধান্ত নেবে—ইহুদিভিন্ন পৃথিবীর অন্য ধর্মের মানুষদের মধ্য থেকে কারা তাদের সেবাদাস হিসেবে বেঁচে থাকবে আর কারা বেঁচে থাকার অধিকার হারাবে।

## শত্রু বিনাশের মহড়া

ইহুদিদের শত্রু বিনাশের মহড়ায় খ্রিষ্টানরা তাদের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু তারা এ কথা ভালোভাবেই জানে যে, অভিশপ্ত ইহুদিরা সম্মানিত নবি হজরত ইসা আ.-কে নিস্তার দেয়নি। তারা তার উম্মাতের প্রতি কল্যাণকামী হবে কীভাবে? কিন্তু আজন্ম শত্রুতায় লিপ্ত দুটো সম্প্রদায় আজ আশ্চর্যজনকভাবে একে অপরের বন্ধুত্ব অর্জন করেছে; কিন্তু শেষাবধি তাদের এক সম্প্রদায়ের হাতেই কি অপরটির বিনাশ ঘটবে? এর বিস্তারিত বিবরণ অনেক রোমাঞ্চক এবং শিক্ষামূলক।

ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের শত্রুতা প্রায় ২ হাজার বছর ধরে চলে আসছে। আজ থেকে ১০০ বছর আগের ইতিহাসেও এ দুজাতির বৈরিতা, খ্রিষ্টানদের হাতে ইহুদিদের লাঞ্ছনার অজস্র উদাহরণ বিদ্যমান। খ্রিষ্টানদের মতে ইহুদিরা হচ্ছে পৃথিবীর সবচে নিকৃষ্ট প্রাণী। এই অভিশপ্ত ও ঘৃণ্য জাতিগোষ্ঠীকে খ্রিষ্টানরা যেকোনো সুযোগে লাঞ্ছিত করতে সচেষ্ট থাকত।

Scanned by CamScanner

অবশ্য এর দুটো মৌলিক কারণও ছিল। প্রথমত ইহুদিরা হজরত ইসা আ.-কে কাফির ও মুরতাদ ঘোষণা করেছিল। পাশাপাশি হজরত মরিয়ম আ.-এর ব্যাপারেও তারা অপবাদ দিত। এই অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের হাতে হজরত ইসা আ. অনেক নির্যাতিত হয়েছিলেন; এমনকি খ্রিষ্টানদের ধারণামতে, এরা হজরত ইসা আ.-কে হত্যা করে ফেলে। খ্রিষ্টানদের এই ধারণা কাদিয়ানিদের ধারণার কাছাকাছি। তারাও হজরত ইসা আ.-এর জীবিত থাকাকে স্বীকার করে না।[১৬]

দ্বিতীয়ত খ্রিষ্টানদের ধারণামতে কিয়ামাতের পূর্বে হজরত ইসা আ. পুনর্জীবিত হবেন এবং পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। এর বিপরীতে হতভাগা ইহুদিরা পুনর্জীবিত হওয়া ইসা আ.-কে দাজ্জাল মনে করে। এবং তাঁর বিপরীতে কানা দাজ্জালকে সত্যের প্রতীক বলে বিশ্বাস করে। এ ধরনের মিথ্যা বিশ্বাসের কারণে ইহুদিদের সর্বদা অভিশপ্ত মনে করা হতো।

এ কারণেই তখন পৃথিবীর যেকোনো স্থানে যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য এই অভিশপ্ত গোষ্ঠীকেই দায়ী করা হতো। এমনকি একবার ইউরোপে ব্যাপকহারে প্লেগ মহামারি ছড়িয়ে পড়লে খ্রিষ্টানরা এর জন্য ইহুদিদের দায়ী করে। অথচ এই মহামারিতে অনেক ইহুদিও মৃত্যুবরণ করেছিল। ইহুদিদের এই কঠিন দুর্দশায় যদি কেউ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তো তারা হচ্ছে মুসলমান। মুসলমানরা তাদেরকে আহলে কিতাব মনে করে সামান্য জিজিয়া করের বিনিময়ে তাদের ধর্মীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রদান করে। যুগ যুগ ধরে ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের দ্বন্দ্বের এই উপাখ্যান ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী ধরে ইহুদিরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে খ্রিষ্টানদেরকে নিজেদের সহযোগী বানিয়ে নিয়েছে। আজ পশ্চিমারা—যারা কিনা ইহুদিদের আজন্ম শত্রু ছিল—তারা মুসলমানদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবীব্যাপী ইহুদি-খ্রিষ্টান দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটেছে। প্রাচীন সেই শত্রুতা আজ সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতায় পরিণত হয়েছে। এখন তো পশ্চিমা অনেক খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ও গবেষক রয়েছে, যারা ইহুদিদের চেয়ে ইসরাইলের বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী। ইহুদিদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের তুলনায় তারা বেশি প্রতিক্রিয়াশীল।

---

[১৬] অথচ কুরআনে কারিমে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে যে, হজরত ইসা আ.-কে মত্যুর পূর্বে আল্লাহ আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানদের ভাবা উচিত, তাদের নবিকে তারা বেশি সম্মান করে নাকি মুসলমানরা।

Scanned by CamScanner

## খ্রিষ্টানদের নতুন দল

ইহুদিরা খ্রিষ্টানদের নিজেদের সাথে ভেড়ানোর জন্য প্রথমে খ্রিষ্টানদের একতাকে ধ্বংস করার কৌশল হিসেবে মার্টিন লুথার নামে একজন ইহুদিকে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সে খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট নামে একটি দলের গোড়াপত্তন করে। এরা মূলত খ্রিষ্টানদের একটি নতুন দল। মূল খ্রিষ্টান হচ্ছে ক্যাথলিক খ্রিষ্টান[১৭], তারপর অর্থোডক্স খ্রিষ্টান[১৮]। এভাবে খ্রিষ্টানরা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এই ধর্মগত বৈষম্য খ্রিষ্টানদের একের পর এক বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়। বিশেষ করে প্রোটেস্ট্যান্টরা, যাদের প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল প্রতিবাদী মানসিকতার ওপর। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রুপ ইহুদিদের তৈরি এবং তাদের এজেন্ট ছিল। বিশেষ করে 'ব্যাপটিস্ট' (The Baptist) খ্রিষ্টানরা, আরও বিশেষ করে 'ইভানজেলিস্ট' (The Evangelist) খ্রিষ্টানরা মূলত ইহুদিদের এজেন্ট ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইহুদিরা যখন স্পেন থেকে বের হয়ে আমেরিকা এসেছিল এবং 'নিউ ইয়র্ক'কে 'জিউ ইয়র্ক' বানিয়েছিল তখন ইহুদিদের সাথে সাথে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের ভয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানরাও আমেরিকায় চলে আসে। বর্তমান আমেরিকার তারাই সংখ্যাগুরু।

আমেরিকার কুখ্যাত বেআদব পাদরি জিরি পলওয়েল, পাট রবার্টসন এবং জর্জ রুটস-এর মতো বিস্তৃত প্রচারমাধ্যমের অধিকারী ধর্মপ্রচারকরাও অতি দ্রুত তৃতীয় মহাযুদ্ধের কামনা করে; যাতে শক্তিশালী ইসরাইল আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তারাও তৃতীয় সুলায়মানি থার্ড টেম্পল বা তৃতীয় কাঠামো নির্মাণের প্রবক্তা হয়ে উঠে, যেখানে দাউদ আ.-এর সিংহাসনে দাজ্জাল আরোহণ করে পুরো পৃথিবী শাসন করবে। এসব মতবাদে ইহুদি এবং খ্রিষ্টানরা একমত। কিন্তু ইহুদিদের ধারণা হচ্ছে, দাজ্জাল এসে দাউদ আ.-এর সিংহাসনে আরোহণ করবে। খ্রিষ্টানদের ধারণা হচ্ছে, ইসা আ. দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে দাউদ আ.-এর এর সিংহাসনে আরোহণ করবেন।

খ্রিষ্টানরা ভাবছে, ফিলিস্তিন মূলত হজরত ইসা আ.-এর বাসস্থান। তিনি পুনর্জীবিত হয়ে এখানেই আসবেন। কিন্তু তাদের মাধ্যমে যেহেতু মুসলমানদের হাত থেকে এ অঞ্চল ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়, তাই তারা

---

[১৭] রোমান।

[১৮] গ্রিক মতবাদে বিশ্বাসী খ্রিষ্টান।

Scanned by CamScanner

ইহুদিদের সহযোগিতা করছে, যেন তারা মুসলমানদের হাত থেকে এ অঞ্চলকে নিজেদের দখলে নেয়। এবং তারা ভাবছে, হজরত ইসা আ.-এর পুনরাগমন ঘটলে ইহুদিরা খ্রিষ্টবাদকে গ্রহণ করবে। কিন্তু এই নির্বোধ সম্প্রদায়ের এই জ্ঞানটুকুও নেই যে, যারা প্রথমবার তাদের নবিকে মানতে পারেনি, ওরা দ্বিতীয়বার কী করে এই নবির উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।

## হাজার বছর ধরে

সর্বশেষ কিছু আলোচনা হজরত দাউদ আ.-এর সিংহাসন 'থ্রোন অব ডেভিড' (Throne of David) সম্পর্কে। ইহুদি ধারণামতে, সেটি ওই পাথর, যার উপর হজরত দাউদ আ.-এর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল এবং এই পাথরের সিংহাসনের উপর বসেই হজরত সুলায়মান আ. প্রাণীকুল তথা মানুষ, জিন ও পশু-পাখির উপর রাজত্ব করেছিলেন। এই পাথরটি সুলায়মানি কাঠামোতে সংরক্ষিত ছিল। যখন রোমান জেনারেল টাইটাস এই স্থাপনাকে ধ্বংস করে তখন এই পাথরখণ্ডটি রোম শহরে নিয়ে যায়, যেখানে খ্রিষ্টানদের রাজত্ব ছিল। রোম শহর থেকে এই পাথর আয়ারল্যান্ডে পৌঁছেছিল। চতুর্দশ শতক থেকে এটি ইংল্যান্ডে অবস্থিত। আইরিশ, স্কটিশ এবং ইংলিশ রাজা-রানিদের রাজ অভিষেক এই পাথরের উপর হয়ে থাকে। এ কারণেই এই পাথরটি ইংল্যান্ডের রাজকীয় চার্চ ওয়েস্টমিনিস্টারে পালঙ্কসদৃশ সিংহাসনের নিচে স্থাপন করা হয়েছে; যা এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। ইহুদিদের ধারণামতে তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে ব্রিটিশ রানির নিয়ন্ত্রণ থেকে এই পাথরটি ছিনিয়ে নিয়ে স্ব স্থানে স্থাপন করার সময় এসেছে। খ্রিষ্টানদের ধারণা ছিল, প্রথম সহস্রাব্দের পর হজরত ইসা আ.-এর আগমন ঘটবে। কিন্তু যখন এটি বাস্তবায়িত হয়নি তখন ইহুদিদের বিশ্বাসমতো ওরাও ভাবছে যে, দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষে এখন হজরত ইসা আ.-এর পুনরাগমন ঘটবে। ওদের এই বিশ্বাসকেই সহস্রাব্দের বিশ্বাস বলা হয়।

মুসলমানদের মৌলবাদী বলে অভিহিত করা আমেরিকানদের এই অন্ধবিশ্বাস এতটাই প্রবল যে, রোনাল্ড রিগ্যানের মতো মধ্যপন্থী প্রেসিডেন্টও প্রায় ১১ জায়গায় এই বিশ্বাসের বিবৃতি দিয়েছিল। অনেক আমেরিকান এ কথা মনে করে যে, নিজেদের গৃহবিবাদ, ঋণখেলাপি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। কারণ, মহাযুদ্ধের মাধ্যমে সকল সমস্যার

Scanned by CamScanner

সমাধান মিলবে। এই উদ্দেশ্যে উভয় আহলে কিতাব[১৯] নিজেদের আজন্ম শত্রুতা ভুলে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। নিজেরা একাত্ম হয়ে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু জাজিরাতুল আরবসহ প্রভাবশালী ইসলামি দেশগুলোতে অথবা তাদের আশেপাশে নিজেদের গোপন সেনাক্যাম্প নির্মাণ করে রেখেছে। যেন মুসলমানদের পক্ষ থেকে যেকোনো প্রতিবাদী মুহূর্তে তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ করা যায়। তাদের এসব কর্মকাণ্ড কিয়ামাতের পূর্বলক্ষণ এবং দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের প্লাটফর্ম তৈরির জোরদার প্রচেষ্টা। কিন্তু মুসলমানরা হাদিসে এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী আসা সত্ত্বেও যেকোনো ধরনের ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। সমগ্র পৃথিবীর মাধ্যমে, বিশেষ করে সাউদি আরব ও পাকিস্তানের মাধ্যমে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানের প্রচেষ্টা, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের গ্রেপ্তারের[২০] মাধ্যমে মূলত সেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে।

শায়খ ইয়াসিন ও শায়খ রানতিসির শাহাদাত মূলত সেই মহাযুদ্ধেরই প্রারম্ভিকা। ফিলিস্তিনি যুবক ও শিশুরা নিজেদের অসহায়ত্ব সত্ত্বেও পাথর ও গুলতি নিয়ে ময়দানে অবস্থান করছে। আর যারা এদের দায়িত্বশীল হতে পারত, সেই নেতৃত্বধারীরা আরব ভূমিতে খ্রিষ্টানদের মিত্র হিসেবে তাদের সৈন্যদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে চলছে। যা মূলত ফোরাত নদী পর্যন্ত ইসরাইলের একক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার নামান্তর। এর মাধ্যমে কি আমরা আমাদের ধ্বংসের কাউন্টডাউন নিশ্চিত ধরে নিয়েছি?

---

[১৯] যদিও ওরা কিতাব বিকৃত করে মুসলমানদের জন্য প্রতিশ্রুত সকল বিষয় নিজেদের জন্য বলে দাবি করে।

[২০] সাদ্দাম হোসেনকে ইহুদিরা যথেষ্ট ভয় পেত। তাদের আশঙ্কা ছিল, নতুন যুগের বুখতেনাসার হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

Scanned by CamScanner

## পরিবর্তনশীল নীতি

ইহুদিবাদ ও জিওনিজম নামে দুটি পারিভাষিক শব্দ রয়েছে। অন্য আলোচনা শুরু করার আগে এ দুটি পরিভাষা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা আবশ্যক। যেমনিভাবে ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ রয়েছে, যার মধ্যে একটি বিশ্বাসজনিত, অন্যগুলো কর্মজনিত। এমনিভাবে ইহুদি ধর্মের চারটি মূল স্তম্ভ রয়েছে। কিন্তু হতভাগা এ জাতি যুগে যুগে স্তম্ভগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করেছে।[২১] ধর্মীয় মূল স্তম্ভগুলোর সংখ্যা ও শিরোনাম যুগে যুগে ওরা নিজেদের ইচ্ছামতো বদলে নিয়েছে। বর্তমানে তারা এ ধর্মের মূল স্তম্ভ চারটি বলে প্রচার করে। কিন্তু বাস্তবে এ স্তম্ভগুলোর আলোচনা তাওরাতেও নেই, হজরত মুসা আ.-এর বাণীতেও নেই। অবশ্য মূলনীতি চারটির বিস্তারিত বিবরণ পড়ার মাধ্যমেই পাঠক তা অনুধাবন করতে পারবেন। আসুন, ইহুদিদের চারটি মূলনীতি সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়া যাক।

১. একাত্মবাদে বিশ্বাস। খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদের বিপরীতে ইহুদিরা মূলত একাত্মবাদে বিশ্বাসী। যদিও কখনো কোনো নবিকে, আবার কখনো নিজেদের আল্লাহর পুত্র দাবি করে শিরকে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে কুফরি জাদুটোনা অথবা বিভিন্ন কুফরি রীতিনীতিতে লিপ্ত হয়। তবুও নিজেদের তারা একাত্মবাদে বিশ্বাসী বলে দাবি করে।

২. প্রতিশ্রুত মাসিহের আগমন। ইহুদিদের ধর্মবিশ্বাসমতে, শেষ যুগে তাদের একজন মুক্তিদাতার আগমন হবে, যিনি তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে হাজার বছরের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেবেন। এ কারণেই ইহুদিদের কিছু দল ইসরাইলের হানাদারি মনোভাব এবং এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সমর্থন করে না। তাদের ধারণামতে, প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রতিশ্রুত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কিয়ামাতের পূর্বে যে মাসিহের আগমন ঘটবে, তার দায়িত্ব। এটি ইহুদিদের কর্তব্য নয়। এ কারণে এরা ইসরাইলের

---

[২১] যদিও ইহুদিধর্ম বর্তমানে ধর্মীয় রূপের চেয়ে ব্রাহ্মণদের মতো একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

বর্তমান কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ। কিছুদিন পূর্বে এরা লন্ডনে এরিয়েল শ্যারনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করেছে। কিন্তু কট্টরপন্থী জায়নিস্টদের বিরুদ্ধে এরা অনেকটাই কোণঠাসা। হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীমতে, মাসিহ দাজ্জালের আগমন তো হবে, কিন্তু সে ইহুদিদের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারবে না; বরং ইহুদিদের সাথে নিয়ে সে-ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

৩. আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দল। অর্থাৎ, তারা বিশ্বাস করে ইহুদিরাই এই পৃথিবীতে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত এবং পছন্দনীয় দল; যদিও তারা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারে না যে, যদি তারা আল্লাহর মনোনীত দল হয়ে থাকে তাহলে কেন যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় ভুগছে।

৪. ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে ইহুদিদের স্বচ্ছলতা ও উন্নতির জন্য আলাদা ইহুদি রাষ্ট্র গঠনে একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

## জায়নবাদ কী

উপরিউক্ত ইহুদিদের চারটি ধর্মীয় মূল স্তম্ভের মধ্য থেকে জায়নবাদীরা শুধু শেষোক্ত দুটি বিশ্বাস পোষণ করে। অর্থাৎ তাদের ধারণামতে ধর্মীয় বিপ্লবের মূল ভিত্তি হচ্ছে শেষোক্ত দুটি বিশ্বাস। এ লক্ষ্য পূরণে যেকোনো ধরনের কৌশল অবলম্বনকে তারা বৈধ মনে করে। মোদ্দাকথা, ইহুদিবাদ হচ্ছে একটি ধর্ম এবং এর সমর্থকরা নিজেদের ধর্মীয় গোষ্ঠী বলেই মনে করে। এর বিপরীতে জায়নবাদ একটি রাজনৈতিক আন্দোলন; যা ইহুদি গোষ্ঠী কর্তৃক আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র বিশ্ব থেকে ইহুদিদের সেই রাষ্ট্রে এনে তাদের সুযোগ-সুবিধার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ধর্মীয় অন্যান্য কাঠামো তাদের নেই। এমনকি অন্য ধর্মের যে-কেউ এই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে জায়নিস্ট হতে পারে। এ কারণেই খ্রিষ্টান, মুসলমান এবং নাস্তিকদের মধ্য থেকে যারাই তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকেও জায়নবাদী হিসেবে গণনা করা হয়। মুসলমান এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতে যারা ধর্মীয় কাজ পালন করে না, তারা খাঁটি ধর্মভীরু নয়। কিন্তু ধর্মীয় কোনো রীতিনীতি পালন না করেও নিজেদেরকে সাধারণ ইহুদিদের চেয়ে উত্তম মনে করা এবং ইহুদিদের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাকেই তারা খাটি ইহুদির পরিচায়ক মনে করে। একটু

Scanned by CamScanner

ভাবুন, এটি কি ধার্মিকতা না শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস? কোনো ইহুদি স্বগর্বে এ কথা বলতে পারবে না যে, এটি ছিল তাওরাতের শিক্ষা বা হজরত মুসা আ.-এর দীক্ষা।

## মিথ্যা প্রপাগান্ডা

আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলদের সম্পর্কে মিথ্যা বলা, এমনকি আসমানি কিতাবসমূহকে মিথ্যার মাধ্যমে পরিবর্তন করে তদীয় শিক্ষাকে বিকৃত করা ইহুদিদের জঘন্যতম অভ্যাস। যা আজও ইহুদিদের অভিশপ্ততার বড় কারণ। আল্লাহ এবং তাঁর আসমানি কিতাবসমূহের ব্যাপারে এরচে বড় মিথ্যা আর কী হতে পারে যে, আল্লাহ এই কিতাবসমূহ কেবলমাত্র মানুষদের একটি গোষ্ঠীর জন্য অবতীর্ণ করেছেন। এই নির্বাচিত একটি গোষ্ঠী ব্যতীত অন্য কোনো মানুষ সে ধর্মে প্রবেশ করতে পারে না, তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে না, পরকালীন মুক্তিও লাভ করবে না। ইহুদিদের বিশ্বাসমতে, কারও মা যদি ইহুদি হয়, শুধু সে-ই ইহুদি ধর্মের অনুসারী হতে পারে।[২২] আর নিজেদের ইহুদি ধর্মের প্রতি তাদের আন্তরিকতার নমুনা হচ্ছে এই যে, জায়নবাদের জনক ইহুদিদের হিরো হাঙ্গরি নাজাদ ও থিয়োডর হার্টজিল যখন জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল, তখন মসজিদে আকসার পশ্চিম দেয়ালের[২৩] পাশে পৌছে সর্বপ্রথম যে খাবারটি খেয়েছিল তা হচ্ছে, শূকরের মাংসের তৈরি সমুচা। অথচ ইহুদি ধর্মে শূকরের মাংস নিষিদ্ধ। আর তাদের বিশ্বাসমতে, ওই স্থানটি কান্নাকাটি এবং তাওবা করার স্থান। কিন্তু সেখানে উপস্থিত কোনো ইহুদি পণ্ডিতের সাহস হয়নি যে, তাকে বাধা দেবে বা সে-ও এই অবৈধ কাজটিতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ভাবেনি। কেননা, একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি তাদের বিশ্বাসমতে একজন ইহুদি যতই পাপিষ্ঠ হোক, সে যদি দাজ্জালের অপেক্ষা করে, নিজেকে অন্য সকলের চেয়ে উত্তম ভাবে এবং ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়, তাহলে সে ইহুদি ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তি। এ বিশ্বাসগুলোই বলে দেয়, ইহুদিরা তাদের ঐশী কিতাব এবং তদীয় শিক্ষাকে কতটা বিকৃতি করেছে।

---

[২২] অবশ্য বর্তমানে ইসরাইলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইয়াহুদি রাব্বিগণ এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কারও যদি শুধু বাবাই ইহুদি হয়, তাকেও ইহুদি বলে গণ্য করা যাবে।

[২৩] বোরাক প্রাচীর, যেটিকে তারা ক্রন্দনের দেয়াল বা Willing Wall বলে থাকে।

Scanned by CamScanner

## ন্যূনতম সম্পর্ক

সারকথা হচ্ছে, মিথ্যা ও বিকৃতির বেড়াজালে নিপতিত ইহুদিজম আজ যদিও চারটি মৌলিক তত্ত্বে বিশ্বাসী; কিন্তু এর মধ্যে একাত্মবাদে বিশ্বাসের দাবি শুধু মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য। এ ছাড়া বাকি তিনটি মৌলিক বিশ্বাসের মূলকথা হচ্ছে, যেকোনোভাবেই নিজেরা বা অন্যদের সাহায্য নিয়ে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই নতুন তত্ত্বে বিশ্বাসী ইহুদি-মতবাদ যেহেতু ঐশী ইবাদাতের স্থলে বস্তুবাদ, জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় চেতনার ধ্বজা বহন করে, তাই তারা যেকোনোভাবে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের তুচ্ছ কামনা চরিতার্থ করার জন্য হজরত মুসা আ.-এর ঐশী বাণীর সাথে সম্পৃক্ততার দাবি করে জনসাধারণকে আক্রমণমুখী করে রাখতে সচেষ্ট। এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিচ্ছে।

পাঠকগণ হয়তো ইহুদিদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিকল্পনা, রাষ্ট্রের আয়তন এবং এই পবিত্র ভূমির ব্যাপারে তাদের পৈতৃক অধিকার দাবির কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না। তাই আমরা এখানে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। এই আলোচনায় এটাও ফুটে উঠবে যে, ফিলিস্তিনের মুসলমানরা এ ব্যাপারে কতটা নির্যাতনের শিকার। আর তাদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত না করে আমরা কতটা উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছি। তাই আসুন, এখানে প্রথমে ইহুদি রাষ্ট্র তথা জায়নবাদী রাষ্ট্র সম্পর্কে ইহুদিদের বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করি।

## টাইগ্রিস থেকে নীলনদ

কুরআনে কারিমে বলা হয়েছে যে, বনি ইসরাইলরা হজরত সুলায়মান আ.-এর রাজ্যে এমন বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করত, যা শয়তানরা আনয়ন করেছিল।[২৪] মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদি *তাফসিরে মাজিদিতে* এবং *জুগরাফিয়ে কুরআন* নামক কিতাবে লিখেছেন, যা হজরত সুলায়মান আ.-এর রাজ্য নীলনদ থেকে দজলা নদী তথা টাইগ্রিস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহুদিরা সুলায়মানি রাজত্ব ফিরে পেতে অত্যন্ত তৎপর। এই অভিশপ্ত ইহুদিরা হজরত সুলায়মান আ.-এর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ে তাঁর অবাধ্যতা করা সত্ত্বেও নিজেদের তার উত্তরসূরি বলে দাবি করে। তাদের বিশ্বাসমতে,

---

[২৪] সুরা বাকারা : ১০২।

Scanned by CamScanner

তাওরাতে তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—*'হে ইসরাইল, তোমার ভূমি নীলনদ হতে দজলা নদী পর্যন্ত।'*

এখানে অবশ্য রাজ্যের দৈর্ঘ্যের বর্ণনা দেওয়া আছে। তাই কোনো কোনো ইহুদি এর সাথে এ কথাও বৃদ্ধি করে যে, *'এবং উরজ গাছ থেকে খেজুর গাছ পর্যন্ত'*। উরজ পাইন গাছকে বলা হয়, যা লেবাননে অনেক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পাইন গাছ লেবাননের জাতীয় চিহ্ন। লেবাননের জাতীয় পতাকায়ও এই গাছের চিত্র রয়েছে। এবং খেজুর গাছের শহর বলে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর শহর মদিনা মুনাওয়ারাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইহুদিরা হজরত সুলায়মান আ.-এর জীবদ্দশায় তাঁর অবাধ্যতা এবং বেআদবিতে লিপ্ত হলেও আজ তারা সুলায়মানি রাজ্য ফিরে পেতে বদ্ধপরিকর। তাই তাদের পতাকায় যে নীল রেখা রয়েছে—যা দাজলা এবং নীলনদের ইঙ্গিতবাহী—সেখানে দুটি ত্রিভুজের সাহায্যে ছয় কর্ণবিশিষ্ট একটি ইসরাইলি তারকা রয়েছে। যা মূলত এ অঞ্চলগুলোতে জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। প্রথম ত্রিভুজের তিনটি কর্ণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐশী বাণী, সৃষ্টজীব এবং মুক্তি। আর দ্বিতীয় ত্রিভুজের তিনটি কর্ণের ইঙ্গিত হচ্ছে স্রষ্টা, ইসরাইল এবং পৃথিবী। তারকার কর্ণগুলোর ইঙ্গিতসমূহ পাঠকগণ ভেবে দেখতে পারেন।

ইসরাইল যখন মিসরে নিজেদের দূতাবাস তৈরি করতে চায়, মিসর কর্তৃপক্ষ তাদের নদীর এপারে স্থান দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ইসরাইলি প্রতিনিধি দল এতে সন্তুষ্ট না হয়ে নদীর ওপারে দূতাবাসের জায়গা দেওয়ার জন্য জোর দাবি জানায়। কারণ, তাদের মতে নীলনদের এপার পর্যন্ত ইসরাইলের সীমানা আর দূতাবাস তো হয়ে থাকে অন্য দেশের ভেতরে। একটু ভাবুন, আল্লাহ এবং রাসুলদের অভিশপ্ততা নিয়ে এ জাতি কতটা দুরাশায় লিপ্ত। আর আমাদের অযোগ্যতা এবং ধর্মবিমুখতার সুযোগে তারা কতটা পরিকল্পনা আঁটছে।

Scanned by CamScanner

# সুয়েজ খালের পাড়ে

## দ্বন্দ্বের শুরু

হজরত মুসা আ.-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ইসলামি দায়িগণের জন্য জীবন্ত আদর্শ। এ কারণে কুরআনে কারিমের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে তার আলোচনা এসেছে। হজরত মুসা আ.-এর কাঁধে যখন নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব এসে পড়ল, তখন তিনি মহান আল্লাহর বড়ত্বের বাণী নিয়ে ফেরাউনের রাজধানী মুমফিস[২৫] নামক শহরে পৌছলেন। সেদিন থেকেই এক চিরন্তন দ্বন্দ্বের শুরু। একদিকে ছিল কল্যাণকামিতা ও সহমর্মিতার বাণী, অপরদিকে ছিল গোঁয়ার্তুমি ও দাম্ভিকতার প্রদর্শনী। একদিকে ছিল আত্মিক সাধনা, ভালোবাসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে ছিল বস্তুবাদ, আমিত্ব ও অহংকার। ধাপে ধাপে বেড়েচলা এ দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি হয়, যখন ফেরাউন নিজস্ব বাহিনী নিয়ে লোহিত সাগরের সুয়েজ উপসাগরে উত্তাল ঢেউয়ে নিমজ্জিত হয়ে অহংকার ও দাম্ভিকতার পরিণতির উদাহরণে পরিণত হয়। অবশ্যই বিবেকবানদের জন্য এটি একটি শিক্ষণীয় ঘটনা।

## দীন ও দুনিয়ার নেতৃত্ব

মহান আল্লাহর সাথে হজরত মুসা আ.-এর সম্পর্ক এবং কথোপকথন, পাশাপাশি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য-সহযোগিতার ইতিহাস ইমান বৃদ্ধির সহায়ক। যা আল্লাহর ওপর ভরসা এবং বিশ্বাসের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে।

হজরত মুসা আ.-এর দায়িত্ব ছিল দুটি। প্রথমত ফেরাউনের মতো প্রভুত্বের দাবিদার ব্যক্তিকে আমিত্বের খোলস থেকে বের করে আনার চেষ্টা কর, যেন তার মধ্যে অহংকারী ভাবের বদলে বিনয়ের অভ্যাস তৈরি হয়; যার ফলে সে নিজেকে মানুষের উপর একক কর্তৃত্ববান বলে মনে না করে। দ্বিতীয়ত বনি ইসরাইলকে নিজস্ব স্বাধীন ভূমিতে নিয়ে যাওয়া, যেন তারা সেখানে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে—যারা কিনা মিসরে কিবতিদের হাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক অন্যায়-অবিচার ও বর্ণবৈষম্যের শিকার ছিল।

---

[২৫] স্থানটি নীলনদের ডেল্টা প্রণালীর শুরুতে অবস্থিত।

Scanned by CamScanner

মোটকথা হজরত মুসা আ.-কে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে দীন ও দুনিয়ার এক দারুণ মিশ্রণ ছিল। তিনি অতি মর্যাদাসম্পন্ন নবি হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক ময়দানে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোগ্য নেতা ছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী, উভয় ক্ষেত্রে তিনি যোগ্যতার এমন স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যা পরবর্তী উম্মাতের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে। উম্মাতে মুহাম্মাদির আলিমগণ—যারা ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্বশীল—তাঁদের জন্য হজরত মুসা আ.-এর জীবনী বিভিন্ন আঙ্গিকে কুরআনে কারিমে তুলে ধরা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে তাঁর জীবনী শিক্ষণীয় বিভিন্ন নীতিমালায় পরিপূর্ণ।

## জঘন্যতম দুটি দল

হজরত মুসা আ. যখন মাদায়েন শহর থেকে ফেরার পথে তুর পাহাড় হয়ে মিসরে পৌছলেন, দুটি শিবির থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হলেন। একদিকে ফেরাউনের মতো দাম্ভিক অহংকারী-অত্যাচারী শাসক; যে কিনা মোসাহেবদের স্তুতিবাক্যে অভ্যস্ত। তাকে কল্পিত মিথ্যা প্রভুত্বের দাবি থেকে বের করে মহান আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেওয়া। অন্যদিকে বনি ইসরাইলের মতো লাগামহীন অগোছালো গোষ্ঠীকে শরিয়তের পথে আনা এবং স্বৈরাচারী শাসকের কবল থেকে নিরাপদে তাদের বের করে নেওয়া। উভয় কাজই কঠিন, কষ্টসাধ্য ও অত্যন্ত ধৈর্যের পরীক্ষা ছিল। উভয় ময়দানে তাঁকে একাই পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এ দীর্ঘ সফরে নিজের বৈপিত্রেয় ভাই ব্যতীত তাঁর সহযোগিতামূলক সঙ্গ দেওয়ার কেউ ছিল না। যে কিনা সম্পূর্ণ আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে তার সহযোগী হতে পারে। ইমানি শক্তি ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের কতটা উন্নত স্তরে তিনি অবস্থান করতেন—ফেরাউনের দরবারে তাঁর উপস্থিতিই এ কথার জানান দেয়। যখন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তির অধিকারী সম্রাট তার মৃত্যুদণ্ডের ফরমান জারি করে, যার প্রভাবে পুরো রাজসভায় পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। সভাসদদের কথা বলার কোনো সাহস ছিল না। আর পুরো দেশে মুসা আ.-এর সাথে তাঁর ভাই ব্যতীত অন্য কোনো সহমর্মীও ছিল না। কিন্তু তিনি সাহসিকতার সাথে তার রাজসভায় দাঁড়িয়ে তাকে মিথ্যা প্রভুত্বের দাবির পরিবর্তে সত্যপ্রভুর অনুসারী হওয়ার আহ্বান করেন—যে দুটি ব্যাপার ছিল ফেরাউনের সবচে অপছন্দনীয়।

Scanned by CamScanner

## চিকিৎসার সিদ্ধান্ত

ফেরাউন প্রথমে প্রমাণাদির মাধ্যমে কথা বলা আরম্ভ করেছিল। হজরত মুসা আ. যখন নবুওতের দাবিকে প্রমাণের জন্য মুজিজা তথা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন, তখন তার দাবি খণ্ডনের জন্য ফেরাউন জাদুকরদের ডেকে পাঠায়।

মিসর আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাদুকরদের উপস্থিতি ছিল এবং মূর্খ গ্রামবাসীরা জাদুকরদের যথেষ্ট সম্মান করত। ফেরাউনের আহ্বানে দূরদুরান্ত থেকে জাদুকররা নিজ নিজ নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে রাজদরবারে উপস্থিত হলো। ফেরাউন এতটাই গোঁয়ার প্রকৃতির ছিল যে, সে সভাসদদের বলে রেখেছিল, 'আমরা জাদুকরদের কথা শুধু তখনই মানব, যদি তারা বিজয়ী হয়। আর যদি তারা মুসা আ.-এর অলৌকিক শক্তিকে জাদু না বলে মুজিজা হিসেবে স্বীকার করে, তাহলে আমরা তাদের কথা মানব না।' সুতরাং জাদুকররা যখন মুসা আ.-এর অলৌকিক শক্তিকে মুজিজা হিসেবে ঘোষণা করল, বিবেক ও মানবতার শত্রু এই স্বৈরাচারী ফেরাউন জাদুকরদের মুসা আ.-এর সহযোগী আখ্যা দিয়ে হত্যা করে ফেলে।

ফেরাউনের গোঁয়ার্তুমি যখন এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে, নতুন করে আর সুযোগ দেওয়ার অবকাশও থাকেনি তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অসুস্থ মস্তিষ্কের চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

## অলৌকিক ঘটনা

বনি ইসরাইলকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা রাতের মধ্যেই মিসর ত্যাগ করে। সকাল হতেই তারা মুমফিস শহর থেকে বেরিয়ে সুয়েজ উপসাগরের অদূরে উপনীত হয়। কিবতিরা দেখল, আজ তাদের কাজ করার জন্য বনি ইসরাইলের কেউ আসছে না। খোঁজখবর নিয়ে যখন তারা তাদের পলায়নের সংবাদ শুনতে পেল, তখন তারা তাদের পিছু ধাওয়া করতে শুরু করল। তারা এটা বুঝতে পারেনি যে, তারা বনি ইসরাইলের পিছু ধাওয়া করছে না; বরং মৃত্যু তাদের পিছু ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে।

মুসা আ. স্বজাতিকে নিয়ে সুয়েজ উপসাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার মুখোমুখি হলেন। পেছনের উড়ন্ত ধুলো ফেরাউনের বাহিনীর উপস্থিতির জানান দিচ্ছিল। অল্পসময়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার রাস্তা নির্মাণ অথবা সিনাই মরুভূমির দিকে

Scanned by CamScanner

রাস্তা পরিবর্তনের উপায় ছিল না। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও হজরত মুসা আ. বিশ্বাসের দেয়ালে একটু আঁচড়ও লাগতে দেননি। আর তখনই আল্লাহর রহমতে নদীতে জোয়ার আসে। পানির ডুবিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তার মধ্যেই রাস্তা তৈরি করে দেন। হজরত মুসা আ.-এর গোত্র সাগর পাড়ি দিয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে পৌঁছালেন। এদিকে ফেরাউনের গোত্র নিশ্চিন্তে একে জোয়ার-ভাটার খেলা মনে করে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ততক্ষণে সুয়েজ উপসাগরের বিক্ষুব্ধ উর্মিমালা আগের মতো; বরং তার চেয়েও উন্মত্ত হয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

## অস্থি-মজ্জাহীন পশু

ঢেউয়ের মুখে নিপতিত হয়েই ফেরাউনের গোষ্ঠী হুঁশ ফিরে পায়। মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে তারা কান্নাকাটি শুরু করে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তাওবার সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর তাতেই সমুদ্রের বুকে তাদের সলিল সমাধি ঘটে। কালের বিবর্তনে ফেরাউনের শরীর আজও হারিয়ে যায়নি। কোনো ধরনের রাসায়নিক ব্যতীত আজও তার লাশ মিসরের জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। যা দেখতে চামড়া মাংস ছিলানো পশুর কঙ্কালের মতো মনে হয়। কেমন যেন অস্থি-মাংসহীন কঙ্কালের হাঁড়গুলো দাম্ভিক মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদারদের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ তাদের বংশধররা সেদিনের দয়ার কথা ভুলে গিয়েছে। ফিলিস্তিনের নিরীহ মুসলমান ও শিশুদের উপর তারা ফেরাউনি স্টাইলের এমন নির্যাতন চালাচ্ছে, তা থেকে তারা অতীতে আল্লাহর কাছে মুক্তি চাইত। নিজেদের সেই দুর্দিনের কথা ভুলে গিয়ে তারা আজ মুসলমান শিশুদের এমনভাবে হত্যা করছে, যেভাবে ফেরাউনের সৈন্যরা তাদের শিশুদের হত্যা করত। যে সুয়েজ[২৬] উপসাগরের পারে আল্লাহ তাদের অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, আজ সেখানেই তারা নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অগণিত মুসলমানদের হত্যা করছে। হয়তো-বা অচিরেই তারা নিজেদের এই কুকর্মের ফল ভোগ করবে; যেদিন তাদের লাশ দেখে অন্যরা ঘৃণায় মুখ লুকাবে।

---

[২৬] সিনাই উপদ্বীপ এবং সুয়েজ উপসাগরের কথা কুরআনে কারিমে বিভিন্ন শিরোনামে এসেছে। কুরআনের ভূগোল তত্ত্ববিদদের মতে, সুয়েজ উপসাগরেই ফেরাউনের বাহিনীর সলিল সমাধি ঘটেছিল।

Scanned by CamScanner

# ফিলিস্তিনের সমস্যা

[জেরুসালেমের বিরুদ্ধে ইহুদিদের হৃদয়বিদারক চক্রান্ত,
শিক্ষণীয় বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক প্রমাণাদি]

## শতবর্ষ পূর্বে

*'যদি আমি এ কনফারেন্সের সিদ্ধান্তগুলোকে এককথায় প্রকাশ করতে চাই তাহলে বলতে পারি, আজ থেকে ৫০ বছর পর পৃথিবী একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র দেখতে পাবে।'*

১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসিল শহরে ইহুদি পণ্ডিতদের এক সেমিনারে উপরের কথাগুলো বলা হয়েছিল। আর এ কথাগুলো বলেছিল আন্তর্জাতিক জায়নবাদের প্রতিষ্ঠাতা 'থিয়েডর হার্জল' (Theodor Herzl)। লাঞ্ছনার বেড়াজালে আবদ্ধ পৃথিবীর তাবৎ বড় ইহুদি পণ্ডিতরা সে সেমিনারে উপস্থিত হয়েছিল।

সেখানে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আজ থেকে সমস্ত ইহুদির সম্মিলিত প্রচেষ্টা হবে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে এ কনফারেন্সের প্রায় ৫০ বছর পর পবিত্র ভূমিতে জায়নবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করল। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রায় এক বছর পর অভিশপ্ত ইহুদিরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। তাই ১৪ মে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়।

Scanned by CamScanner

## ধূর্ততার ফাঁদ

ওই কালো দিনের পর আরও প্রায় ৫০টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আর যতই সময় অতিক্রান্ত হচ্ছিল, ফিলিস্তিনিরা দিন দিন ততই নতুন বিপদের আবর্তে জড়িয়ে যাচ্ছিল। নতুন শতাব্দির শুরু থেকেই অসহায় ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও কয়েকগুণ বেড়ে চলছে। বর্তমানে মিরাজের পবিত্র ভূমিতে এমন কোনো দিন অতিবাহিত হয় না, যেদিন মুসলমানের রক্ত ঝরে না। এক শহিদের লাশের জানাজা থেকে ফিরতে না ফিরতেই অন্য শহিদের লাশ জানাজার জন্য প্রস্তুত করতে হচ্ছে।[২৭]

ইহুদিদের নির্মম বর্বরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিটি মুসলমান আজ ব্যথিত। কিন্তু তারা পৃথিবীর বর্বরতম অত্যাচারের সামনে আর্তনাদ ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া কিছুই করতে পারছে না। ফিলিস্তিনের মুসলমানরা এত অসহায় কীভাবে হলো? ইহুদিরা মুসলমানদের ধূর্ততার ফাঁদে কীভাবে আটকে ফেলল, যে ফাঁদ থেকে মুসলমানরা কোনোভাবেই বের হতে পারছে না? ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বর্তমান সমস্যার সমাধানই বা কী?

এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের শতবর্ষ পূর্বে গিয়ে জায়নবাদী ইহুদি পণ্ডিতদের সেদিনের সেমিনারের পটভূমি, সেদিন থেকে ইহুদিদের চক্রান্ত এবং মুসলমানদের সরলতার উপাখ্যানের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এর পূর্বে ফিলিস্তিনের প্রাচীন ইতিহাস এবং এ বরকতময় ভূমির কিছুটা স্মৃতিচারণ করব, যা হতে পারে আমাদের ইমানি চেতনা বৃদ্ধির কারণ।

## ঐতিহাসিক ভূমি

ফিলিস্তিন পৃথিবীর এমন ভূখণ্ড, যা ভৌগলিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মহান আল্লাহ এ ভূখণ্ডকে প্রাকৃতিক পদার্থে ভরপুর করার পাশাপাশি ঐশী বিভিন্ন মর্যাদার অধিকারী করেছেন। বেশ কয়েকজন মর্যাদাবান নবি এ ভূখণ্ডে প্রেরিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বীরদের বিজয়গাথা এ ভূমিতেই রচিত হয়েছিল।

এ পবিত্র ভূমি ঐতিহাসিক এত উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়েছিল, যা অন্য কোনো ভূমির ক্ষেত্রে ঘটেনি। প্রসিদ্ধি রয়েছে, এ ভূখণ্ডে হজরত ইয়াকুব আ.-

---

[২৭] ফিলিস্তিনি শহিদদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক এবং শিশু। যার মাধ্যমে মূলত ইয়াহুদিরা মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে।

Scanned by CamScanner

এর সন্তানদের থেকেই মানববসতি শুরু হয়। বাস্তবে এর বহু পূর্বকাল থেকেই এ অঞ্চলে মানবসভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে]। এ অঞ্চলে হজরত দাউদ আ. এবং হজরত সুলায়মান আ.-এর শাসনামলে বনি ইসরাইলদের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়।

এ সম্মানিত নবিগণের পরবর্তী সময়ে অভিশপ্ত ইহুদিদের অবাধ্যতায় মহান আল্লাহ তাদের ওপর এমন শত্রুদের চাপিয়ে দিয়েছিলেন, যারা তাদের ওপর জঘন্যতম গণহত্যা চালিয়েছিল। কিছুসংখ্যক যারা বেঁচে ছিল, তাদের দাসে পরিণত করা হয় অথবা নির্বাসিত করা হয়। কোনো জাতির এমন গোষ্ঠীগত লাঞ্ছনা ও নির্বাসনের দৃষ্টান্ত অতীতে আর দেখা যায়নি। কুরআনে কারিমের ভাষ্যমতে এটি মূলত অভিশপ্ত জাতির প্রতি মহান আল্লাহর এমন শাস্তি, যা তারা নিজেদের কৃতকর্মের মাধ্যমে অর্জন করেছিল। এ ব্যাপারে ইতিহাস আমাদের ইরাকের শাসক বুখতেনাসার ও রোমান সেনাপতি টাইটিসের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। যারা ইহুদিদের নিজ বাসস্থান থেকে বাস্তুচ্যুত করে লাঞ্ছনার চাদরে জড়িয়ে দিয়েছিল। ইরাক, পারস্য ও রোমানসহ আরও অন্যান্য শাসকরা ইহুদিদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালালেও উল্লেখিত দুজন ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ।

## সর্বশেষ সতর্কবাণী

অভিশপ্ত ইহুদি জাতির প্রতি সর্বশেষ সতর্কবাণী ও ঐশী নিদর্শন ছিল হজরত ইসা আ.-এর আগমন। কিন্তু এই হতভাগা জাতি তাঁর অবাধ্যতা এবং তাকে নির্যাতনের মাধ্যমে লাঞ্ছনাকে চিরজীবনের জন্য নিজেদের সঙ্গী বানিয়ে নিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে আজ পর্যন্ত তারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে অভিশপ্ততার গ্লানি নিয়ে বিচরণ করছে। পৃথিবীর কোনো ভূমিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওদের আশ্রয় দিতে আগ্রহী হয়নি। এদের বিভিন্ন গোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করলেও পৃথিবীর কোনো স্থানই তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে আশ্রয় দেয়নি; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে শাপগ্রস্ত হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে অনেকের হাতে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হয়ে আসছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে গত শতাব্দীতে এই অভিশপ্ত জাতি নিজেদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু তারা এই অন্যায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুসলিম রাষ্ট্রের নিরীহ জনগণকে উচ্ছেদ ও নির্যাতনের শিকার বানিয়ে ভূমিদস্যুতায় লিপ্ত হচ্ছে, তাই এটি মুসলমানদের বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর

Scanned by CamScanner

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় এমন অমানবিক ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে, যা মানবতার ইতিহাসের এক লজ্জাজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।

## এক বিন্দু মাটিও নয়

এই পবিত্র ভূমি অভিশপ্ত ইহুদিদের হাতে গেল কী করে? এই দুঃখজনক ঘটনার বিবরণ অনেকটা এমন যে, ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্‌বাণীমতে, ১৬ হিজরি মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানরা ফিলিস্তিন বিজয় করে নেয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই পবিত্র ভূমি মুসলমানদের হাতে থাকায় এই অঞ্চলটি বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ ইসলামি ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হয়েছিল। দ্বাদশ শতকে মুসলমানদের হাত থেকে এই ভূমিকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ইউরোপীয়রা ক্রুসেড যুদ্ধের আয়োজন করে। একপর্যায়ে তারা সফলতাও অর্জন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ইসলামি মহানায়ক সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রক্তাক্ত যুদ্ধ শেষে বিজয়ী হন। তিনি খ্রিষ্টানদের এই ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে নবিদের স্মৃতিবিজড়িত ওই ঐতিহাসিক স্থানে মুসলমানদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিন উসমানি খিলাফাতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত এই খিলাফাতের অধীনেই থাকে। উসমানি খিলাফাতের শেষ দিনগুলোতেই জায়নবাদী নেতাদের ওই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার আলোচনা এই অধ্যায়ের শুরুতে করা হয়েছে।

উসমানি খিলাফাতের শেষ শাসক ছিলেন সুলতান আবদুল মাজিদ খান। উসমানি খিলাফাতের দুর্বলতার সুযোগে ফিলিস্তিন দখলে নিয়ে ইহুদিরা সেখানে নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নেয়। তৎকালীন উসমানি খিলাফাত বিভিন্ন বাহুল্য ব্যয়ের বোঝায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে প্রথমে তারা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের সার্থসিদ্ধি করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

ইহুদিরা সুলতানকে প্রস্তাব দিলো, যদি ফিলিস্তিনের ভূমি ওদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে ওরা খিলাফাতের যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করে আরও বড় অঙ্কের উপঢৌকন দেবে। যদিও উসমানি সাম্রাজ্যের তখন দুর্দিন চলছিল; কিন্তু সুলতানের দেহে তো তার দিগ্বিজয়ী বীর পূর্বসূরিদের রক্তধারা প্রবাহিত ছিল। সুলতান নিজের পায়ের নখ দিয়ে কিছু মাটি আঁচড়ে তুলে ইহুদিদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক উত্তরে বলেছিলেন, 'যদি তোমাদের সমুদয় সম্পত্তিও আমার পায়ে ঢেলে দেও, তবু ফিলিস্তিনের এই পরিমাণ মাটিও তোমাদের

Scanned by CamScanner

হাতে তুলে দেবো না।' অভিশপ্ত ইহুদিরা সেখান থেকে নিরাশ হয়ে পৃথিবীর অন্য কোনো শক্তির মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনার ডালি সাজাতে লাগল। কুরআনে কারিমের চিরন্তন সত্য ভাষ্যমতে ইহুদিরা সর্বদাই কারও না কারও আশ্রয় নিয়েই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবে। নিজেদের সামর্থ্যে কিছু করার সক্ষমতা তাদের কখনো হবে না।

## বালফোর ডেক্লারেইশন-Balfour Declaration

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। আমেরিকা এবং ব্রিটেন মিত্রশক্তির নেতৃত্বে ছিল। বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ স্থায়ী হওয়ায় ব্রিটেনে অর্থসংকট দেখা দেয়। ব্রিটেনের সাহায্যে ইহুদিরা তখন নিজেদের ধনভান্ডার উজাড় করে দেয়। এর বিনিময়ে ফিলিস্তিনে ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেন তাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা করবে বলে ইংল্যান্ড তাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। লন্ডনে জায়নবাদী সংস্থাগুলোর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ছিল। এদিকে ধনাঢ্য ইহুদিদের সাথে ব্রিটিশ রাজপরিবারের যথেষ্ট সখ্যতা ছিল। যুদ্ধের সমাপ্তিতে ইংরেজরা বিজয়ী হলে ইহুদিরা আশার আলো দেখতে পায়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ নভেম্বর ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'মি. বালফোর' (Mr Balfour) ব্রিটেনে বসবাসরত ইহুদি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান লর্ড শিল্ডের নামে একটি চিঠি পাঠিয়ে ছিল। সেই চিঠিতে জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছিল, 'ব্রিটেন সরকার ফিলিস্তিনভূমিতে ইহুদিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।' পরবর্তীকালে এই ঘোষণাকেই বেলফোর ঘোষণা ('বালফোর ডেক্লারেইশন'-Balfour Declaration) বলে অভিহিত করা হয়।

এই ঘোষণায় ফিলিস্তিনি মুসলমান নাগরিকদেরও অধিকার সংরক্ষণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। যা ছিল মূলত মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদকে থামিয়ে দেওয়ার কৌশল। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর বিজয়ের পর ইংরেজরা ১৯১৭ সালে জেনারেল এলএনবির নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। ১৯১৭ সালের ৯ ডিসেম্বর তারা ফিলিস্তিন দখল করে। জার্মান এবং তুর্কি বাহিনী সিরিয়ার দিকে চলে যাওয়ায় তখন থেকে ফিলিস্তিনে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

Scanned by CamScanner

## অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি

যুদ্ধ চলাকালীন ইংরেজরা যুদ্ধজয়ের কৌশল হিসেবে আরব ও ইহুদিদের সাথে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। আরবদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিতে এমন অস্পষ্টতা রাখা হয়, যেন পরবর্তীতে বিশ্লেষণের নামে প্রতিশ্রুতিকেই পাল্টে দেওয়া যায়। তাই আজ পর্যন্ত আরবদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবের মুখ না দেখলেও ইহুদিদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিগুলো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। যা মূলত ইহুদিপ্রীতির পাশাপাশি মুসলিম বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ।

আজ অনেক মুসলমান সাদা চামড়া ও দুষ্কৃতকারী ইংরেজদের অতীত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত নয়। কিন্তু বাস্তবে শূকর আকৃতির এ দুষ্কৃতকারী জাতির অনেক ঋণ মুসলমানদের খাতায় লেখা রয়েছে। যা হয়তো টগবগে রক্তের কোনো যুবকের জন্যই পরিশোধ করা সম্ভব। ব্রিটেনের ইহুদিরা ইংরেজদের ভালোভাবে ব্যবহার করেছিল। আর ইংরেজরাও ইহুদিদের পক্ষে কাজ করতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। জাতিসংঘ থেকে তারা ফিলিস্তিনের উপর ব্রিটিশদের সাময়িক শাসনের অধিকার মনজুর করিয়ে নেয়। তারপর ১৯২০ সালের ১ জুলাই ইংরেজ হাইকমিশনারকে সেই শাসনের দায়িত্বশীল বানিয়ে সেখানে প্রেরণ করা হয়।

## শিক্ষণীয় উপাখ্যান

'হার্বার্ট স্যামুয়েল' (Herbert Samuel) নামের এই প্রশাসক মূলত ইহুদি ছিল। কার্যকারী পরিষদের নেতৃত্বের পাশাপাশি সামরিক নেতৃত্বও তার হাতে ছিল। ব্রিটিশদের এই অন্তর্বর্তী শাসনের অধিকার ৩০ বছর মেয়াদী ছিল। আর তখনই মূলত ব্রিটেনের রানির তত্ত্বাবধানে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গোপনীয় তৎপরতা চলতে থাকে। ইংরেজদের ঘৃণ্য চক্রান্তে যখন জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় তখনই ১৯৪৮ সালে পারস্পরিক যোগসাজশে নিজেদের সাময়িক শাসনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। আর সেই বছরেই ১৪ মে ইহুদিরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা করে। ব্রিটেনের তত্ত্বাবধানে ইহুদিদের ক্রীড়নক হয়ে ইংরেজ শাসকেরা ফিলিস্তিনের মুসলমানদের সাথে যে প্রতারণা করেছে তা অনেক হৃদয়বিদারক, দুঃখজনক এবং শিক্ষণীয়। যা ফিলিস্তিনের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।

Scanned by CamScanner

## অন্যায়-অবিচারের উপাখ্যান

ব্রিটিশরা মধ্যপ্রাচ্য, উপমহাদেশ ও আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাথে যে অন্যায় আচরণ করেছে তা রীতিমতো ভয়ংকর। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের সাথে তাদের জঘন্য আচরণ ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নোংরা পর্যায়ের। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের আজকের প্রজন্ম তাদের এসব অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে মোটেও অবগত নয়। এই ইংরেজরাই হানাদারের বেশে আমাদের দেশে প্রবেশ করে আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের রাজকোষ সমৃদ্ধ করেছিল। তবুও তারা আজ নিশ্চিন্তে রয়েছে; কেউ তাদের অন্যায়ের ব্যাপারে অবগত না হওয়ায় প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তাও করবে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তুরস্কের উসমানি খিলাফাতের বিরুদ্ধে আরবদের সমর্থন ব্রিটেনের দরকার ছিল। এ ব্যাপারে তারা মক্কার প্রশাসক শরিফ হুসাইনের সাথে বৈঠক করে। এ বিশ্বাসঘাতক প্রশাসক তাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, আরবরা যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গ দেবে এবং এর বিনিময়ে যুদ্ধ সমাপ্তির পর তাদের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হবে।

ব্রিটেনের চক্রান্ত দেখুন, আরব ভূমিতে জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইহুদিদের ধন-সম্পদ লুট করছে। অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে আরবদেরও নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করছে।

যুদ্ধ বিজয়ের কিছুকাল পরেই তারা আরবদের স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সীমা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু ফিলিস্তিনভূমিতে যেহেতু তারা জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাই তারা একটি অহেতুক বিতর্ক উসকে দেয় যে, ফিলিস্তিন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলোর অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? অথচ আরব রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিন স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার দাবিদার।

## ইহুদিদের নতুন নিবাস

ইংরেজরা শুধু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও প্রতারণা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং নিজেদের তত্ত্বাবধানে জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ ক্ষেত্রে তারা মৌলিকভাবে দুটি পদক্ষেপ নেয়।

১. ইসরাইল রাষ্ট্রের নাগরিক বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিবর্ধন। যেহেতু আনুপাতিক হারে ইহুদিদের জনসংখ্যা ফিলিস্তিনে অনেক কম ছিল। তাই তারা চক্রান্তের কৌশল হিসেবে ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে ব্যাপক পরিমাণে ভূমি ক্রয় করতে

Scanned by CamScanner

আরম্ভ করল। আর খুঁজে খুঁজে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদিদের এনে সেখানে পুনর্বাসন করা শুরু করে। এ ক্ষেত্রে ইহুদি বিভিন্ন সংগঠন এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা জায়গা ক্রয়ের জন্য অঢেল পয়সা ব্যয় করতে শুরু করে। স্থানীয় উলামায়ে কিরাম শুরু থেকেই এর বিরোধিতা করেন এবং জনগণকে এ ধরনের জায়গা বিক্রয় করতে অনুৎসাহিত করেন। এ ক্ষেত্রে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুফতিগণের কাছ থেকে ফাতওয়া সংগ্রহ করেন। সর্বসম্মতিক্রমে মুফতিগণ ইহুদিদের কাছে জায়গা বিক্রি নাজায়েজ ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইলমি ব্যক্তিত্ব ও বুজুর্গ হজরত আশরাফ আলি থানবি রাহ. থেকেও ফাতওয়া চাওয়া হয়েছিল[২৮]। তিনিও এ ব্যাপারে অবৈধতার ফাতওয়া দিয়েছিলেন।[২৯] কিন্তু উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্রে মুসলমানদের দারিদ্রতা, অবহেলা ও ইহুদিদের চক্রান্তে স্থানীয় মুসলমানগণ তাদের কাছে জায়গা বিক্রি করতে থাকে। এরপর তারা ধীরে ধীরে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে ইহুদিদের এনে নবিদের এই পবিত্র ভূমিতে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে থাকে।

ব্রিটেনের তত্ত্বাবধানে গোপনে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। আর ধীরে ধীরে ইহুদি ও স্থানীয় আরব ফিলিস্তিনিদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯১৪ সালে যে ইহুদিরা এখানে মোট জনসংখ্যার ৯ শতাংশ ছিল ১৯২১ সালে তা ১১ শতাংশ ও ১৯৩১ সালে ১৭ শতাংশ গিয়ে পৌঁছে। ১৯৪৮ সালে যখন স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন সেখানে ইহুদিদের জনসংখ্যা ১৩.৫ শতাংশ ছিল। একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, ১৮৮০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ বহিরাগত ইহুদি এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

## মানচিত্র কথা বলে

ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। ইহুদিরা সব ধরনের নিয়ম-নীতি বর্জন করে ফিলিস্তিনের দিকে আগ্রাসী হতে শুরু করে। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নেতা হিটলারের ইহুদি নিধনের কাহিনিকে সাজিয়ে পৃথিবীবাসীর কাছে উপস্থাপনের মাধ্যমে সবার সহমর্মিতা আদায়ে

---

[২৮] এখান থেকে অনুমান করা যায় যে, তখন পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের কাছে দেওবন্দি আলিমদের কেমন গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

[২৯] *ইমদাদুল ফাতাওয়া* : ৩/৫৯।

Scanned by CamScanner

সক্ষম হয়। আর এ সহমর্মিতাকে পুঁজি করেই তাদের আলাদা রাষ্ট্র গঠন-পরিকল্পনাকে বৈধ করে নেয়। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে আপনারা জানতে পেরেছেন, কীভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদিদের এনে এখানে জড়ো করা হয়েছিল। আর এতদিনের প্রচেষ্টায় যখন ইহুদিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন তারা জায়গা ক্রয়ের পরিবর্তে সন্ত্রাস ও হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে স্থানীয়দের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। অবস্থা এ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে, ১ এপ্রিল ১৯৪৮ থেকে ১৫ মে ১৯৪৮ দেড় মাসে প্রায় ৪ লাখ স্থানীয় ফিলিস্তিনি মুসলমান এবং খ্রিষ্টান বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। যারা শরণার্থী হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যায়-অবিচারের অনেক বড় বড় উপাখ্যান রয়েছে। আধুনিক যুগে যখন প্রচারমাধ্যমের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হওয়ায় কোনোকিছুই গোপন থাকছে না। কিন্তু এই অবাধ প্রচারমাধ্যমের যুগেও এমন নির্লজ্জ দখলদারিত্ব ও নির্যাতনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই।

একটু অনুমান করুন যে, একদিকে শতবর্ষের স্থানীয় ফিলিস্তিনিরা শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে আর অন্যদিকে তাদের বাসভূমিতে বহিরাগত ইহুদিরা আনন্দে জীবনযাপন করছে। আমাদের সবারই ভালোভাবে জানা আছে যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো মুসলমানরা একে অপরের সাথে কতটা বৈরিতার সম্পর্ক রাখে এবং তাদের মধ্যে কতটা সংঘবদ্ধতার অভাব রয়েছে। অন্যদিকে এই অভিশপ্ত ইহুদিরা জেরুসালেমসহ অন্যান্য শহরগুলো কীভাবে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে সম্মিলিতভাবে ইহুদি বসতি নির্মাণের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে।

## সন্ধিপ্রিয় প্রতিবেশী

২. জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দ্বিতীয় যে পদক্ষেপটি গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়েছিল তা হচ্ছে, সব ধরনের সমরাস্ত্র ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ইসরাইলকে উন্নত করা। তাই আজ ইসরাইল পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোর একটি। পাশাপাশি ইসরাইলের প্রতিবেশী আরব দেশগুলোকে সামরিক দিক থেকে উন্নত হতে না দেওয়া। বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোতে এমন প্রশাসন তৈরি করা, যারা ইহুদিদের কাজে বাধা তৈরি করতে না পারে। আর যদি কেউ এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরির দুঃসাহস দেখায়, নৃশংস প্রক্রিয়ায় তা প্রতিরোধের চেষ্টা করা। আরব রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামি চেতনা ও জিহাদি প্রেরণা ধ্বংস করার

Scanned by CamScanner

লক্ষ্যে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে তাদের মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত বীজ বপন করা হয়েছে। যার ফলে আজ ইসরাইল পাঁচটি আরব ইসলামি দেশের মাঝখানে অবস্থান করলেও সন্ধিপ্রিয় প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে নিজেদের অনিষ্টতার কোনো আশঙ্কা করছে না। শুধু ফিলিস্তিনের নিরীহ মুসলমানরাই নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কোনো আরব রাষ্ট্র এই নিরীহ মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত নয়। অপরদিকে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের সমূলে ধ্বংস করতে ইসরাইলের পাশে পশ্চিমা শক্তিগুলোর প্রকাশ্য অবস্থান রয়েছে।

## প্রমাণের সাথে শক্তিও প্রয়োজন

অবস্থা দিন দিন ভয়াবহ হচ্ছে। কিছু লোক মনে করে, গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে এর সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গোলটেবিল বৈঠকে তো প্রমাণাদির মাধ্যমে আলোচনা হয়। কিন্তু ইহুদিরা যদি দলিল-প্রমাণেই সন্তুষ্ট হতো, তাহলে ফিলিস্তিনের বুকে রক্তের হোলি খেলায় লিপ্ত হতো না। যদি দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হতো, তাহলে পৃথিবীতে কোনো সমরাস্ত্র তৈরির প্রয়োজন হতো না। মানুষ কথাবার্তার মাধ্যমেই নিজেদের পাওনা আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু বাস্তবে দলিল যতই মজবুত ও সত্য হোক না কেন, তা বাস্তবায়নের জন্য শক্তির প্রয়োজন। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও অধিকার অর্জনের সাফল্য মূলত বাহ্যিক শক্তির হাতে বন্ধক। অন্যথায় নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও যুদ্ধের জন্য সৈন্যবাহিনী অনর্থক হয়ে যেত। তাই গোলটেবিল বৈঠক তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন দুটি পক্ষ সমান শক্তির অধিকারী হয় এবং আলোচনা ব্যর্থ হলে এক পক্ষ অন্য পক্ষ থেকে আক্রমণের ভয় করে। আলোচনার টেবিলে দলিলের ফাইল খোলার আগে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করা না গেলে শুধু আলোচনাই চলতে থাকবে; কিন্তু মাজলুমের নিপীড়ন কোনোভাবেই বন্ধ হবে না।

**হে একাত্মবাদে বিশ্বাসী সরল মুসলমানগণ! যে হতভাগা ইহুদিরা আল্লাহর প্রিয় নবিদের সম্মান করতে পারেনি, ওরা তোমাদের অধিকারের সম্মান কীভাবে দেবে? তাদের সাথে আলোচনায় বসা তখন পর্যন্ত অনর্থক হবে, যে পর্যন্ত সামরিক অঙ্গনে ওদের মোকাবিলা করার সামর্থ্য অর্জিত না হবে।**

Scanned by CamScanner

বাস্তবে ইহুদিরা মৃত্যুকে সবচে বেশি ভয় করে।[৩০] তাই তারা মুসলমানদের জিহাদি জজবা ও শাহাদাতের আগ্রহকে অনেক ভয় পায়। আর এ কারণে মুজাহিদদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে জড়ানোর চেয়ে আলোচনার ফাঁদে আটকে রাখতেই ওরা বেশি আগ্রহী। অথচ তাদের পক্ষের প্রমাণগুলো ঘর মোছার পুরোনো ন্যাকড়ার চেয়েও নিকৃষ্ট। যেমন তাদের সবচে বড় প্রমাণটি হলো, তারা ফিলিস্তিনের প্রথম অধিবাসীদের সন্তান। হাজারও বছর পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষগণ এই অঞ্চলে ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাই বিংশ শতাব্দীতে তারা পুনরায় ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বিভিন্ন জঘন্য পরিকল্পনা হাতে নেয়। কিন্তু পশ্চিমা লেখকসহ ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য সুত্রগুলো তো অন্য কথা বলছে। তারা সবাই একমত, ফিলিস্তিনি আরবদের পূর্বপুরুষগণ ইসলামি যুগেই এ দেশে আসেননি; বরং এই সেমেটিক জাতি খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৩ হাজার বছর থেকেই এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। অন্যদিকে ঐতিহাসিকগণ এই কথার ওপরও একমত যে, প্রাচীন হিব্রু জাতি[৩১] এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়; বরং ইরাক থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। মজার বিষয় হচ্ছে, ইহুদিরা যখন দেশান্তরিত হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদেরকে ব্যাপকভাবে বন্দি বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তখন থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বংশ পরম্পরা সংরক্ষিত হয়নি বা তাদের রক্তের সঠিক বংশধারা সংরক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে এ অঞ্চলের সেমেটিক নয়—এমন অনেক আদি বাসিন্দা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। বর্তমানের অধিকাংশ ইহুদিরাই সেমেটিক বংশীয় নয়। আবার ফিলিস্তিনের আরব মুসলমানরা হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলে অবস্থান করছেন। তারাই মূলত এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের উত্তরপুরুষ।

আর যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, ইহুদিরা ফিলিস্তিনের আদি শাসকদের উত্তরপুরুষ; তবুও ফিলিস্তিনের ওপর তাদের কর্তৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় না। ২ হাজার বছর পূর্বে অন্য ভূখণ্ড থেকে এসে এখানে শাসন পরিচালনা করার মাধ্যমেই তারা এ ভূখণ্ডের মালিক হতে পারে না। অন্যথায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন হওয়া প্রতিটি দেশের ওপর নিজেদের

---

[৩০] যেমনটি কুরআনে কারিমের সুরা বাকারা এবং সুরা জুমুআয় বর্ণিত হয়েছে।

[৩১] ইহুদিরা যাদের পূর্বপুরুষ মনে করে।

Scanned by CamScanner

মালিকানা দাবি করা যথার্থ হবে। তাহলে তো স্পেনের ওপর মুসলমানদের, আমেরিকার উপর রেড ইন্ডিয়ানদের এবং অস্ট্রেলিয়ার ওপর আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো। ইহুদিদের দাবির সাথে একাত্ম দেশগুলো কি তাদের রাষ্ট্রগুলোর উপর অন্যদের এ ধরনের মালিকানার অধিকারকে স্বীকার করে নেবে?

## ফাঁপা বেলুন

মোদ্দাকথা, ইহুদিদের দলিলগুলো যদিও ফাঁপা বেলুন বৈ কিছু নয়; তবুও তারা ও তাদের অনৈতিক কাজের সহযোদ্ধারা মুসলমানদের হাত থেকে অস্ত্র নামিয়ে আলোচনার নোটিশ ধরিয়ে দিতে আগ্রহী। কারণ, তারা জানে, যদি আলোচনার চতুরতায় এদের আটকে রাখা না যায়, জান্নাতি সুধা পানে আগ্রহী মুজাহিদগণ তাদের চরম দুরবস্থায় পতিত করবে। নতুন বিশ্বনেতৃত্ব যখন ব্রিটেনের হাত থেকে আমেরিকার হাতে আসে, ইহুদিরা আমেরিকাকেও নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। তাই আজ আমেরিকা এমন ঘুড়িতে পরিণত হয়েছে, যার নাটাই মূলত ইহুদিদের হাতে। ফিলিস্তিনের মুজাহিদরা রীতিমতো ওদের নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে। আর তাই ওরা ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে সামনে এনে ইয়াসির আরাফাতের মতো কাঠপুতলি নেতার মাধ্যমে আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করে মূলত বৃহত্তর ইসরাইলি সম্রাজ্যের নীলনকশা বাস্তবায়নে এগিয়ে চলছে। ফিলিস্তিনের জিহাদি নেতাগণ একদিকে জঘন্য জুলুম নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বা বিভিন্ন হামলায় নিহত হচ্ছেন, অন্যদিকে ইয়াসির আরাফাতের মতো ইহুদি স্ত্রী রাখা লৌহমানব(!) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বারবার মিসাইল হামলা হওয়া সত্ত্বেও অল্পের জন্য বেঁচে যান। শুধু তাই নয়, আজীবন ফিলিস্তিনের নেতৃত্ব দিয়ে রেকর্ড তৈরি করার পরিকল্পনাও করে ফেলছেন।[৩২]

---

[৩২] ইয়াসির আরাফাত ১১ নভেম্বর ২০০৪ সালে ফ্রান্সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ কেউ তাঁরই স্ত্রী 'সুহা'কে দায়ী করেন। অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন যে, তাঁর মৃ[illegible] পিছনে ইয়াহুদিদের গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-এর হাত রয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্রে বিষাক্ত পদার্থের আলামত পাওয়া যায়।

Scanned by CamScanner

## চূড়ান্ত লড়াই

কেউ কেউ আবার ইহুদিদের এসব কৌশল ও চালাকির উপাখ্যান শুনে ভাবতে পারেন, হয়তো ইহুদিরা তাদের অভিশপ্ততা ও লাঞ্ছনার শেকল ছিড়তে পেরেছে। আর ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়তো তাদের পরিপূর্ণ সফলতার মাইলফলক। কিন্তু কুরআন-হাদিসের গভীর পাণ্ডিত্য থাকলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ফিলিস্তিনে ইহুদিদের এই ব্যাপক সমাবেশ মূলত তাদের চূড়ান্ত পরাজয় তথা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রারম্ভিকা। হাদিস শরিফের ভাষ্যমতে, ফিলিস্তিনভূমিতে ইহুদিদের জড়ো হওয়া মূলত শেষ যুগে মুসলমান ও অভিশপ্ত ইহুদিদের মধ্যকার চূড়ান্ত লড়াইয়ের ভূমিকামাত্র; যে মহাযুদ্ধে নবিদের এই পবিত্র ভূমির প্রতিটি পাথর এবং গাছ মুজাহিদদের ডেকে ডেকে বলবে, 'হে আল্লাহর বান্দা, এদিকে এসো, আমার পেছনে একজন ইহুদি পালিয়ে আছে।'[৩৩] আর এভাবেই তারা তাদের ধূর্ততা ও অভিশপ্ততা নিয়ে জাহান্নামের তলদেশে পতিত হবে।

হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিশ্বস্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীমতে, শুধু 'বক্সথর্ন' (Boxthorn)[৩৪] গাছ ইহুদিদের পালিয়ে থাকার সংবাদ দেবে না। তাই আজ এই অভিশপ্ত জাতি ইসরাইল ও তার গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে অসংখ্য পরিমাণে বক্সথর্ন গাছ লাগিয়েছে। বোকার স্বর্গে বসবাস করা এই অভিশপ্তরা অনুধাবন করছে না যে, হাজার বছরের পাপের ফল যখন সন্নিকটে আসবে, তখন এই গাছ তাদের কী উপকার করবে।

## শেষ পরিণতির শুরু

মুসলমানদের উচিত, ইহুদিদের জঘন্য অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রথমে নিজেরা শরিয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়া। এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের

---

[৩৩] হাদিসের একাধিক গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ :

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ تُقَاتِلُكُمْ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِيْ فَاقْتُلْهُ

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন; আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইহুদিরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। অনন্তর তোমরাই তাদের ওপর জয়ী হবে। তারপর পাথর বলবে, হে মুসলিম, এই যে আমার পেছনে একজন ইহুদি। সুতরাং তুমি তাকে হত্যা করে ফেলো। (*সহিহ বুখারি* : ৩৫৯৩)—*আলী হাসান উসামা*

[৩৪] আরবি ভাষায় এই গাছকে 'গারকাদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

জন্য নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। অধিকৃত ফিলিস্তিনে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদিদের জড়ো হওয়া মূলত তাদের শেষ পরিণতির শুরু। ধীরে ধীরে অধিকাংশ ইহুদি এখানে একত্রিত হবে এবং তাদের অন্যায়-আচরণে মানবতার সকল সীমাকে লঙ্ঘন করবে। এভাবেই তাদের দুষ্কৃতি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছলে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং তার নেতৃত্বে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবে। আর তখনই হজরত ইসা আ. ও হজরত মাহদির নেতৃত্বে মুসলমানগণ দামেস্ক থেকে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে তাদের চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত করতে রওয়ানা করবেন। মুসলমানদের আগমনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাজ্জাল পলায়ন করবে। হজরত ইসা আ. তার পিছু ধাওয়া করে লুদ[৩৫] নামক জায়গায় তাকে পরাস্ত করে হত্যা করবেন। এভাবেই মানবসভ্যতার এক বিষাক্ত বিষফোঁড়ার সমাপ্তি ঘটবে।[৩৬]

আর দাজ্জালের অনুসারী ইহুদিরাও মুজাহিদদের হাতে পরাজিত হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দাজ্জালের ফেতনার সামনে দুর্বল ইমানের অধিকারীরা বিপথগামী হয়ে গেলেও মজবুত ইমানদার ব্যক্তিরা নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকবে। আর তারাই হজরত ইসা আ.-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করে নিজেদের পরকালীন মুক্তিকে নিশ্চিত করবে।

হে ইমানদারগণ, আজই নিজের ইমানের পরীক্ষা করুন। আর ওই দিনের জন্য প্রস্তুতি নিন, যেদিন সত্য বা মিথ্যার যেকোনো একদিককে বেছে নিতে হবে।

---

[৩৫] লুদ নামক জায়গাটি বর্তমান ইসরাইলের রাজধানী তেলআবিবের পাশে অবস্থিত।

[৩৬] সহিহ মুসলিম। সুনানে তিরমিজি।

Scanned by CamScanner

# জেরুসালেম থেকে ব্যাবিলন

কাবুল, কান্দাহার ও বাগদাদের পতনে অনেকের সম্পর্কেই ফুঁপিয়ে কান্না করার কথা শুনেছি। কিন্তু বাগদাদের পতনের পর যে শহরের প্রতি শকুনের চোখ পড়ছে, তা জানলে হয়তো চোখের অশ্রুও শুকিয়ে যাবে।

ফিরে দেখি ৬ জুন ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ। যে কালো দিনে ইহুদিরা জেরুসালেম দখল করে মসজিদে আকসাকে নিজেদের করায়ত্ত করে। সেদিন ইসরাইলি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক যে পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিল, তা সত্যিকারার্থেই ভয়ানক। সেদিন ইসরাইলি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল মঁশে দায়ান। জায়নবাদী ইহুদি সংগঠনের সর্বোচ্চ এই কর্মকর্তা ছিল জায়নবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পর্দার আড়ালের একজন কুশীলব। তার অভ্যাস ছিল কোনো ধরনের বিজয়ে অভিনন্দন গ্রহণের পরিবর্তে নতুন পরিকল্পনার ঘোষণা দেওয়া। অপারেশন জেরুসালেমের সফলতার সংবাদে সে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিল, 'আমরা জেরুসালেম দখল করেছি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ইয়াসরিব ও ব্যাবিলন।'

মঁশে দায়ানের এই ঘোষণা ইরাকের মুসলমানদের দেওয়ানিয়া, নাসেরিয়া ও আম্মারা শহর থেকে ফিলিস্তিনে চলে যাওয়া ইহুদিদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চলে যাওয়ার সময় ওরা বলেছিল, 'আমরা অচিরেই ইরাকে ফিরে আসব এবং আমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি দখল করে নেব।' ইরাকের মুসলমানরা অবাক হয়েছিল যে, এরা এতদিন আমাদের পাশে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করলেও যাওয়ার সময় আমাদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। তারা তখনও ভাবেনি, এই অভিশপ্ত ইহুদিরা কখনো সদাচরণের কথা মনে রাখে না; বরং অকৃতজ্ঞতা, ভালো ব্যবহারের বিনিময়ে মন্দ আচরণ করা তাদের জাতীয় স্বভাব। ইরাকি মুসলমানদের এতদিনের ভালো আচরণ সত্ত্বেও এরা মুসলমানদের প্রতি নিজেদের বিদ্বেষ লুকায়নি।

Scanned by CamScanner

বাগদাদের পতন আজকে ঘটেনি; বরং তার পতন শুরু হয়েছিল ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুন; যেদিন উসমানি খিলাফাতের নতুন প্রধানমন্ত্রী ইজ্জত পাশার হাতে ইহুদি নেতা থিয়েডর হার্জল নামের এক ইহুদির চিঠি পৌঁছেছিল। এই ব্যক্তিকে ইহুদিদের জায়নবাদী বিশ্বাসের প্রবর্তক ও এর আন্তর্জাতিক প্রচারক মনে করা হয়। পিটার নামের এক খ্রিষ্টান পাদরিকে যেমন ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর মূল হোতা মনে করা হয়, তেমনিভাবে এই ব্যক্তিকে জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখণ্ডে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মূল হোতা ধরা যায়। হাঙ্গেরির রাজধানীতে ৪ মে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেওয়া এই ব্যক্তিটি ৩ জুলাই ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারিগর হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তিজীবনে সাংবাদিকতা ও চিত্রাঙ্কনের পেশায় নিয়োজিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত সবকিছু বাদ দিয়ে নিজের সর্বস্ব ইহুদিদের কল্যাণে ব্যয় করে। আজকের ইহুদিরা তাকে নিজেদের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণ করে।

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তার *দার জুডেনস্টেইট (Dar Judenstaat)*[৩৭] নামের একটি পুস্তিকা প্রকাশ হয়। আর এতেই সে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা সকল ইহুদির মনে নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগুন জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়। অতঃপর সে বিভিন্ন ইহুদি নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে একটি বাৎসরিক সেমিনার আয়োজন করে। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে এই ধারাবাহিকতার প্রথম সেমিনার সুইজারল্যান্ডের বাসিল শহরে আয়োজিত হয়। আর সেখানেই আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আলাদা ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার ঘোষণা দেওয়া হয়। সেখানে 'দ্য জায়নিস্ট অর্গানাইজেশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়; যার মূল লক্ষ্য ছিল, ফিলিস্তিনভূমিতে আলাদা ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। জিওন বায়তুল মাকদিসের পার্শ্ববর্তী ইহুদি বিশ্বাসমতে একটি পবিত্র পাহাড়ের নাম। আর তাই তারা নিজেদের জন্য 'জায়নিস্ট' নাম নির্বাচিত করে। প্রথমদিকে এ সংগঠনের তৎপরতা ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত গোপন রাখা হতো এবং এর সদস্যদের বিশেষ পদ্ধতিতে শপথ করানো হতো। পরবর্তীতে সংগঠনের মৌলিক লক্ষ্যকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা ও তার জন্য প্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক কাঠামোকে অত্যন্ত গোপনীয় রাখা হয়।

এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার পক্ষ থেকে উসমানি সুলতান ইজ্জত পাশার কাছে প্রেরিত চিঠির আলোচনা শুরু করা হয়েছিল। সেই চিঠিতে থিয়েডর হার্জল

Scanned by CamScanner

উসমানি সুলতানের কাছে ইরাক ভূখণ্ডে আলাদা ইহুদি বসতি স্থাপনের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। শান্তিতে বসবাসরত ইহুদিদের এই আবদারে সুলতান ইজ্জত পাশা চরম আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি ভাবলেন, ইরাকে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা নিয়ে শান্তিতে বসবাসরত ইহুদিরা কেন আলাদা বসতি স্থাপন করতে চাচ্ছে? তখন বাগদাদে ইহুদিদের অনেক সম্পত্তি ছিল। বিশেষ করে বাগদাদের পূর্বে কারাদা নামক স্থানে বেশিরভাগ সম্পত্তি ইহুদিদেরই ছিল। সুলতান এই আবেদন আমলে নেননি। কিন্তু ইহুদিবাদী জেনারেল গার্নার[৩৮] আজ যখন ইহুদি বসতি নির্মাণের লক্ষে ইরাকে পৌঁছেছে, কে আছে তাকে রুখে দেওয়ার? জায়নবাদী আন্দোলন আজ জেরুসালেম শহর থেকে ব্যাবিলনের সীমায় এসে উপনীত হয়েছে। টাইগ্রিস নদীর পারে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসরাইলের পূর্ব সীমানা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাই আজ এ অবৈধ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গন্তব্য বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয়। ইহুদিরা তাদের সাফল্যগাঁথা রচনা করে চলছে আর মুসলমানরা হয়তো ওই দিনের অপেক্ষা করছে, যে দিন তাওবা করার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাওবা কবুল করা হবে না। হয়তো তারা সেদিন আশ্রয়ের জন্য দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করবে; কিন্তু আশ্রয়ের কোনো সন্ধান পাবে না।

হে মুসলমান সম্প্রদায়, কতদিন তোমার শত্রুদের অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ দেবে? কতদিন এই অভিশপ্ত ইহুদি সম্প্রদায় একে একে তোমাদের সব পবিত্র ভূমি দখল করে নেবে? ব্যাবিলন পর্যন্ত আজ ইহুদিরা দখল করে নিয়েছে। তোমাদের বেঁচে থাকতে কি ইয়াসরিব তথা মদিনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত তাদের হাত পৌঁছে যাবে?

---

[৩৮] ২০০৩ সালের ২০ মার্চ তার নেতৃত্বে ইরাকে হামলা করা হয়েছিল।

Scanned by CamScanner

# ইসরাইল শব্দের অর্থ কী

হামান নামে ইহুদিদের একজন ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, দার্শনিক ও গবেষক ছিল। যার পুরো নাম ছিল 'আলফ্রেড থায়ের মাহান' (Alfred Thayer Mahan)। যে ইহুদিবাদ প্রতিষ্ঠায় গঠনমূলক চিন্তাভাবনা বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমগ্র পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত ইহুদিরা গত দুই শতাব্দী যাবৎ একজোট হয়ে সেভাবেই কাজ করেছিল যেভাবে একতাবদ্ধ থাকতে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ তার উম্মাতকে আদেশ দিয়েছিলেন। যখন মস্তিষ্ক গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে, মন দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সার্বিকভাবে এর বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে তখন মানুষ সহজেই যেকোনো লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। তেমনিভাব তখনই কোনো জাতি নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারে, যখন তাদের পরিকল্পনাবিদ ও গবেষক পর্যায়ের লোকেরা তাদের মস্তিষ্কে পরিণত হয়ে ভালো-মন্দ কাজের দিকনির্দেশনা দেয়। ভবিষ্যতের সুন্দর পরিকল্পনা কাঠামো তৈরি করে। এবং কিছু লোক সে জাতির আত্মায় পরিণত হয়ে তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হয়। এবং তাদের কিছু সদস্য শক্তিশালী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো সংগৃহীত সরঞ্জামের মাধ্যমে পরিকল্পিত কাঠামোকে বাস্তবায়নে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের জ্ঞানী সম্প্রদায় পৃথিবীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষার[৩৯] শিক্ষানীতি আজ ২০০৩ সালেও গ্রহণ করতে পারেনি, যা ১৯০৩ সালে গ্রহণ করা দরকার ছিল। আর এটাই আমাদের পরিকল্পনাগত দুর্বলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। অন্য কিছু না-হয় আলোচনা না-ই হলো।

আলোকিত চিন্তার অধিকারী বিভিন্ন গবেষকরা আজ এমন পরিকল্পনা পেশ করছেন, যা হয়তো ১৮৫৭ সালেই গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে ইহুদি প্রভাবিত চিন্তা-চেতনার খ্রিষ্টানরা ২০০০ সালে এমন সব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছে, যার ছক তারা ১৯০১ সালে কষে রেখেছিল। আর নিজেদের গবেষণাগারে এমন বিষয়াদি নিয়ে পরিকল্পনা করছে, যা তারা ২১০০ খ্রিষ্টাব্দে

---

[৩৯] আরবি, ইংরেজি ও উর্দু।

Scanned by CamScanner

বাস্তবায়ন করবে। এবং নিজেদের মস্তিষ্কে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে ২১০০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ের করণীয় নিয়ে ভাবছে।

যাইহোক, ক্যাপ্টেন আলফ্রেড থায়ের ওরফে মাহানের[৪০] আলোচনা করছিলাম, যে কিনা গত শতাব্দীর ইহুদিদের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। সে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক রোডম্যাপ তৈরি করতে গিয়ে বলেছিল, 'পূর্ব ইউরোপ যার আয়ত্তাধীন থাকবে, 'হার্টল্যান্ড'ও তার আয়ত্তাধীন হবে। 'হার্টল্যান্ড' যার আয়ত্তে আসবে, 'ওয়ার্ল্ড আইল্যান্ড' তথা ইউরেশিয়া[৪১] তার আয়ত্তে থাকবে। আর ইউরেশিয়া যার অধীনে থাকবে, পুরা পৃথিবীতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।'

হামানের এই বক্তব্যকে আরেক ইহুদি গবেষক 'হালফোর্ড ম্যাকিন্ডার' (Halford Mackinder) আরও তাৎপর্যময় করে প্রকাশ করে। (১৮৯৬-১৯৪৭) তার মৃত্যুর একবছর পরেই ইহুদি জায়নবাদী রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠা হয়। সে বলেছিল, 'হার্টল্যান্ড ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে প্রাধান্য রাখে। তাই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ ভূমি অন্যান্য স্থানের চেয়ে অধিক মর্যাদাশীল। আর তা এ জন্য যে, ভূ-রাজনীতির নেতৃত্ব মূলত জল ও স্থলভাগের ওপর কর্তৃত্বশীলদের হাতে থাকবে। 'হার্টল্যান্ড' পৃথিবীর এমন ভূমি, যা সামুদ্রিক দিক থেকে নিরাপদ স্থান। কেননা, তার একদিকে হিমালয় পর্বতমালা, একদিকে 'ভলগা' (Volga) নদী, একদিকে 'নানজিং' (Changing) নদী, অন্যদিকে উত্তরসাগরবেষ্টিত।'

২৫ জানুয়ারি ১৯০৪ সালে যখন পৃথিবী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন হালফোর্ড ম্যাকিন্ডার তার এই বক্তব্য 'রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি লন্ডন' (Royal Geographical Society London)-এর একটি সেমিনারে পাঠ করেছিল। যার শিরোনাম ছিল *দ্য জিওগ্রাফিক্যাল পিভিট অব হিস্টোরি (The Geographical Pivot of History)*। তার বক্তব্যে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও 'হার্টল্যান্ড'র কর্তৃত্বের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব; এটিই ছিল তার বক্তব্যের মূল উপপাদ্য।

'নিকোলাস জন স্পিকম্যান' (Nicholas John Spykman) নামের আরেক ইহুদি গবেষক এই অস্পষ্টতা দূর করে ম্যাকিন্ডার বর্ণিত 'হার্টল্যান্ড'র ভূমিকে

---

[৪০] ১৯১৪ সালে আমেরিকায় তার মৃত্যু হয়।

[৪১] ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা।

Scanned by CamScanner

পৃথিবীর সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করে এবং 'রিমল্যান্ড' (Rimland) তত্ত্ব আবিষ্কার করে ৩০°-৪০° (ডিগ্রী)পরিভাষা আবিষ্কার করে; যার মাধ্যমে ৩০° ও ৪০° উত্তর রেখায় অবস্থিত ভূমি বোঝানো হয়। সে ইহুদিদের জন্য এক বিশেষ কর্মপরিকল্পনা রচনা করেছিল। যেখানে বলা হয়েছিল, 'রিমল্যান্ড'-এর ওপর যাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তারাই ইউরেশিয়া ও আফ্রিকার ওপর কর্তৃত্ববান হবে। আর ওরাই একচ্ছত্রভাবে পৃথিবীর ওপর আধিপত্য করবে।'

'অলনান্ড তাইবি' (Olnald Taibi) নামের অন্য এক ইহুদি গবেষক এই মতবাদকে আরও স্পষ্ট করে বলে যে, 'মানবসভ্যতার কেন্দ্রভূমি হবে যুক্তরাষ্ট্র, পূর্ব আমেরিকা, ভারত ও পশ্চিম চীনের মাঝামাঝি ব্যাবিলনের পার্শ্ববর্তী আরব উপদ্বীপ; যা প্রাচীন আরব ও আফ্রিকার মিলনকেন্দ্র।'

এই বক্তব্যগুলোর আলোকেই মূলত আন্তর্জাতিক ইহুদি রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাঠামোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ইহুদি নেতারা একবাক্যে মেনে নিয়েছিল যে, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ ইউরেশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যভাগের উপর কর্তৃত্বের মাধ্যমে অজেয় হওয়া সম্ভব। তাই ইহুদি গবেষকদলের এই মতামত প্রকাশের কয়েক দশক পরই ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনন্দ উদযাপন করেছিল। হতে পারে এই গবেষণাগুলোই ছিল ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এই গবেষণাগুলোর কার্যকারী ফলাফলই ছিল ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

মোদ্দাকথা, এভাবেই ইহুদিদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা বাস্তবতার মুখ দেখতে পেয়েছিল। তাই যদি কেউ ইসরাইলের অর্থ ও বাস্তব উদ্দেশ্য জানতে চায়, তার জন্য প্রথমে ইহুদি গবেষকদের এসব গবেষণাগুলোকে বিবেচনায় আনতে হবে। এবং সে গবেষণার বিভিন্ন স্তরে সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে রাখা ইহুদিয়াত, তাদের মনস্তাত্বিকতা, কর্মপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে। তাই আসুন, অল্প কিছুক্ষণের জন্য ইহুদিদের গবেষণাগারগুলো ঘুরে আসি।

ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর ইবরাহিম ইসহাক কিক নামক একজন ইহুদি আলিমকে রাষ্ট্রীয় রাব্বি ঘোষণা করা হয়। ইহুদি শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি সে একজন বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌বক্তাও ছিল। ইহুদিরা তাকে জাগতিক ও পরকালীন বিদ্যায় বিদ্বান হওয়ার পাশাপাশি বড় আধ্যাত্মিক নেতাও মনে করত। সে ইসরাইলের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছিল যে, 'ইসরাইল ভূমিকে শুধু নিজেদের ধর্মীয় অখণ্ডতা বজায় রাখার মাধ্যম; এমনকি বিপদজনক মুহূর্তে ইহুদিধর্ম

Scanned by CamScanner

টিকিয়ে রাখার দুর্গ মনে করা একটি নিষ্ফল পরিকল্পনা। ইসরাইল ভূমির পবিত্রতার সাথে এটি মানানসই নয়। পবিত্র ভূমির পুনর্দখলের পরিকল্পনা মূলত ইহুদিজমের এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তাদের স্বকীয়তার পরিচায়ক। মুক্তির আশা এমন এক ধর্মবিশ্বাস, যা ইহুদিমাত্রকেই অপেক্ষমাণ রাখে। ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্বসহ ইহুদিজমই মূলত প্রকৃত মুক্তি।'

'ইসরাইল রাষ্ট্রের ইহুদিজম' ও 'প্রকৃত মুক্তি' এ দুটি পরিভাষার পটভূমির আলোচনা করা ছাড়া পুরোপুরি বুঝে আসবে না। মূলত যখন আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের কৃতকর্মের শাস্তি দিয়েছিলেন এবং যুগে যুগে বুখতেনাসার ও টাইটিসের মতো লোকরা যখন বারংবার জেরুসালেম শহরকে ধ্বংস করে এর অধিকাংশ নাগরিকদের হত্যা করে, অন্যদের দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ করে দীর্ঘদিন লাঞ্ছনার এ জীবন অতিবাহিত করে, তখন তাদের দুরবস্থা থেকে মুক্তির একটি শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আর সেই শেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহর কাছে তাওবা অথবা গোঁয়ার্তুমির যেকোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল। এটাই ছিল মূলত তাওবার মাধ্যমে তাদের পাপ মুক্তির শেষ সুযোগ। আর সেটাই ছিল হজরত ইসা আ.-এর হাতে তওবা করে ইমান আনয়ন করা। তাদের বলা হয়েছিল, যদি তারা পাপ কাজ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে দেবেন এবং তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য একজন মুক্তিদাতা পাঠাবেন। তার অনুসরণের মাধ্যমে তারা বিপদসংকুল অবস্থান থেকে বেরোতে পারবে।

তাদের মধ্যে ভালো মানসিকতার অধিকারীরা তখন থেকে হজরত ইসা আ.-এর অপেক্ষা করতে শুরু করে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ যারা গুনাহে আসক্ত ছিল তারা ধৈর্য ধরতে পারেনি। তারা এই লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাইলেও গুনাহের অন্ধকার জগত থেকে ফিরতে রাজি ছিল না। আর সেই লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য ফিলিস্তিনের 'জিওন' (Jion) পাহাড়ের পাদদেশে জেরুসালেম শহরের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল।

সারকথা, তারা হারিয়ে যাওয়া জান্নাতের আগ্রহী ছিল; কিন্তু জাহান্নামি কর্মকাণ্ড থেকেও বিরত থাকতে রাজি ছিল না। আর তাই গুনাহের অন্ধকার জগতে বিচরণের পাশাপাশি মাসিহের আগমন ও আলাদা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন তাদের মস্তিষ্কে বিশেষ জায়গা করে নেয়। এদিকে তাদের নামসর্বস্ব আলিম ও আধ্যাত্মিক নেতারা আল্লাহ ও শয়তানকে একই সাথে খুশি করার চিন্তায় মাসিহ আ.-সংক্রান্ত বিশ্বাসকেই বিকৃত করে ফেলে। মাসিহ আ.-এর ব্যাপারে

Scanned by CamScanner

নিজেদের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাওরাত এবং ইঞ্জিলের বিকৃতি-সাধন আবশ্যক ছিল। তাই তারা এ দুটি সম্মানিত কিতাবেও কাঁচি চালানো শুরু করে। এভাবেই তারা ভোগবাদের সেই যুগে শিরকের এক ভয়াবহ ধারা শুরু করে এবং আল্লাহর মনোনীত ধর্মের বিপরীতে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহর মনোনীত বাস্তব ধর্মকেই তারা ভ্রান্ত ও জাল প্রমাণিত করতে শুরু করে। সে সময় বনি ইসরাইলের ভণ্ড আলিমরা নবিদের সাথে এমন আচরণ করেছিল, যা বর্তমান যুগের দুনিয়াপূজারি আলিমরা হক্কানি আলিমদের সাথে করে থাকে। সেই ভণ্ড আধ্যাত্মিক নেতারা তাদের এসব বিকৃত কাজে বাধা দিলে প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিদের এমনকি নবিদেরও হত্যা করতে দ্বিধা করত না। ধীরে ধীরে তা এমন একটি ধর্মে পরিণত হয়, যা ছিল সত্য-মিথ্যার সম্মিলিত রূপ। যেখানে মাসিহ আ.-সংক্রান্ত বিশ্বাসগুলো ছিল নিম্নরূপ।

১. মহান আল্লাহ ইহুদিদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাদের মধ্যে একজন মাসিহ প্রেরণ করবেন।

২. সেই প্রেরিত মাসিহ তাদের প্রচলিত ধর্মকে সত্যায়ন করবেন।

৩. যদি কেউ তাদের মধ্যে প্রচলিত[৪২] রীতিনীতিকে অস্বীকার করে অন্য কোনো বিধানের প্রতি আহ্বান করে, তাকে দাজ্জাল বিবেচনায় হত্যার উপযুক্ত মনে করা হবে।

তাদের বানানো এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের আওতায় হজরত ইসা আ.-কে দাজ্জাল প্রমাণিত করে নিজেদের ধারণামতে তাকে হত্যা করতে পারাকে বড় সফলতা মনে করা হয়। মাসিহ আ.-সংক্রান্ত এ মিথ্যা বিশ্বাসকে ইহুদিদের মধ্যে তাদের আলিমরা এতটাই বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, মাসিহ আ.-এর আগমনের পটভূমি তৈরির জন্য ইয়াহইয়া আ.-কে প্রেরণ করতে হয়েছিল। এবং হজরত ইয়াহইয়া আ. হজরত ইসা আ.-এর দাওয়াতের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির মেহনত করেছিলেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও ইহুদিরা সেই অন্যায় কাজটিই করে বসে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের সর্বশেষ পরীক্ষায়ও অকৃতকার্য প্রমাণিত হয়। যার মাধ্যমে ইহুদিদের সম্পর্ক আল্লাহ ও রাসুল এবং তদীয় কিতাবের সাথে চিরজীবনের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়। আর তা ছিল হজরত ইসা আ.-কে অস্বীকার করা এবং তাকে

---

[৪২] বিকৃত ও মনগড়া।

Scanned by CamScanner

ক্রুশবিদ্ধ করা। এই জঘন্য অপরাধের পর তারা নিশ্চিত হয়েছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পবিত্র বান্দাগণের কাছে এদের আর কোনো জায়গা অবশিষ্ট নেই। মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কের পরিবর্তে ইবলিশের সাথে সম্পর্ক রচিত হওয়ার ব্যাপারেও তারা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি তারা এটাও বুঝে যায় যে, ইবলিশের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় অভিশাপ তাদের সাথেও সম্পৃক্ত থাকবে। তারা এটাও নিশ্চিত হয়েছে যে, তাদের জন্য কোনো মুক্তিদাতা আসবে না এবং তারা কোনো মুক্তিদাতার উপযুক্তও না; বরং সত্যিকার যে মাসিহের আগমন ঘটবে, তিনি মূলত তাদের জন্য ক্রোধ ও ধ্বংসের প্রতিমূর্তি হবেন। তার ক্রোধাগ্নি থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় তাদের থাকবে না। তাই তারা শয়তান ও তার কালো শক্তি এবং সর্বশেষ শয়তানের প্রতিনিধি দাজ্জালকে নিজেদের সহযোগী হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাদের ধারণামতে তাদের সকল আশার কেন্দ্রবিন্দু, জেরুসালেমের রাজত্ব, পবিত্র 'জিওন' পাহাড় পুনর্দখলের একমাত্র মাধ্যম হতে পারে সেই অভিশপ্ত দাজ্জাল। আর সেই রাজত্ব হবে ইহুদিজমের রাজত্ব; আর সেদিনই হবে তাদের প্রকৃত মুক্তি। এখন দাজ্জাল কবে বের হবে? দাজ্জালের আগমনের পটভূমি কীভাবে তৈরি হবে? এখানে এটাও শুনে নিন, মসজিদে আকসা ধ্বংস করে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক ইসরাইল-সংক্রান্ত অভিজ্ঞ গবেষক 'জায়দি আরাঁ' কী বলে!

> 'এই সংগঠনের[৪৩] পর্দার আড়ালের কারিগররা মনে করে, মসজিদে আকসাকে বোমা হামলার মাধ্যমে ধ্বংস করার (ঘৃণ্য) পরিকল্পনা সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের মধ্যে চরম জিহাদি মনোভাব তৈরি করবে। ধীরে ধীরে যা মহাযুদ্ধে পরিণত হবে। যে মহাযুদ্ধকে তারা ইয়াজুজ-মাজুজের যুদ্ধ নাম দিয়ে পৃথিবীজুড়ে বড় ধরনের আধ্যাত্মিক বিপ্লব হবে বলে মনে করে। এ ধ্বংসাত্মক অগ্নিপরীক্ষা পৃথিবীর বুকে ইসরাইলের মুক্তিদাতা দাজ্জালের আগমনের পথ সুগম করবে।'

সারকথা, বর্তমান ইসরাইল শুধু একটি রাষ্ট্র ও জায়নবাদী ইহুদিদের আশ্রয়স্থলই নয়; বরং এটি ইহুদিদের সাজানো আন্তর্জাতিক ইসলামবিদ্বেষী শাসনব্যবস্থা 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' এবং দাজ্জালি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাইলফলক। যা শত বছরের গোপন পরিকল্পনায় মসজিদে আকসা ও সোনালি গম্বুজকে ধসিয়ে

---

[৪৩] ফ্রি মিশন।

Scanned by CamScanner

দাজ্জালের আগমন ও বিশাল ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইহুদি বিশ্বাসমতে নিজেদের মুক্তিদাতা দাজ্জালের আগমনকালীন সময়ে তার রাজধানী হবে জেরুসালেম এবং মসজিদে আকসার স্থানে নির্মিত সুলায়মানি কাঠামো হবে তার সিংহাসন। বর্তমানে পৃথিবীতে দুটি রাষ্ট্র এমন রয়েছে, যা কোনো ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যাদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত পাকিস্তান; যাদের সংসদে কালিমায়ে তায়্যিবা লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেখানে প্রতিটি শিশু-কিশোরের কাছে পাকিস্তানের লক্ষ্য কী, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-[৪৪]এর স্লোগান দেওয়া অতীব সৌভাগ্যের বিষয় বলে গণ্য করা হয়।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইসরাইল। যাদের সংসদের মূল কথা হচ্ছে, 'হে ইসরাইল, তোমার প্রকৃত ভূমি হচ্ছে টাইগ্রিস নদী থেকে নীলনদ পর্যন্ত' এবং যার লক্ষ্য হচ্ছে দাজ্জালের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরি করা।

দুটি রাষ্ট্রই যথেষ্ট ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যাদের উভয়ের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামি বা ইহুদি রাষ্ট্রের জীবন্ত নমুনা পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করা।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, দাজ্জালের অনুসারীরা নিজেদের গোঁয়ার্তুমির ওপর অটল থেকে কখনো মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাতের নিজস্ব চেতনার রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়নি। অথচ মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুপারিশকে যারা নিজেদের মুক্তির কারণ বলে মনে করে তারা ইসরাইলের তাগুতি রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠার পূর্বেই স্বীকৃতি দিয়েছে। তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ভুলে তাগুতের রাজধানী প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বেই শত্রুদের সাথে একাত্ম হওয়ার কথা ভাবছে।

কাবার রবের শপথ! ফিলিস্তিনের মুসলমানদের সাথে ইহুদিদের দ্বন্দ্ব শুধু রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব নয়; বরং এটি হক ও বাতিলের এমন এক মহাযুদ্ধ যার সমাপ্তি হজরত ইসা আ. ও ইমাম মাহদির হাতে হবে। ইমানদারদের ভাবা উচিত, কার সঙ্গ নিতে তারা আগ্রহী!

---

[৪৪] পাকিস্তানের জনপ্রিয় একটি স্লোগান।

Scanned by CamScanner

# ব্যাবিলন থেকে জেরুসালেম

## সমস্যার খোঁজে

ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়ার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গনে আলোচনা হচ্ছে। কোনো কোনো গবেষক ও ইসলামিক স্কলার 'তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না'[৪৫]—এই আয়াতকে রাসুল ﷺ-এর যুগের সাথে সীমাবদ্ধ মনে করেন। আবার কেউ কেউ আউলিয়া শব্দের অর্থ শাসক ধরে নিয়েছেন। আবার কিছু সেয়ানা রাজনীতিবিদ নিজেদের মুজাহিদে আজম উপাধি দিয়ে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলোর সন্ধানে ইদানীং তেলআবিব সফর করে এসেছেন। এ ব্যাপারে সবাই নিজ নিজ সিদ্ধান্ত পেশ করে ক্লান্ত হয়ে গেলে হয়তো এ ব্যাপারে গৃহীত গোপন সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষিত হবে। যেহেতু আমরা অতটা ধর্মবেত্তা নই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যাপারে ফাতওয়া দেবো অথবা এতটা রাজনৈতিক জ্ঞানও রাখি না যে, আন্তর্জাতিক এ ব্যাপারে নিজের মতামত পেশ করব। তাই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যাপারে মতামত দেওয়ার পরিবর্তে বিষয়টিকে আমরা ইহুদিদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করছি। আর এ ব্যাপারে সামান্য যতটাই জানতে পেরেছি, তা আমাদের রক্তে জ্বলন ধরিয়ে দিয়েছে।

তাওরাতের সুরা ইয়াসয়াহে বলা হয়েছে, 'শেষ যুগে এহুদার নেতৃত্বের পাহাড় অন্য সকল পাহাড়ের চেয়ে শক্তিশালী হবে। এবং সব পাহাড়ের চেয়ে উঁচু হবে। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা স্রোতের মতো এদিকে আসবে, এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকেও লোকদের আগমন ঘটবে। এবং বলবে, "এসো আমরা এহুদার

---

[৪৫] সুরা মায়েদা : আয়াত ৫১।

Scanned by CamScanner

পাহাড়ে উঠে ইয়াকুবের প্রভুর ঘরের দিকে যাই"। তখন তিনি আমাদের রাস্তা দেখাবেন এবং আমরা সেই পথে চলব। কারণ, এহুদার রাষ্ট্রব্যবস্থা 'জিওন' পাহাড়ের পাদদেশে হবে এবং জেরুসালেম থেকে তাদের নির্দেশনা বের হবে। তারা বিভিন্ন গোত্রের সমস্যার সমাধান করবে।'

## মাসিহে রাব্বানি বনাম মাসিহ দাজ্জাল

হজরত মাসিহ আ.-এর আগমন এমন একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী, যা কিয়ামাতের পূর্বে বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বিবেকবিকৃত ইহুদিরা এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সঠিক অর্থকে বিকৃত করে ফেলেছে। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর বাস্তব উদ্দেশ্য হচ্ছে হজরত ইসা আ.; যার সত্যায়ন হজরত মুহাম্মাদ ﷺ করেছেন। হাদিসের কিতাবগুলোতে কিয়ামাতের আলামত অধ্যায়ে বিভিন্ন হাদিসে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষ যুগে যখন পৃথিবী মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে, কাফিরদের অত্যাচারে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মুসলমানরা তখন জিহাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠবে। তারা তখন তাদের নেতৃত্বের জন্য কোনো যোগ্য নেতার সন্ধান করতে থাকবে[৪৬] তখন মহান আল্লাহ তাদের জন্য এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে নৈতিক ও আত্মিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন নেতা প্রেরণ করবেন। তার নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং উপাধি হবে মাহদি। তিনি তখন মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন।[৪৭] আর তখনই সেই মুহূর্তে দামেস্কের পূর্ব দিকের সাদা মিনারের কাছে হজরত ইসা আ. অবতরণ করবেন। তিনি হজরত মাহদির ইমামতিতে নামাজ পড়বেন, যেন খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারে যে, তিনি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী হিসেবে পুনরাগমন করেছেন। তারপর তিনি মুসলমান সেনাবাহিনীর সাথে দামেস্ক থেকে ইসরাইলের রাজধানী তেলআবিব অভিমুখে রওনা হবেন। সেখানে লুদ[৪৮]-নামক স্থানে তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর অপশক্তির কেন্দ্রভূমি ইসরাইলে একত্রিত হওয়া ইহুদিরাও তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। যদি কোনো ইহুদি যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে[৪৯] কোনো গাছ বা পাথরের পেছনে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে সেই গাছ বা পাথর মুসলমান সৈন্যদের আহ্বান করে বলবে, 'হে আল্লাহর

---

[৪৬] বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা বিবেচনা করুন।

[৪৭] সৌভাগ্যবান তারা যারা তার সহযোদ্ধা হবে।

[৪৮] যেখানে 'তেলআবিব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট' অবস্থিত।

[৪৯] যা তাদের পুরাতন অভ্যাস।

Scanned by CamScanner

বন্ধু, আমার পিছনে একজন ইহুদি আশ্রয় নিয়েছে, তাকে ধ্বংস করো।' অবশ্য 'বক্সথর্ন' গাছ যা ইহুদিদের ঐতিহ্যবাহী গাছ এ ধরনের আহ্বান করবে না।

ইসরাইল সরকার বেশ কয়েক বছর ধরে ব্যাপক পরিমাণে 'বক্সথর্ন' গাছ লাগিয়েছে। আমি কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম যে, এটা কী গাছ এবং এটি দেখতে কেমন। তারপর মহান আল্লাহ সে গাছ দেখার তাওফিক দিয়েছেন। এই গাছের ছবি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, এ ধরনের কুৎসিত গাছ তাদের ভাগ্যে থাকাই যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি যেখানে জাইতুনের মতো বরকতময় গাছ অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়, সেখানে ইহুদিদের ভাগ্যে এমন কুৎসিত গাছই জুৎসই।

## অনিষ্টের মূল

ইসরাইলের স্বীকৃতির আলোচনা থেকে শুরু করে আমরা ইসরাইল ধ্বংসের আলোচনায় উপনীত হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই দীর্ঘ আলোচনা কারও কাছে আলোচ্যবিষয়-বহির্ভূত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এ দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, আমরা ইসরাইলকে কেন সকল অনিষ্টতার মূল মনে করব। এতক্ষণের আলোচনায়ও যদি কারও এ কথা বুঝে না আসে যে, ইসরাইলকে কেন অনিষ্টতার মূল মনে করা হবে; তাহলে সমস্যা নেই। আমরা নতুন করে সেখান থেকে কথা শুরু করছি।

মূলত ইহুদিদের প্রতারণা ও কৌশলের কারণে আজ অনেক বিদ্বান ব্যক্তিও এ ব্যাপারে ধোঁকাগ্রস্ত। তাই এ ব্যাপারে আমরা কোনো আবেগী মন্তব্য না করে পুরাতন কথায় ফিরে যাচ্ছি।

তাওরাতে শেষ যুগে হজরত ইসা আ.-এর আগমনকে মাসিহের আগমন হিসেবে বিবৃত করা হয়েছে। কিন্তু ইহুদিরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমনকারী মাসিহের পরিবর্তে শয়তানের প্রতিনিধি দাজ্জালকেই নিজেদের মুক্তিদাতা মনে করে বসে আছে। কেননা, তারা এমন কাউকে মাসিহ বলে স্বীকার করতে রাজি নয়, যে তাদের মনগড়া মতবাদের ইহুদিজমকে অস্বীকার করে অন্য কোনো বিধানের প্রতি আহ্বান করে। তারা এমন কাউকেই মাসিহ হিসেবে মানতে আগ্রহী, যে তাদের সকল অপকর্ম সমর্থন করে তাদের মতবাদকে শক্তিশালী করবে। শুধু তাই নয়, যেকোনো মূল্যে তাদের হাতে নেতৃত্ব ফিরিয়ে এনে পৃথিবীর বুকে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করবে।

Scanned by CamScanner

স্পষ্টতই বোঝা যায়, এটা এমন কারও দ্বারাই সম্ভব, যে পৃথিবীর সকল ফিতনাগুলোর চেয়ে জঘন্যতম ফিতনা হবে। যার অনিষ্টতা থেকে মুক্তির প্রার্থনা করতে রাসুল ﷺ তাঁর উম্মাতদের শিখিয়েছিলেন এবং যে কানা দাজ্জাল হিসেবে এই উম্মাতের কাছে পরিচিত।

## ইহুদিদের বানানো মতবাদ

তাওরাতে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি সাধনের পর ইহুদি আলিম ও পণ্ডিতদের জন্য তাওরাতে বর্ণিত প্রতিশ্রুত মাসিহের বিশ্বাসকে দাজ্জালের মাধ্যমে বিকৃত করা ছাড়া জনগণের মনোযোগ ধরে রাখার কোনো উপায় ছিল না। পাশাপাশি তারা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সহযোগিতায় জেরুসালেম ও সেখানের পবিত্র 'জিওন' পাহাড় পুনর্দখল এবং হজরত ইসা আ.-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এড়িয়ে শয়তানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভূমিকাস্বরূপ জেরুসালেম দখল ও দাজ্জালের আবির্ভাবের পটভূমি হিসেবে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের মনগড়া পন্থা বেছে নেয়।

এখানে আমাদের ওই তিনটি দলের দ্বিতীয়টির কথা স্পষ্ট করা উচিত, যারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণের ভিত্তিতে ইহুদিদের হাতে প্রতিপালিত এবং তাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে আসছে। ইহুদিদের বিশ্বাসমতে তারা হজরত ইসা আ.-কে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করেছে। যদিও বাস্তবে মহান আল্লাহ তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং তিনি কিয়ামাতের পূর্বে অবতরণ করে ইহুদিদের জঘন্য কাজসমূহের শাস্তি দেবেন। তার প্রতি অবিশ্বাস পোষণকারী প্রত্যেক ইহুদিকে তিনি হত্যা করবেন। অন্যদিকে খ্রিষ্টানরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করবে এবং ইসলামের বীরসেনানীরা তার নেতৃত্বে দাজ্জাল ও তার ইহুদি সৈন্যদের সাথে লড়াই করবে। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীতে ইহুদিরা অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ায় হজরত ইসা আ.-এর আকাশে আরোহণ এবং কিয়ামাতের পূর্বে অবতরণকে অস্বীকার করে। সর্বদা তারা মুসলমানদের জিহাদি চেতনাকে আতঙ্কের চোখে দেখে এবং কৌশলে তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে এ কথা প্রচারের চেষ্টা করে যে, হজরত ইসা আ. জীবিত নেই এবং জিহাদ হচ্ছে সন্ত্রাস।

ওই সত্তার শপথ, যিনি হজরত ইসা আ.-কে সম্মানের সাথে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন! যে ব্যক্তি বা দল হজরত ইসা আ.-এর জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করবে, অথবা অন্য কাউকে প্রতিশ্রুত মাসিহ মনে করবে কিংবা জিহাদের

Scanned by CamScanner

বিধানকে অস্বীকার করবে, সে কাদিয়ানি হোক বা অন্য কেউ; তার বিবেকের লাগাম জায়নবাদী অপশক্তির এমন কুচক্রীদের হাতে বন্ধক, যারা নিজেদের পরিণামে ভীত হয়ে পৃথিবীর সকল মুসলমানের ইমান ও আমল ধ্বংস করে আল্লাহ ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে শয়তানের দলে যোগ দেওয়াকেই বেছে নিয়েছে।

## অন্তর্বর্তীকালীন শাসন এবং পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থা

এক আলোচনা থেকে অন্য আলোচনা বের হয়ে আসছে। ইহুদিরা হজরত ইসা আ.-কে হত্যা করার[৫০] আনন্দ উদযাপন শেষ না করতেই মহান আল্লাহ তাদের ওপর রোমান সম্রাট 'টাইটিস'কে চাপিয়ে দেন। সে সুলায়মানি কাঠামো ধ্বংস করে ইহুদিদের হত্যা করে বায়তুল মাকদিস থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এই ঘটনা হজরত ইসা আ.-কে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা চেষ্টার ৭০ বছর পরে সংঘটিত হয়। তখন থেকে নিয়ে ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছিল। এই উনিশ বা বিশ শতক পর্যন্ত ইহুদিদের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার ইতিহাস পৃথিবীর বুকে লাঞ্ছনার এক অনন্য উদাহরণ হয়েছিল। আর এই দীর্ঘ সময় ধরে এরা প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিল, কীভাবে তাওবা না করেও পূর্বের অবস্থানে পূর্বের মতো মর্যাদাশীল হওয়া যায়। অবশেষে ১ হাজার ৭০০ বছর পর কট্টর ইহুদিপন্থী জর্জ ওয়াশিংটনের হাতে পৃথিবীর বুকে আটলান্টিকের পারে তাদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। যা পৃথিবীবাসীর কাছে যুক্তরাষ্ট্র নামে পরিচিত হলেও ইহুদিরা একে নতুন ব্যাবিলন নামে ডাকে। এই রাজত্ব মূলত নিয়মতান্ত্রিক ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও দাজ্জালের আগমনের পটভূমি তৈরির জন্য গঠিত একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনব্যবস্থা। যা ফিলিস্তিন থেকে উসমানি খিলাফাত ধ্বংস, ফিলিস্তিনের উপর কর্তৃত্ব, মসজিদে আকসা দখল ও তা ধ্বংস করে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যার সবচে বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

এদিকে ইহুদিদের সবচে বড় শত্রু হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ। আবার বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর সবচে মেধাবী, দূরদর্শী ও যোগ্যতম সদস্যরা উপমহাদেশে বসবাসকারী। তন্মধ্যে জিহাদি চেতনাও এ খাতে ব্যয় করায় পাকিস্তানি

---

[৫০] নিজেদের ধারণামতে।

Scanned by CamScanner

মুসলমানগণ অগ্রগামী। তাই ইসরাইলকে অন্য কেউ সমর্থন করুক বা না করুক পৃথিবীর মুসলমানদের প্রাণের স্পন্দন, একক মুসলমান পারমাণবিক দেশ পাকিস্তানের মুসলমানদের থেকে সেই ইসরাইলের জন্য সমর্থন আদায় করাকে আমেরিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভাবছে। যেই ইসরাইলের জনগণ হচ্ছে পৃথিবীর সবচে অভিশপ্ত জনগণ আর তাদের শাসকরা পৃথিবীর সবচে জঘন্যতম শাসক।

মসজিদে আকসার শোকার্ত পরিবেশ এবং অত্যাচারিত দেয়ালগুলো পাকিস্তানি যুবকদের ডেকে ডেকে বলছে, 'আমার মর্যাদা কি বাবরি মসজিদের মর্যাদার চেয়েও কম? কীভাবে তোমরা আমার ধ্বংসকারীদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে বরণ করে নিচ্ছ? অথচ আল্লাহ ও রাসুলের কাছে তারা অত্যন্ত অভিশপ্ত। এরপরেও কি মহান আল্লাহর সাথে তোমাদের কৃত প্রতিশ্রুতি বহাল থাকবে? শয়তানের প্রতিনিধিদের বরণ করে নেওয়ার পরেও কি রহমানের সাথে তোমাদের এতটা সম্পর্ক থাকবে যে, প্রয়োজনের সময় তোমরা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করবে? তোমরা কি ওই জুলুমের প্রতিশোধস্পৃহাকে ভুলে যাবে; যা অভিশপ্ত ইহুদিরা ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে জেরুসালেমে ফিরে আসা পর্যন্ত আমার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের সাথে করেছিল?'

মসজিদে আকসা এভাবে আর্তনাদ করে ডেকেই যাচ্ছে; কিন্তু এর মুহাফিজরা আজও ঘুমিয়ে আছে।

Scanned by CamScanner

# দুই ডাক্তারের গল্প

ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়েই জাতি গঠিত হয়। আর একটি সমন্বিত জাতি নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করে অসাধ্যকে সাধন করতে সক্ষম হয়। ড. থিয়েডর হার্জল ও ড. ওয়াইজম্যান নামে দুজন ইহুদি ডাক্তার এই সফলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। ড. হার্জলকে জায়নবাদী ইহুদিজমের জনক বলা হয়। অপরদিকে ড. ওয়াইজম্যানকে জায়নবাদীদের আদর্শিক গুরু মনে করা হয়। জায়নবাদী মতবাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এই দুই ডাক্তারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত সবার শিক্ষার খোরাক যোগাতে পারে। ড. হার্জল পূর্ব ইউরোপের অধিবাসী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব ইউরোপের ইহুদিরা নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত উদগ্রীব ছিল। এই ইহুদিরা মূলত স্পেনে ইসলামি সাম্রাজ্য পতনের পর সেখান থেকে বহিষ্কৃত ইহুদিদের বংশধর ছিল।

ইসলামি অন্যান্য দেশসমূহের মতো স্পেনেও ইসলামি শাসনামলে সকল বিধর্মীদের প্রতি সদাচরণ করা হতো। ইসলাম তার অনুসারীদের যে চারিত্রিক শিক্ষা দিয়েছিল, তার ফলে মুসলমানরা যেকোনো রাজ্যের সার্বিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পরেও অন্যায়ের পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাকত। হজরত সুলায়মান আ.-এর শাসনামলের পর স্পেনে মুসলিম শাসনামলকে ইহুদি ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ধরা হয়। যেখানে তাদের সকল অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু স্পেনে ইসলামি শাসনের পতনের পর খ্রিষ্টানদের শাসনামল ইহুদিদের জন্য ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। বিজয়ী খ্রিষ্টান রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানি ইসাবেলা তাদের সকল সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে স্পেন থেকে নির্বাসিত করে। তখন তারা কনস্টান্টিনোপলের ইসলামি হুকুমতের আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানের মুসলমানরা নিজেদের চারিত্রিক ও মানসিক বদান্যতায় ইহুদিদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ফলে তারা সেখানে সুন্দরভাবে নিজেদের নতুন জীবন শুরু করে।

Scanned by CamScanner

যদি তাদের কৃতজ্ঞতা ও মানবতাবোধ থাকত, তাহলে মুসলমানদের সেদিনের আচরণের কথা তারা কখনো ভুলত না। কিন্তু ইহুদিদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, অন্যান্য মানুষেরা অকৃতজ্ঞতা ও অমানবিকতাপূর্ণ কাজ নিজেদের বাম হাতে করলেও ইহুদিরা তা নিজেদের ডান হাতেই করে থাকে। সেই নতুন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই তারা নিজেদের ডানহাত ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ-সুবিধাকে পুঁজি করে তারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে শুরু করে। সুদি কারবারে যথেষ্ট উন্নতির মাধ্যমে রাজা-বাদশাদের দরবারেও নিজেদের স্থান তৈরি করে নেয়। সবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, তারা তাদের উভয় হাতকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আর উপরিউক্ত দুই ডাক্তার ছিল সেই সময়ের ইহুদিদের কান্ডারি।

তাদের চেষ্টা ছিল ইহুদিদের একত্রিত করে তাদের মধ্যে নিজস্ব রাষ্ট্রের চেতনা তৈরি করা। ড. হার্জল সর্বপ্রথম *দ্য স্টেইট অব ইসরাইল* নামক পুস্তিকায় স্বতন্ত্র ইসরাইল রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পেশ করে। এই পরিকল্পনা প্রকাশের পর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার ইহুদিরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়। ইহুদিদের উন্নতির বিভিন্ন পরিকল্পনায় সে নিজের সারাজীবন ব্যয় করে। সে ইহুদিদের সামনে এ তত্ত্ব তুলে ধরে যে, ধর্মীয় দিক থেকে ইহুদিরা যতই পাপিষ্ঠ হোক রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। যা তাদের স্বাধীন স্বকীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সফলতার কারণ হবে। তখন থেকেই জায়নবাদ নামে একটি পারিভাষিক শব্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহুদি-মতবাদ একটি ধর্মীয় কাঠামোর নাম আর তারই রাজনৈতিক সংগঠন হচ্ছে জায়নবাদ।

জায়নবাদী সংগঠনের এ প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর যদিও ইহুদিদের লাঞ্ছনার দৃশ্য চোখে নিয়েই ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করে; কিন্তু সে তার মৃত্যুর পূর্বে এমন দুটি কাজ করে যায়, যা পরবর্তীদের সফলতার পথ সহজ করে দেয়। সে মৃত্যুর পূর্বে ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদি ব্যাংক ও ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদি ফান্ড প্রতিষ্ঠা করে। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জায়গায় ইহুদিদের বিক্ষিপ্ত সম্পত্তিকে একত্রিত করে বিনিয়োগ করা। এবং তার লাভ থেকে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া এবং প্রয়োজনের সময় নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা। এই ব্যাংকের প্রাথমিক সম্পদ হিসেবে ৩০ লাখ পাউন্ড সংগ্রহের ঘোষণা দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ৪ লাখ পাউন্ড নগদেই জমা করা হয়। অন্যদিকে আলাদা

Scanned by CamScanner

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ চাঁদা হিসেবে সংগ্রহ করার জন্য ইহুদি ফান্ড গঠন করা হয়। চাঁদার মাধ্যমে ফান্ড সংগ্রহ করার ক্ষেত্রেও অভিশপ্ত কৃপণ ইহুদি সম্প্রদায় পিছিয়ে থাকেনি। এবং ইহুদি চাঁদা সংগ্রাহকরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করতে শুরু করে।

ড. হার্জল ইহুদি পণ্ডিতদের একত্রিত করে এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়ে নেয় যে, পৃথিবীর সকল ইহুদি নিজেদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা দেবে। কেউ চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে এক মুহূর্ত দেরি করবে না এবং নির্ধারিত চাঁদার চেয়ে কম দেবে না। হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় কেউ যদি বেশি চাঁদা দিতে চায় তবে তা গ্রহণ করা হবে। পৃথিবীর প্রতিটা ইহুদি শতকরা হারে নিজেদের আয়ের একটি অংশ এই খাতে চাঁদা বাবত দেয়। আর শতকরা হারে হওয়ার কারণে এটি আদায় করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয় না।

এই অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এর সঠিক ব্যবহার বিশ্বব্যাপী ইহুদিদের এমন এক অবস্থানে নিয়ে গেছে, যা বিভিন্ন বিপজ্জনক অবস্থায়ও তাদের ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে বাঁচিয়েছিল। পৃথিবীর সর্বত্র সকল ইহুদি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট হার ইসরাইলের নামে ওয়াকফ করা আছে। অথচ মুসলমানদের মধ্যে হাজারেও একজন পাওয়া যাবে না, যার আয়ের নির্দিষ্ট একটি অংশ ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে। মুসলমান ব্যবসায়ীগণ তো এ অপেক্ষায় থাকেন, কখন তাদের দরজায় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা নিজেদের মর্যাদাকে বিকিয়ে দিয়ে চাঁদার জন্য দাঁড়াবে। আর তখন তারা নিজেদের দান তাঁদের হাতে তুলে দেবে। অথচ শতকরা হারের চাঁদা ব্যতীতও ইহুদিরা নিজেদের গুপ্তধনভান্ডার এ খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। লর্ড রিচার্ড-এর মতো ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও 'সম্পদ উপার্জন করো ইহুদিজমের জন্য আর তা ব্যয় করো মাসিহের জন্য'—এই দর্শনের বাস্তবায়ন করতে শুরু করে।

'বের্ন দা হার্শ' নামক একজন ইহুদি তৎকালীন সময়ের ৯০ লাখ পাউন্ড এই উদ্দেশ্যে দান করেছিল। এভাবেই ইহুদিদের দান করা টাকা দিয়ে ব্যাপকভাবে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি ক্রয় ও সেখানে নতুন ইহুদি বসতি স্থাপনের কাজ পরিকল্পনামতে বাস্তবায়ন করা হয়। এভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে ইহুদিদের মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১

Scanned by CamScanner

লাখ একর; কিন্তু ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের পর সেখানে তাদের সম্পত্তি বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৩০ লাখ একরে।

ব্যাপকহারে জমি ক্রয়ের পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে ইহুদিদের এনে নতুন বসতি স্থাপনের কাজও জোরেশোরে শুরু করা হয়। সর্বপ্রথম ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে হাইফার কাছে নতুন ইহুদি বসতি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যেখানে মাত্র ১৮২টি পরিবার বসবাস করত। কিন্তু ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে সেই নতুন বসতির জনসংখ্যা ১ লাখ ২৫ হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। তারা সকলেই ছিল ইহুদি ধনাঢ্য পরিবারের। আর সেই নতুন বসতিই আজকের ইসরাইলের রাজধানী তেলআবিব। আরবি এ শব্দটি অনেকেই সঠিকভাবে উচ্চারণ করে না। আর অনেকেই এর অর্থও জানে না। তেলআবিবের সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে تل ابيب ; যার অর্থ হচ্ছে বসন্তময় পাহাড়। تل অর্থ ছোট পাহাড় এবং ابيب কিবতি সাল গণনার ১১তম মাস; যা বসন্তকালে এসে থাকে।

ড. হার্জল তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখে যেতে না পারলেও পরিকল্পনা এতদূর এগিয়ে নিয়েছিল, যেখান থেকে ইহুদিদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তার পরিকল্পনার হাত ধরেই ইহুদিরা স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ড. ওয়াইজম্যান তার অসম্পূর্ণ কাজ সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ওয়াইজম্যান ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির রসায়নবিদ্যার শিক্ষক ছিল। সে এমন দুই-তিনটি সুযোগ পেয়ে যায়, যা তাকে ইবলিসি অপশক্তির জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে। প্রথম সুযোগটি এসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, যখন ব্রিটেনের হাতে বোমা বিস্ফোরণের একটি উপাদানের ঘাটতি হয়। আর সেই পদার্থটি ছিল Acetone,[৫১] যা তখন শুধু জার্মানির হাতেই ছিল। এদিক থেকে জার্মানির চেয়ে ব্রিটেনের সৈন্যরা পিছিয়ে ছিল। প্রফেসর ওয়াইজম্যান এই কঠিন সময়ে নিজের সহকর্মীদের নিয়ে কৃত্রিমভাবে অ্যাসিটোন তৈরি করে ব্রিটেনের সমস্যা বহুলাংশেই দূর করে ফেলে। ব্রিটেন সরকার এর বিনিময়ে তাকে কিছু দিতে চাইলে সে দেশপ্রেমের জন্য এটি করেছে বলে কোনোকিছু নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইংরেজরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হলেও তার 'দেশপ্রেম' বলতে কোন্ দেশের ভালোবাসা উদ্দেশ্য ছিল; তা বুঝতে পারেনি।

---

[৫১] এসিটোন।

Scanned by CamScanner

এই প্রফেসরের দ্বিতীয় সুযোগ এসেছিল এভাবে যে, ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি তৎকালীন সময়ে ব্রিটেনের নেতা 'আর্থার জেইমস বালফোর' (Arthur James Balfour)-এর নির্বাচনী এলাকার অংশ ছিল। প্রফেসর ওয়াইজম্যান নির্বাচনী কাজে বেলফোরের যথেষ্ট সহযোগিতা করে। বেলফোর এর বিনিময় দিতে চাইলেও সে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে; এটিও ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত রাখে। তৃতীয় আরেকটি ঘটনা ছিল এই—ইহুদি বংশোদ্ভূত 'মি. এডউইন মন্টাগিউ' (Mr. Edwin Montagu) ব্রিটেনের উপনিবেশ-বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হয়। এতে ড. ওয়াইজম্যান ও তার সহকর্মীদের কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। অবশিষ্ট ছিল কিছু কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, যা তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সফলভাবে বাস্তবায়ন করে এবং হাজার বছর পরে ইহুদিদের একটি নিজস্ব রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিরা জার্মানের সাথে কিছু চুক্তি করতে চায়। আর জার্মানিতে তৎকালীন সময়ে ইহুদিদের এতটাই প্রভাব ছিল যেমনটি আজ তাদের আমেরিকাতে রয়েছে। জার্মানির তৎকালীন নেতা 'কাইজার কিং উইলহাম' (Kaiser [King] Wilhelm)-এর কাছে তারা এ প্রতিশ্রুতি নিতে চায় যে, সে ফিলিস্তিনে স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতা করবে। কিন্তু ইহুদিদের শত্রু ইসলামি খিলাফাতসমৃদ্ধ তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্র থাকায় ইহুদিরা তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। ইহুদিরা কোনোভাবেই এ বিশ্বাস করতে পারেনি যে, কিং উইলহাম তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে। আর তখনই ড. ওয়াইজম্যান ব্রিটেনের প্রতি নিজের পূর্বোক্ত দেশপ্রেমের বরাত দিয়ে ব্রিটেনের শাসকদের আশ্বস্ত করে যে, সারা পৃথিবীর ইহুদিরা নিজেদের ধন-সম্পদ ও যোদ্ধাদের নিয়ে ব্রিটেনের পাশে দাঁড়াবে; যদি ব্রিটেন যুদ্ধে জয়লাভের পর ফিলিস্তিনে স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যয় বাবত ইংরেজদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। আর এদিকে ইহুদিরা অঢেল সম্পত্তির লোভ দেখায়। তাই শেষ পর্যন্ত ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এই ডাক্তার স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সনদ পেয়ে যায়, যা 'বালফোর ডেক্লারেইশন' নামে পরিচিত। যেখানে যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার করা হয়।

এটি ছিল ইংরেজদের প্রতারণার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। একদিকে তারা আরব নেতাদের আশ্বস্ত করেছিল যুদ্ধে তাদের সহযোগিতার বিনিময়ে আরব রাষ্ট্রসমূহকে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন প্রদান করবে। এই মর্মে তারা মক্কার

Scanned by CamScanner

প্রশাসক শরিফ হুসাইনকে লিখিত প্রতিশ্রুতিও প্রদান করে। তাদের এ প্ররোচনায় আরবরা তুরস্ক থেকে বিদ্রোহ করে ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও ইরাককে ব্রিটেনের উপনিবেশে পরিণত করে। অন্যদিকে সেই ইংরেজরাই ইহুদিদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, তারা ফিলিস্তিনে স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করে দেবে। যতদিন পৃথিবীর ইতিহাসে ব্রিটেনের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন প্রতারণার এ কলঙ্ক তারা নিজেদের ললাট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

ড. ওয়াইজম্যান-এর এসব অবদানের কারণে তাকে ইসরাইল পার্লামেন্টের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। আজ ইহুদিরা শ্রদ্ধাভরে তাকে স্মরণ করে। এই দুই ডাক্তারের অবদান বর্তমান অবস্থা বোঝার জন্য সহায়ক হবে।

বর্তমানে আমেরিকার ইরাক দখলের পর মধ্যপ্রাচ্যের রোডম্যাপ পরিকল্পনায় বিজয়ী হয়েছে। এবং আজীবন মুজাহিদ ইয়াসির আরাফাতের স্থলাভিষিক্ত খুঁজে আলোচনার নামে প্রতারণার সময়ক্ষেপণের সুযোগ খুঁজছে। সাদা মনের অধিকাংশ মুসলমান, দরসের মসনদে অধিষ্ঠিত আলিম ও গবেষকরাও এর রহস্য উদঘাটনে অক্ষম। এখানে বেশ কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরা হচ্ছে, যা সামনে রাখলে হয়তো এ ব্যাপারে কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

১. ইসরাইলের পার্লামেন্টে এ কথা লেখা আছে 'হে ইসরাইল, তোমার সীমা নীলনদ হতে টাইগ্রিস নদী পর্যন্ত।' আর এভাবেই ইসরাইলই পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যারা প্রকাশ্যে অন্য স্বাধীন দেশ দখলের ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। অথচ সর্বদা তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের আগ্রাসনের অভিযোগে লিপ্ত।

২. ২ জুন ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিরা যখন বায়তুল মাকদিসের পুরাতন অংশ দখল করে, তখন ইসরাইলের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু বোরাক দেয়ালের পাশে পৌঁছে। সবার উপস্থিতিতে সে এ ঘোষণা দেয়—'এখন ইয়াসরিব তথা মদিনা পর্যন্ত যাওয়ার পথ সুগম হলো।'

৩. প্রথম ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেছিল, 'জেরুসালেম ব্যতীত ইসরাইল অসম্পূর্ণ; আর সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ ব্যতীত জেরুসালেম দখলও অর্থহীন।'

এসব কথার স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্য রোডম্যাপের আড়ালে বিশ্ব অচিরেই রক্তাক্ত কয়েকটি যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছে।

Scanned by CamScanner

কিন্তু ব্রিটেনের নাগরিক ২১ বছর বয়সী আসিফ মুহাম্মাদ হানিফ[৫২] ইহুদি এবং তাদের সহযোদ্ধাদের হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। নিজের রক্তের নজরানায় মুসলমান যুবকদের এ বাণী দিচ্ছেন—

> 'ইহুদিরা যতই ষড়যন্ত্র করুক, এ ধরনের আত্মঘাতী বোমা হামলা তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম।
>
> হে মুসলমান যুবকেরা, পৃথিবী তো ধীরে ধীরে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর পেছনে দৌড়াতে গিয়ে কি নিজের পরকালকে ধ্বংস করে দেবে?'

আসিফ মুহাম্মাদের রক্তাক্ত শরীরের টুকরোগুলো মুসলমান যুবকদের নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে জাগিয়ে তোলে। হায়, যদি ফিলিস্তিনের বাইরের মুসলমান যুবকরা এই চেতনায় জাগ্রত হতো, যা এই নওজওয়ান নিজের রক্ত দিয়ে জাগাতে চেয়েছিল।

---

[৫২] ফিলিস্তিনের বাইরের সর্বপ্রথম যুবক, যিনি ইসরাইলের একটি বারে আত্মঘাতী বোমা হামলা করে, ত্যাগের ইতিহাসে অনন্য স্থান দখল করেন।

Scanned by CamScanner

# আগামী বছর জেরুসালেমে

## চার বছর পর

লাহমিয়াহ হুদি বর্তমান ইসরাইলের একজন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে ইহুদিদের বিভিন্ন রীতিনীতি এবং ধর্মীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। সে ইহুদিদের উচ্চতর কার্যকারী পরিষদের পক্ষ থেকে ইহুদি সেনাবাহিনীর প্রতি প্রার্থনার আকারে একটি নির্দেশনামা প্রেরণ করে। এ প্রার্থনা মূলত হাজার বছর পর ইহুদি ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব থেকে সংকলন করা হয়েছে। এবং ইরাকে[৫৩] যুদ্ধরত ইহুদি সৈন্যদের কাছে এর অনুবাদ, বিশ্লেষণ ও টিপ্পনীসহ সরবরাহ করা হয়েছে। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে ইহুদি ভূমিকে শত্রু মুক্ত করা। ইহুদি সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে এতে বলা হয়েছে, যেন তারা সমগ্র ইহুদি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে একটি বিশেষ ইবাদাত আদায়য়ের গুরুত্ব দেয়। যে ইবাদাতের সুযোগ তারা দীর্ঘ ৪ হাজার বছর পর পেয়েছে। ফোরাত নদীর পশ্চিম পারে কোনো তাবু অথবা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের সময় যেন তারা সেই ইবাদাতটি আদায় করে। চিঠির শেষে লেখা হয়, ফোরাত তথা ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম পাড়ের প্রতিটি অংশ ইসরাইল রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইশ্বরের আশীর্বাদে আমেরিকার বিজয়ের মাধ্যমে তারা এই ঐতিহাসিক স্থানকে নিজেদের আয়ত্তে নিতে সক্ষম হয়েছে। তাই স্রষ্টার স্মরণে হাজার বছর পর ফিরে পাওয়া এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে যেন এ বিশেষ দুআটি পড়া হয়, যার প্রভাবে তারা আশাবাদী যে, অচিরেই সমগ্র পৃথিবী 'জেনটেইল' (Jentail)[৫৪] মুক্ত হয়ে পুরোপুরি তাদের করতলগত হবে।

---

[৫৩] যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সৈন্যদের সহযোদ্ধা হয়ে।

[৫৪] অর্থাৎ, মানবরূপী পশু। ইয়াহুদিদের মতে ইয়াহুদিভিন্ন সবাই এই জাতের অন্তর্ভুক্ত।

Scanned by CamScanner

## খায়বার হতে তাবুক

এ সংবাদটি আরবের বিভিন্ন প্রভাবশালী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, যা ইহুদিদের ওই প্রচেষ্টার সফলতার সংবাদ বহন করে, যা তারা প্রতিবছর 'নেক্সট ইয়ার ইন জেরুসালেম' নামে উদযাপন করে। তারা ইহুদিদের মাঝে 'ব্যাক টু দ্য প্রমিজড ল্যান্ড' (Back to the promised land) উদযাপনের নামে এমন প্রপাগান্ডা চালায়, যা তাদের উন্মত্ত করে তোলে। বর্তমানে বায়তুল মাকদিসেও এমন একটি আন্দোলন চলছে যার আলোচনা সামনে আসবে। তার পূর্বে একটি ভয়াবহ পরিকল্পনার আলোচনা করা যাক, যা সাউদি আরবের সাথে সম্পর্ক রাখে।

সাউদি আরব যেহেতু ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু সেই হিসেবে পৃথিবীব্যাপী প্রায় ১৫০ কোটি মুসলমানের সাথেই এটি সম্পর্ক রাখে। এ ভয়াবহ তথ্যটি আলোচনার পূর্বে এর পটভূমির আলোচনা করা সমীচীন।

বাদশা ফাহাদের বিনয়ী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমেরিকা তাদের সৈন্যদের সাউদি আরবে পাঠিয়েছিল তখন তারা একটি শর্তারোপ করেছিল। তাদের শর্তটি ছিল, যেহেতু কোনো সাউদি নাগরিক বা ভিন্ন দেশের নাগরিক আমেরিকায় পাঁচ বছর অবস্থান করে, তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। তেমনিভাবে যেসব আমেরিকান সৈন্য পাঁচ বছর বা তদূর্ধ্বকাল সাউদি আরবে অবস্থান করবে, তাদেরকেও নাগরিকত্ব দিতে হবে। সাউদি বাদশা তার সভাসদদের পরামর্শক্রমে এ শর্তটির মনজুরি দেন।

আমেরিকান অগণন সৈন্যের সাউদি আরবে আসার প্রায় ১২ বছর এবং নাগরিকত্ব প্রাপ্তির ৭ বছর অতিবাহিত হয়েছে।[৫৫] কোনো শহরে নতুন করে নাগরিকত্ব পাওয়ার পর একটি জাতির পরবর্তী পরিকল্পনা থাকে সেখানকার কর্তৃত্ব গ্রহণ করা। ইহুদিদের পরিকল্পনা হচ্ছে, খায়বার থেকে তাবুক পর্যন্ত সর্বোচ্চ পরিমাণে জায়গার মালিকানা অর্জন করা। এ সংবাদকে আমিও হয়তো শুধু কোনো সাংবাদিকের অনুসন্ধানী রিপোর্ট মনে করতাম, যদি আমার কাছে এ ব্যাপারে ফোন না আসত, যার প্রতিটি কথায় ইমানি বেদনার স্পষ্ট ছাপ ছিল।

---

[৫৫] অনেক চেষ্টা করেও এর সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি। আমেরিকানরা এ তথ্যকে অত্যন্ত গোপন রাখে। তাদের পক্ষ থেকে যে সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, তা তাদের সেনাঘাঁটিগুলোর হিসাবে অবাস্তব মনে হয়।

Scanned by CamScanner

## যথাসম্ভব এবং যেকোনো মূল্যে

আমাকে একদিন জানানো হলো যে, এক ব্যক্তি সাউদি আরব থেকে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। কিন্তু সে কী ব্যাপারে কথা বলবে, তা প্রকাশ করছে না। সাউদি আরবের কথা শুনেই স্বভাববিরুদ্ধভাবেই আমি ফোন কানে নিলাম। ফোন ধরতেই সালামের পর আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কি সেই মাওলানা সাহেব; যিনি আরব রাষ্ট্রসমূহের বিধর্মী সৈন্য সমাবেশের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে লেখেন?'

স্পষ্ট না করেই আমি উত্তর দিলাম—

- আপনি বলুন।

- আপনি বলুন, আপনি কি তিনি?

- আশ্চর্য কথা, আপনি নিজের পরিচয় দেননি; অথচ আমার পরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন?

- দেখুন, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি। কিন্তু বারবার ফোন করতে সক্ষম নই। তাই অনুগ্রহপূর্বক তার সাথে কথা বলিয়ে দিন।

- আপনি বিশ্বাস রাখুন, আপনার কথা তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

- আমি এখানে একটি আমেরিকান ... কোম্পানিতে উচ্চপদে চাকরিরত। আমি লক্ষ করছি, কোম্পানির ইহুদি অফিসাররা কারণে-অকারণে এখানে বড় বড় জায়গা ক্রয় করছে। ক্রয় করার ক্ষেত্রে জায়গার অবস্থা এবং মূল্যকে তারা ভ্রূক্ষেপই করছে না। যেকোনো মূল্যে যেকোনো মানের জায়গা ক্রয় করছে। আপনি এর রহস্য সম্পর্কে ভাবুন। আমার পরিচয় দিতে না পারায় দুঃখিত।

- আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট হন। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।

## নাগরিকত্ব এবং কর্তৃত্ব

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বিদেশি একজন ইঞ্জিনিয়ারের সন্দেহ হচ্ছে; কিছু তো একটা অস্বাভাবিক চলছে। কিন্তু স্থানীয় ধর্মীয় নেতাগণ এ ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদটুকুও করছেন না। কেউ তাদের শাসকদের এই অনুভূতিটাও দিচ্ছে না যে, আপনারা ফিলিস্তিনের মতো ভুলের পুনরাবৃত্তি কেন করছেন? ফিলিস্তিনের স্থানীয় জনগণ উলামায়ে কিরামের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইহুদিদের কাছে তাদের প্রচুর সম্পত্তি বিক্রি করেছিল। সেসব জায়গার ওপর

Scanned by CamScanner

কর্তৃত্বের মাধ্যমে ইহুদিদের নাগরিকত্বটাও সহজ হয়েছিল। আর সাউদি আরবে শুরু থেকে নাগরিকত্ব তো রয়েছেই, এখন চলছে শুধু জায়গার ওপর কর্তৃত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা। কিন্তু যেহেতু সেখানের অধিকাংশ আলিম আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত, তাই সেখানে এমন কোনো পুরুষের সন্ধান মেলে না, যে হক কথা বলার দায়িত্বকে সুন্নাহ মোতাবেক আদায় করতে পারে।

আমাদের এখান থেকে যেসব ব্যক্তিরা রাজকীয় মেহমান হয়ে সাউদি আরব যান, তাদের উচিত, সেখানকার নেতাদের কাছে কয়েকটি কথা খুলে বলা। তাদের বলা উচিত যে, আপনারা আমাদের দেশে গিয়ে বিতর্কিত মাসআলা-বিশিষ্ট তাফসিরগ্রন্থ বিতরণ করেন, আপনাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিদের জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ নির্মাণ করে দেন। কিন্তু আপনাদের উচিত, ওইসব দাওয়াতবিহীন মেহমানদের নিয়েও ভাবা, যারা শুধু নিজেদের খাবারের প্লেটেই ছিদ্র করছে না; বরং পুরো দস্তরখানাকেই নষ্ট করে ফেলেছে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন শাখাগত বিতর্কিত বিধান নিয়ে আলোচনা বন্ধ করে এর পরিবর্তে হারামাইনের পবিত্র ভূমি রক্ষার যে দায়িত্ব আপনাদের কাছে দেওয়া হয়েছে, তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করুন। অন্যথায় মনে রাখবেন, আপনারা ইয়াসির আরাফাতের মতো ওদের অনুগত নন। আবার ইরানের শাহের মতো বিশ্বস্তও নন। আল্লাহ না করুন, কখনো যেন এমন না হয়ে যায় যে, আপনারা ত্রাণ বিতরণে লিপ্ত থাকবেন আর অন্যদিকে ইহুদি সৈন্যরা খায়বারের পরিত্যক্ত দুর্গগুলোতে বিশেষ দুআ পাঠের আসর বসাবে।

কারও কারও কাছে এই কথাগুলো হয়তো ভালো লাগবে না। তারা ভাবছেন যে, সাউদি শাসকদের প্রতি সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গি রাখা উচিত। কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত, সাউদি বাদশাদের প্রতি মুসলমানদের যতটা আবেগ ও ভালোবাসা রয়েছে, তা শুধু হারামাইনের পবিত্র ভূমির কারণে। যদি তারা সেই পবিত্র ভূমির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতেই না পারে, তাহলে নিজেদের মর্যাদা হারাবে। উপরন্তু যখন সমস্যাটি উম্মাতের ভালোবাসা ও ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু নিয়ে হবে, তখন ব্যক্তির মর্যাদা তো লক্ষণীয় থাকার কথা নয়। মর্যাদার অধিকারী তো সেসব ব্যক্তি, যারা কোনো বড় লক্ষ্যের জন্য নিজেদের জীবন বাজি রেখে দিতে প্রস্তুত থাকে।

যাইহোক, কথা এ পর্যন্তই। আমাদের উলামায়ে কিরাম যারা আরবে যান, নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কোথাও এ কথাগুলো বলার উপযুক্ত মনে হলে বলার জন্য অনুরোধ রইল।

Scanned by CamScanner

## মামশ.....মামশ

জেরুসালেম শহরে বসতি স্থাপন করা ইহুদিদের উন্মত্ততার আলোচনা করে আমরা এই অধ্যায়ের সমাপ্তি করব, যার আলোচনা শুরুতে করেছিলাম। বর্তমানে পুরো ইসরাইল বিশেষ করে জেরুসালেম শহরের অবস্থা এই যে, পুরো ইসরাইলি জাতি মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করা ও তার স্থানে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের বিভিন্ন শহরের মাজারগুলোতে ওরসের জন্য যেভাবে দানবাক্স বিভিন্ন রঙের কাপড়ে সাজিয়ে বাহারি পতাকা টানিয়ে ঢোল বাজিয়ে চাঁদা কালেকশন করা হয় এবং মরমী সংগীত ও স্লোগানের মাধ্যমে জনগণের আবেগকে উসকে দেওয়া হয়, ঠিক সেভাবেই ইসরাইলের রাস্তাঘাটে আজকাল ইহুদি রাব্বিদের বিভিন্ন দল টহল দেয়। আর জনগণের আবেগকে উসকে দেওয়ার জন্য তাদের পাগলামিসুলভ সেই পরিচিত স্লোগানটি উচ্চারণ করে। 'মামশ.....মামশ'; যার অর্থ হচ্ছে, 'আমরা মাসিহকে এখনই চাচ্ছি, এই মুহূর্তেই।' ইসরাইলিদের অভিশপ্ত মস্তিষ্কে এই ভূত কেন সাওয়ার হয়েছে? এর কারণ বোঝা অবশ্য কঠিন নয়। কারণ, তারা অনেক আগে থেকেই এ ব্যাপারে আশাবাদী।

একবার পুরোনো বইপত্রের মধ্যে একটি দাওয়াত-কার্ড দেখতে পেয়েছিলাম, যেখানে আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর পূর্বে দাজ্জালকে স্বাগত জানানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনা ও ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ৫৫ বছর অতিবাহিত হলেও দাজ্জাল তাদের দর্শন দেয়নি। ইহুদিদের এহেন অন্যায় কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও ইসলামি বিশ্বের প্রভাবশালী নেতৃত্ব সবক্ষেত্রেই চুপ করে থেকেছে, এমনকি আজও তাদের সমর্থন করার ধারাই অব্যাহত রেয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশ্মির চেচনিয়ার মুজাহিদদের মধ্যে পশ্চিমাবিরোধী চেতনা, ধর্মীয় আবেগ ও দীনের স্বার্থে আত্মত্যাগের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। ঠিক একই অবস্থা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সাধারণ মুসলমানগণেরও। আর মুসলমানদের এ ধরনের চেতনাবোধ ইহুদিদের অগ্নিশর্মা ও অত্যন্ত ক্রোধান্বিত করে তুলেছে। যার ফলে তারা মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মুসলমানরা গণহারে হত্যা, বংশগত নিধন, নির্বাসন, ইজ্জত লুণ্ঠন এবং অন্যান্য ধরনের নির্যাতনের মুখেও নিজেদের আদর্শ ও চেতনা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হচ্ছে না।

Scanned by CamScanner

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার এক যুবক ফাঁসির শাস্তি শুনেও ইমানি চেতনার যে বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছে, তা এর টাটকা উদাহরণ হতে পারে। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেয় এবং শাহাদাতের নিআমাতপ্রাপ্তির আনন্দ প্রকাশ করে। ইহুদিরা নিজেদের অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী অপশক্তি, সুদভিত্তিক অর্থনীতির মজবুত ভিত্তি, চক্রান্ত ও প্রপাগান্ডার যাবতীয় কৌশল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাচ্ছে না। তারা ইসলামি বিশ্বের যতটা ক্ষতির আশা করেছিল, ততটাও করতে পারছে না; বরং মুসলমানদের মৌলিক ইমানি ও আদর্শিক চেতনা এখনো পরিপূর্ণ রয়েছে। অন্যদিকে যদি মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতনও করা হয়, তাহলে হয়তো এমন প্রতিক্রিয়া আসবে, যা কাপুরুষ ইহুদিদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই তারা ভাবছে 'নতুন বিশ্ব নিয়ম' (New World Order) যদি পূর্ণ শক্তি দিয়ে এখনই প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তাহলে হয়তো ইহুদিদের বানানো সকল কাঠামো অচিরেই ধ্বংসের মুখ দেখবে।

## অগ্নিগর্ভ ভূমি

এখন তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আর বেশি দেরি হলে তাদের বৈশ্বিক পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে যাবে। যার ফলে দাজ্জালের আবির্ভাবের পটভূমি তৈরি করতে তাদের আরও কয়েক শতক অপেক্ষা করতে হবে। পরাজয়ের অনুভূতি, ব্যর্থতার লাঞ্ছনা ও জাতিগত অভিশপ্ততা এখন তাদের উন্মত্ত করে তুলেছে। মাদরাসাগুলোর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত প্রপাগান্ডা সত্ত্বেও মুসলমান শিশুদের সংখ্যা মাদরাসাগুলোতে অনেকগুণে বেড়ে গিয়েছে। মুসলমানদের বেহায়াপনায় লিপ্ত করার জন্য ইহুদিরা নিজেদের ঘরের নারীদের ব্যবহার করা সত্ত্বেও হজ ও উমরায় মুসলমানদের সংখ্যা হাজার গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা চেয়েছিল সন্ত্রাসবাদের দোহাই দিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে। কিন্তু এখন শুধু মডার্ন যুবকরাই নয়; আমেরিকান শিশুরা পর্যন্ত জিহাদ সম্পর্কে আগ্রহী। তারা চেয়েছিল মুসলমান যুবকদের দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাভাবনাকে মন্দ পথে পরিচালিত করতে; কিন্তু আল্লাহর রহমতে মসজিদগুলোতে এতেকাফকারীর সংখ্যা এত গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আগে যেখানে এতেকাফকারী খুঁজে পাওয়া যেত না আজ সেখানে রমজানের শুরুতে এতেকাফের জন্য নাম নিবন্ধন করাতে হয়। যেখানে নিবন্ধনকারীদের অধিকাংশই হয় যুবকশ্রেণির। তাদের সর্বশেষ চক্রান্ত ছিল পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা

Scanned by CamScanner

যা উম্মাহকে দুটি স্পষ্ট ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। কিন্তু এই ময়দানেও উলামায়ে কিরামের প্রচেষ্টার ফলে আজ শুধু মুসলমান দেশেই নয় অমুসলিম দেশগুলোতেও ব্যাপকহারে ইসলামি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং দিন দিন এই উদ্যোগের অগ্রগতি হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ যেদিন ইসলামি গবেষকগণ নিজেদের পরিকল্পিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সিলেবাসের বাস্তবায়ন করতে পারবেন সেদিন ইহুদিদের মুখ লুকানোর জায়গা থাকবে না। এদিকে নিজেদের অসহায়ত্বের লাঞ্ছনাকর অগ্নিতে জ্বলে তারা অনুভব করছে যে, বায়তুল মাকদিস ধ্বংস করে সেখানে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ ও জাজিরাতুল আরব দখল করার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যত দেরি হবে ততই তাদের বিপদ বেড়ে যাবে। মুজাহিদদের অপরাজেয় মনোভাব এখন তাদের এই সংবাদ দিচ্ছে যে, 'এখন নয়তো কখনো নয়'। তাই তারা এ ব্যাপারে উন্মত্ত হয়ে উঠছে। তাই তারা মসজিদে আকসার অগ্নিগর্ভ ভূমিতে ব্যাপক সৈন্যসমাবেশ ঘটাচ্ছে এবং ওদের এ যুদ্ধের ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ প্রস্তুত করে রেখেছে। এখন শুধু অপেক্ষা করছে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া দেখার, যেখানেই মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার ভয় দেখবে তখনই পারস্পরিক শান্তিচুক্তির দোহাই দিয়ে পিঠ বাঁচিয়ে নেবে।

## মুজাহিদের দৃষ্টিতে আমেরিকা

সম্প্রতি মুফাক্কিরে ইসলাম শায়খুল হাদিস হজরত তাকি উসমানি দামাত বারাকাতুহু হানাদার আমেরিকান সৈন্যদের সহায়তায় পাকিস্তানি সৈন্য প্রেরণ হারামের ফাতওয়া দিয়েছেন। হয়তো আহলে হকদের প্রতিনিধিত্ব করে হজরতের এই যুগান্তকারী ফাতওয়া ইহুদিদের অগ্নিশর্মা করে তুলেছে। তাঁর জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত এ ফাতওয়া ইরাকে অবস্থানরত সৈন্যদের ততটাই বিভ্রান্ত করে তুলবে, যতটা তাদের পূর্বপুরুষরা তিহের প্রান্তরে হয়েছিল।

হে ইমানদারগণ, তোমাদের কী হয়েছে? যেখানে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সহযোগিতা, সুন্নাতের আলো, ইলমের গভীরে অবগাহনকারী আলিমদের পথপ্রদর্শন ও জিহাদি চেতনার অবিনাশী শক্তি তোমাদের সাথে রয়েছে। তোমরা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছ কীভাবে নামসর্বস্ব রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও নামিদামি দার্শনিকরা ব্যর্থ হয়েছিল। এখানে শুধু এমন মোল্লা ও মুজাহিদেরাই ছিল, যারা পুরো পৃথিবীবাসীর ব্যর্থতার পরেও নিজেদের হার স্বীকার করেনি।

Scanned by CamScanner

যারা আমেরিকার সাথে আফগানিস্তান ও ইরাকে সমানে সমানে পাল্লা দিচ্ছে। এরপরও কি তোমরা আল্লাহর পথ থেকে দূরে থাকবে? খোদার পথের সৈনিকদের বিরুদ্ধে যাবে? শত্রুদের বিভিন্ন প্রপাগান্ডায় ভীতসন্ত্রস্ত হবে? কবরের বাসররাতের ওপর কি তোমরা বেডরুমের রাত্রিযাপনকে প্রাধান্য দিচ্ছ? অতীত জামানায় জিহাদের ময়দানের গাজীদের বীরত্বগাথা ও শহিদদের রক্তমাখা স্মৃতি রয়েছে তোমাদের। তারপরও কেন তোমরা হীনমন্যতার শিকার? পূর্ব দিকের সূর্যের পয়গামকে বুঝতে শেখো, এ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার আগেই তাওবা করে নাও। কেননা, তখন এমন সময় আসবে, পুরো পৃথিবী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে, যখন কারও কোনো আর্তনাদ কাজে আসবে না।

## দুটি যমজ উদাহরণ

কিছু জিনিস প্রাথমিক দৃষ্টিতে আকস্মিক মনে হলেও বাস্তবতার নিরিখে গভীরভাবে তাকালে সেখানে এমন যৌক্তিক সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়, যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এই অধ্যায়ে এমন দুটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হবে। ঘটনা দুটির একটি হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের ঐতিহাসিক শত্রুতা ও বাবরি মসজিদের ঘটনা। অন্যটি হচ্ছে ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের সাংঘর্ষিক অবস্থা ও মসজিদে আকসার সমস্যা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয়টিকে স্বতন্ত্র ঘটনা মনে হলেও বাস্তবে উভয়টির মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। এ দুটি ঘটনার যোগসূত্র বোঝা ব্যতীত এই দুই ভূখণ্ডে ঘটা দুটি সংঘর্ষকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব নয়, যা কেন্দ্র করে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনার জন্ম নেবে; যে ঘটনাগুলো হবে সৌভাগ্যশীলদের জন্য চূড়ান্ত সৌভাগ্যশীলতার প্রতীক ও হতভাগাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের কারণ।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে এর পটভূমি আমাদের বোঝা উচিত। আমাদের পৃথিবীতে অসংখ্য গোত্রের লোক রয়েছে, যাদের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এই গ্রহকে সাজিয়েছেন। এর মধ্যে দুটি গোত্র এমন রয়েছে, যাদের মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে তারা জাতিগত ও বংশগত কারণে নিজেদের অন্যান্য জাতি থেকে ব্যতিক্রমী ও শ্রেষ্ঠতম মনে করে। তাদের বাহ্যিক একতা যদিও ধর্মের ভিত্তিতে, তবুও তারা সাধারণত অন্য কেউ তাদের ধর্মে দীক্ষিত হলে তাকে নিজেদের সমান মর্যাদার মনে করে না।

Scanned by CamScanner

জাতীয়তাবাদের চরম ঘৃণ্য পর্যায়ে পৌঁছে এরা বিজয়ী বা বিজিত হোক; উভয় ক্ষেত্রেই নিজেদের বংশকৌলীন্যের গর্বে বিভোর থাকে। আমলের (কাজের) মাপকাঠিতে মর্যাদা নিরূপণ না করে এরা ভাবে, বংশ আর জাতীয়তার ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা নির্ণিত হয়। এখানেই ইসলামের সর্বজনীনতা ও মর্যাদা দেখুন, আজ যদি কোনো নাককাটা কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসও ইসলাম গ্রহণ করে, সাথে সাথেই সে মুসলমানদের ইবাদাতে ইমাম আর রাজনীতিতে আমিরুল মুমিনিন হওয়ার সক্ষমতা রাখবে।

যাহোক, ওই দুটি গোত্রের কথা বলছিলাম, তারা যদিও নিজেদের মর্যাদা ও বড়ত্বের কারণ নিজেদের ধর্মীয় মর্যাদার কথা বলে; কিন্তু তারা এই ধর্মীয় মর্যাদাকে ছড়িয়ে দিয়ে অন্যদের এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী নয়। এর পরিবর্তে অন্যদের অচ্ছুত ও অভিশপ্ত হিসেবে তাদের শোষণ ও ধিক্কারের উপযুক্ত মনে করে সর্বদা নিজেদের সাথে পার্থক্য তৈরি করে রাখে।

এদের মধ্যে একটি হচ্ছে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়; যারা মূলত হিন্দু। এদের মতে, হিন্দুদের অন্য তিনটি জাতি ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য। অথবা শুদ্ধির মাধ্যমে যদি কেউ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, চাই সে যতই পরিপূর্ণ হিন্দুতে পরিণত হোক, কখনো ব্রাহ্মণদের মন্দিরে যেতে পারবে না এবং কিয়ামাত পর্যন্ত কখনো ওদের মতো মর্যাদাবান হতে পারবে না। ব্রাহ্মণ যতই পাপিষ্ঠ ও হিন্দুত্ববিরোধী হোক, সে-ই হবে প্রথম শ্রেণির ধার্মিক আর অন্যরা যতই কট্টর ধার্মিক হোক না কেন, তারা দ্বিতীয় শ্রেণির ধার্মিক হিসেবেই বিবেচিত হবে। মোটকথা, তাদের কাছে ধার্মিকতার বিবেচনা বিশ্বাস বা আমলে নয়; বরং জাত ও বংশের ভিত্তিতে নিরূপণ করা হয়।

এই অজ্ঞতাপ্রসূত ও অমানবিক মতবাদে বিশ্বাসী দ্বিতীয় জাতি হচ্ছে ইহুদিরা। ইহুদিরা ঐশী কিতাবের অধিকারী আসমানি ধর্মেও অনুসারী হওয়ার দাবিদার। তাদের প্রসিদ্ধ ধার্মিক ও রাজনৈতিক চিহ্ন ছয় কোণ-বিশিষ্ট দাউদি তারকা এই দাবিরই ইঙ্গিত বহন করে। যে তারকাটি দুটি ত্রিভুজের সমন্বয়ে গঠিত। যার মধ্যে সোজা ত্রিভুজটির তিন কোণের দ্বারা স্রষ্টা, মানুষ ও পৃথিবী উদ্দেশ্য। আর উল্টো করে আঁকা ত্রিভুজটির তিন কোণ ঐশীবাণী, সৃষ্টজীব এবং মুক্তির প্রতিকৃতি বহন করে। নিজেদের এসব ধর্মীয় দাবি সত্ত্বেও ইহুদিরা পৃথিবীবাসীকে ধর্মহীনতা, নির্লজ্জতা, বিপথগামিতা ও স্রষ্টা-বিমুখতায় নিমজ্জিত রাখতে চায়। এ জন্য কমিউনিজমের মতো নাস্তিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অশ্লীলতা ও নোংরামি পৌঁছিয়ে দেওয়া পর্যন্ত

Scanned by CamScanner

সব কৌশল তারা গ্রহণ করে। যেন পৃথিবীর সকল মানুষ নিজেদের ইন্দ্রিয়ের চাহিদা পূরণের তাগিদে প্রকারান্তরে তাদেরই দাসত্বের জালে আবদ্ধ হয়। যাতে করে জীবনের উঁচু লক্ষ্যের কোনো কল্পনা তাদের মনে না আসে।

ইহুদিরা পৃথিবীতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব চায়; কিন্তু তা এভাবে নয় যে, সমগ্র পৃথিবীবাসী তাদের ধর্ম গ্রহণ করুক, অথবা তাদের ধর্মই যদি মুক্তির মূলমন্ত্র হয়, তাহলে সবাই তাদের ধর্ম গ্রহণ করে মুক্তি পেয়ে যাক। পৃথিবীবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের যে পন্থা তারা অবলম্বন করতে চায় তা হচ্ছে, সমগ্র পৃথিবীবাসী ধর্মহীনতা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে চিরজীবন তাদের দাসত্ব করে বেড়াক। তারা কখনো চায় না—অন্য ধর্মের কেউ ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করুক। যদি কেউ পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সাথে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেও ফেলে তবুও সে কখনো পরিপূর্ণ ইহুদি হতে পারে না এবং কখনও সে ইহুদিদের মতো সুযোগ-সুবিধাও পাবে না। হ্যাঁ, অবশ্য যখন তারা নিজেদের সংখ্যালঘু হেতু কাউকে নিজেদের কোনো কাজে লাগাতে চায়, তখন তাকে নিজেদের দলভুক্ত করে সুন্দর নাম দিয়ে নিজেদের উপযুক্ত কাজে লাগিয়ে দেয়।

ইসরাইলে নতুন ইহুদি বসতি নির্মাণের সময় অনেক ইহুদি মৃত্যুর ভয়ে 'প্রতিশ্রুত ভূমি'র লোভেও সেখানে থাকতে রাজি হচ্ছিল না। তখন আগ্রাসীদের সংখ্যাস্বল্পতা হেতু বিভিন্ন অঞ্চলের নীচু বর্ণের লোকদের নতুন ইহুদি হিসেবে সেখানে থাকার জন্য আনা হয়। নতুন বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে তাদেরকে ফিলিস্তিনে আনা হলেও প্রাচীন ইহুদিদের চেয়ে তাদের ভিন্ন পরিচিতিতে রাখা হয়। মৌলিক ইহুদি যারা মূলত ইসরাইলের মালিক, তাদের 'অ্যাশকেনাজিম' (Ashkenazim) বলা হয়। আর নতুন ইহুদি যারা মুলত ইহুদিদের ঢাল হিসেবে নিজেদের উৎসর্গ করেছে তাদের 'সেফার্ডিম' (Sephardim) নামে অভিহিত করা হয়।

বংশীয় মর্যাদাকেই নিজেদের ধর্ম ও জাতীয়তার মূল ভিত্তি ধারণা করার মতো উন্মাদনার পাশাপাশি এ দুটি জাতির মধ্যে আরও বিভিন্ন সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : এই উভয় জাতিই নিজেদেরকে মহান আল্লাহর প্রেরিত ও মাকবুল বান্দা হিসেবে মনে করে। এবং উভয় জাতিই আল্লাহর সাথে তার নেক বান্দাদের শরিক করে; এমনকি তাদেরকে আল্লাহর পুত্র বা অবতারও মনে করে। হিন্দুরা মহান আল্লাহর সাথে বেআদবি করে সাপ, ইঁদুর, বানরের মতো প্রাণীকেও প্রভুর সমকক্ষ মনে করে। অন্যদিকে ইহুদিরা নবি-রাসুল ও

Scanned by CamScanner

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে বেআদবি করে। তাদের ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া, অন্যায় আচরণ করা এমনকি তাদের হত্যা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। আরেকটি ব্যাপারেও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। মুসলমানদের সাথে নিজেদের তুলনা করে সর্বদা তাদের মধ্যে একটি হীনমন্যতা কাজ করে। হিন্দুরা এ বিষয়টি মেনে নিতে পারত না যে, তাদের প্রভুদের বিরোধিতাকারী মুসলমানরা আরব ও অনারবে তাদের চেয়ে বেশি প্রতিপত্তির অধিকারী হবে। ঠিক তেমনিভাবে ইহুদিরাও হিংসার অনলে জ্বলে যে, কীভাবে আরবের অশিক্ষিত লোকেরা তাদেরকে নবুওয়াত ও নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করে পৃথিবীব্যাপী জ্ঞান ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছে।

এই দুটি যমজ দলের সামঞ্জস্যতার বিবরণ এখানেই শেষ নয়। এই দুটি রাষ্ট্রই মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের একাত্মতামূলক অবস্থানকে একধরনের অঘোষিত চুক্তির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। একদিকে কাশ্মিরি মুসলমানদের ওপর নির্যাতনে মোসাদের ফরমুলা হতে শুরু করে পাকিস্তানের কুয়েটা পারমাণবিক চুল্লি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে বাবরি মসজিদ ধসিয়ে দেওয়া থেকে বায়তুল মাকদিস ধ্বংসের পরিকল্পনায় তারা একে অপরের অংশীদার। শুধু তাই নয় আশেপাশের প্রতিবেশী দেশগুলোকে একত্র করে ইসরাইল যেমন 'গ্রেট ইসরাইল' রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করছে, ঠিক তেমনিভাবে উপমহাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে একত্রিত করে 'বৃহৎ হিন্দু রাষ্ট্র' তথা 'অখণ্ডভারত' প্রতিষ্ঠার জন্য গো-মাতার পূজারিরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। জায়নবাদীদের গোপনীয় সেমিনারগুলোতে যেভাবে লেবানন, জর্দান, সিরিয়া, ইরাক ও সাউদি আরবকে ইসরাইলের অংশ হিসেবে দেখানো হয় তেমনিভাবে 'অখণ্ডভারত' পরিকল্পনায় বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া ও মালদ্বীপের পাশাপাশি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকেও তার অংশ হিসেবে কল্পনা করা হয়।

ইহুদিদের মতো হিন্দু জাতিও তাদের কল্পিত হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে তৎপর। তারা ইতোপূর্বে যেসব রাষ্ট্র হিন্দুস্তানের সাথে জড়িত ছিল সামরিকভাবে সেগুলো দখল করে সেখানের নাগরিকদের শুদ্ধির মাধ্যমে হিন্দু বানাতে আগ্রহী। প্রতিবেশী দেশগুলোতে ভারতের ষড়যন্ত্র, নিজেদের প্রভাব বিস্তার ও অহেতুক সৈন্যসমাবেশের পেছনে মূলত কুচক্রি ইহুদিদের মতো আগ্রাসী পরিকল্পনা দায়ী। আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, ভারত যেভাবে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে নিজেদের একমাত্র শত্রু মনে করে ঠিক সেভাবে পাকিস্তানকেই ইহুদিরা নিজেদের চোখের কাটা

Scanned by CamScanner

হিসেবে দেখে। কারণ, ভূপৃষ্ঠের একমাত্র এই দেশটিই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সক্ষমতা রাখে। ভারত ও ইসরাইল উভয়ের দৃষ্টিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্ব ও যোগ্যতা পাশাপাশি এর নাগরিকদের জিহাদি জজবা ও গত দু-দশক ধরে জিহাদের সাথে কার্যকারী সংযুক্তি মূলত ইসলামি দ্বিতীয় জাগরণের ভিত্তি হতে পারে এবং মহান আল্লাহর মনোনীত শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং কুরআনি আইনের ব্যক্তিজীবনে বাস্তবায়ন একমাত্র এই ভূমিতেই[৫৬] সম্ভব। কুদরতের এই মহা পরিকল্পনা এখনো হয়তো সূতিকাগারেই প্রতিপালিত হচ্ছে। আর এই উভয় শত্রুই উপরে উপরে বন্ধুত্বের কপটতার ভান ধরলেও ভিতরে ভিতরে নিজেদের পাকিস্তান-বিরোধী পরিকল্পনাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে যাচ্ছে।

সারকথা, উভয় জাতিই মুসলমানদের বিরুদ্ধে আদিকাল থেকে চরম শত্রুতা পোষণ করে আসছে। কুরআনে কারিমের ষষ্ঠ পারার শেষ আয়াত[৫৭] 'আর তোমরা ইহুদি ও মুশরিকদের পাবে মুমিনদের চরম শত্রু হিসেবে'—এর স্পষ্ট প্রমাণ। অনেক জাতিই মুসলমানদের সাথে চরম শত্রুতায় লিপ্ত ছিল; কিন্তু পরিস্থিতির বিবর্তনে শুধু সাময়িক শত্রুতা ভুলে যাওয়া নয়; বরং তারা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। তাতারি এবং তুর্কিদের ইতিহাস যার সুন্দর উদাহরণ। কিন্তু এই ইহুদি ও হিন্দুদের ইসলামবিদ্বেষ যেভাবে যুগ যুগ ধরে আসছে তা এখন শত্রুতার গণ্ডি ছাড়িয়ে গোঁয়ার্তুমির স্থানে পৌঁছেছে। জীবনের ধারাবাহিকতায় এ শত্রুতা চলতেই থাকবে যতদিনে এ তিনটি জাতির মধ্যে বাস্তব সত্যের অনুসারীদের আল্লাহ বিজয়ী করবেন। ইসলামের শুরুলগ্নে যেভাবে মক্কার মুশরিক ও মদিনার ইহুদিরা পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর ছিল তেমনিভাবে ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও ১৯৪৮ সালের ইসরাইল প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত উপমহাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উভয় জাতিই সমানভাবে তৎপর। মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে যেন উভয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলছে। এভাবেই আরও অনেক দিক থেকেই এই দুটি জাতি সামঞ্জস্যতা রাখে। তন্মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক যেসব পরিকল্পনায় তারা ঐক্যবদ্ধ শুধু সেগুলোর আলোচনাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনখানা হাদিস আলোচনা করা যেতে পারে, যেখানে আশ্চর্যজনকভাবে দুটি জাতির প্রায় একই পরিণতির কথা বলা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

১. হজরত সাওবান রা. হজরত রাসুল ﷺ হতে বর্ণনা করেন; তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতের দুটি দলকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন।[৫৮] এর মধ্যে একটি দল হিন্দুস্তানের জিহাদে শরিক হবে অপরটি হজরত ইসা আ.-এর সহযোদ্ধা হবে।'[৫৯]

২. হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমাদের একটি দল ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। মহান আল্লাহ তাদের বিজয়ী করবেন। এই বিজয়ীগণ হিন্দুস্তানের শাসকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বন্দি বানিয়ে নেবে। এই দলের মুসলমানদের আল্লাহ মাগফিরাত দান করবেন। হিন্দুস্তানের জিহাদ শেষে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য এরা যখন মধ্যপ্রাচ্যের দিকে রওনা হবে, সেখানে তারা হজরত ইসা আ.-এর সাক্ষাৎ লাভ করবে।'

এই হাদিসে ভারতের শাসকদের বন্দি করতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, তারা চরম মাত্রার দুষ্ট ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির হবে। হয়তো তারা ভয়ংকর আতংকবাদী হিন্দু সংগঠনের নেতৃত্বধারী পর্যায়ের লোকেরা হবে।

৩. হজরত নাহিক বিন সারিম রা. হতে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমরা জিহাদ করতেই থাকবে; যে পর্যন্ত তোমাদের শেষ দল জর্দান নদের পাশে দাজ্জালকে হত্যা করবে। তোমরা সেই নদের পূর্ব দিকে থাকবে আর তারা পশ্চিম দিকে অবস্থান নেবে।'[৬০]

হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে সারিম আস সাকুনি বলেন, 'আমি জানি না, তখন জর্দান নদ বলতে পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডকে বোঝাবে।'

জর্দান নদী আজ জর্দান ও ইসরাইলের সীমান্তে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে মুসলমান ও পশ্চিমদিকে ইহুদিরা বসবাস করে। পশ্চিম তীর তথা জর্ডানের পশ্চিম দিকের কথা অনেকেই শুনেছেন আর সেখানেই ইহুদিরা নতুন ইহুদি বসতির জন্য সুউচ্চ নিরাপত্তাপ্রাচীর নির্মাণ করেছে।

---

[৫৮] অর্থাৎ, তারা জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে এবং জান্নাতি হবে।

[৫৯] কানজুল উম্মাল; মুসনাদে আহমাদ; সুনানে নাসায়ি; মুজামে তাবরানি।

[৬০] মুজামে তাবরানি; মুসনাদে বাজজার্।

Scanned by CamScanner

উপরিউক্ত তিনখানা হাদিসের[৬১] ভাষ্য দেখুন, যেখানে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহ কিয়ামাতের পূর্বে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাবেন। এবং তাদের হাতে ভারতের হিন্দু ও মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিদের চরমভাবে পরাজিত করবেন। আরও বিভিন্ন হাদিসে উভয় যুদ্ধের পটভূমি, সময়কাল ও ঘটনাসমূহের পাশাপাশি এতে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের ফজিলতের ব্যাপারেও প্রায় সামঞ্জস্যতার আলোচনা বিবৃত হয়েছে। আমরা মহান আল্লাহর দয়া ও এই উম্মাহের মুজাহিদিনদের ব্যাপারে তাঁর অনুকম্পার খাতিরে আশাবাদী, তিনি এই দুটি যুদ্ধের মুজাহিদিনদের সমর্থক ও তাদের সাথে আন্তরিকতা পোষণকারীদের ও তার প্রতিশ্রুত দয়ার কিছু অংশ অবশ্যই দান করবেন।

হে দেশবাসী, হে আফগানের আত্মমর্যাদাশীল যুবকেরা, হে ফিলিস্তিনের জনগণ, ইসলামের যে শক্তি ও নিআমাতের ছোঁয়া তোমরা পেয়েছ, তার মূল্য বুঝতে শেখো। আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাঁর ক্রোধের উপযুক্ত হয়ো না। বরং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে নিজেকে মহান আল্লাহর দয়ার উপযুক্ত করে নাও।[৬২] প্রতারণার ফাঁদে পড়ে মরীচিকার পেছনে ছুটাছুটি করো না; বরং সততা, বীরত্ব ও ন্যায়পরায়ণতায় নিজেকে গুণান্বিত করো সেদিনের জন্য, যেদিন তোমার হাতে বিশ্বনেতৃত্ব অর্পিত হবে।

---

[৬১] সনদের দিক থেকে তিনটি হাদিসই গ্রহণযোগ্য।

[৬২] এটাই দীনের মূল স্পিরিট। মিল্লাতে ইবরাহিমের আদর্শ ও চেতনা। বর্তমানকালে মুসলমানদের অধঃপতন, পরাজয় ও হতভাগ্যের অন্যতম কারণ হলো মিল্লাতে ইবরাহিম থেকে বিচ্যুতি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আলী হাসান উসামা অনূদিত—*মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ*।

Scanned by CamScanner

# রহস্যময় বর্ণের ব্যাখ্যা

কয়েক সংখ্যা পূর্বে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের ব্যাপারে লাহোরের কয়েকজন বন্ধু চিঠি পাঠিয়েছেন যে, এক ডলারের নোটের ওপর লেখা শব্দগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়নি। সেই লেখাগুলোর উদ্দেশ্য কী? তাই আজকের এই অধ্যায়ে এই শব্দগুলোর বিশ্লেষণ নিয়েই আলোচনা করব, যা দাজ্জালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মুদ্রায় লেখা রয়েছে।

আমেরিকান এক ডলারের নোটে যে চিহ্নগুলো রয়েছে : একটি শকুনের আকৃতি, যার ডান হাতে রয়েছে গমের শীষ ও আর বাম হাতে তীরগুচ্ছ। বাম দিকে যে বৃত্ত রয়েছে, তার মধ্যে যেসব চিত্র, চিহ্ন ও শব্দগুলো লেখা রয়েছে তা অস্বাভাবিক এবং যে কাউকে চমকে দিতে পারে। সেগুলো খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করা উচিত। যেমন—

মিসরের পিরামিড আকৃতির চিত্রের উপরিভাগে চোখের চিহ্ন আঁকা রয়েছে। অনুসন্ধানি এ চোখের দৃশ্য কেমন যেন মনে করিয়ে দেয়, সে খুব ভালোভাবেই পুরো পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। জায়নবাদী বুদ্ধিজীবীরা কেমন যেন পুরো পৃথিবীকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের নেতা মাসিহ দাজ্জাল একটি চক্ষু দ্বারা পুরো পৃথিবীকে নিজের অদৃশ্য আয়ত্তে নিয়ে রেখেছে। যদি তাদের কেউ এ প্রশ্ন করে যে, তোমাদের নেতা দাজ্জাল কেন পর্দার অন্তরালে থেকে পুরো পৃথিবীকে নিজের আয়ত্তে নিচ্ছে? কেন নিজেকে প্রকাশ করে প্রকাশ্যে সকল বিষয়ের সমাধান দিচ্ছে না? এর উত্তরে তারা বলে, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ তখনই ঘটবে যখন পৃথিবীজুড়ে একটি পবিত্র ধর্মযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। আর এতে ইসরাইল সমস্ত মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। এটি তখনই ঘটবে যখন তারা তাদের পরিকল্পনামতে বায়তুল মাকদিসকে ধ্বংস করে দেবে। ফলশ্রুতিতে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হবে এবং সেখানে সুলায়মানি কাঠামোর তৃতীয় নির্মাণ করবে এবং ইহুদিদের সহযোগিতা করবে। এভাবেই পৃথিবীর সামনে শয়তানের এই প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটবে।

Scanned by CamScanner

ইহুদিরা এই মতবাদকে এতটাই বিশ্বাস করে যে, তারা সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের জন্য সরঞ্জামাদিও প্রস্তুত রেখেছে। বায়তুল মাকদিসের আশেপাশে বেশ কিছু দোকানে কট্টর ইহুদি কারিগররা এমন দুর্লভ কিছু নকশা প্রস্তুত করছে তাদের ধারণামতে যা সুলায়মানি কাঠামোতে ব্যবহার করা হবে। এক ইহুদি বিশুদ্ধ রেশমের কাপড় তৈরি করছে যার মাধ্যমে ইহুদি রাব্বিদের পোশাক তৈরি করা হবে, আর তারা প্রায় ৪ হাজার বছর পর সুলায়মানি কাঠামোতে ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করবে। কয়েক বছর পূর্বে জেরুসালেমে তাদের একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরম্ভ করা হয়েছে। যার নাম হচ্ছে 'সন্ন্যাসীদের মুকুট'।[৬৩] সেখানে প্রাচীনপন্থী ইহুদি পণ্ডিতরা ইহুদি যুবকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কীভাবে সুলায়মানি কাঠামোতে প্রভুর সামনে লাল কুমারী গাভী বলি দিতে হবে। সেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর সমস্ত ইহুদিদের কাছ থেকে বড় পরিমাণে চাঁদা একত্রিত করে। এবং সেই প্রতিষ্ঠানের আত্মিক সাধনার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রদের সাথে অন্য সাধারণ ইহুদিদের সাক্ষাৎ করায়; যাতে তারা পবিত্র এ বলিদানের প্রস্তুতির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নিজেদের উজ্জীবিত করতে পারে।

ইহুদিদের বিশ্বাসমতে End Time বা 'শেষ সময়' নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। তাই নিজেদের নেতার দর্শনের প্রস্তুতির জন্য ব্যাপক পরিমাণে চাঁদা দেওয়াকে তারা আবশ্যক মনে করে। আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি ইহুদিদের প্রপাগান্ডার আসল কারণ এখানে কিছুটা বোঝা যায়।

এবার একটু নোটটিতে আঁকা পিরামিড আকৃতির ত্রিভুজটির ওপর দেখুন 'আনুইট কয়েপটিস' (Annuit cœptis) লেখা রয়েছে। আমেরিকানরা ইংরেজি-স্প্যানিশ ভাষা জানলেও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা জানে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তাদের নোটে ইংরেজি ভিন্ন অন্য ভাষায় এ কথাটি লেখা হয়েছে। এ শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে সফলতার মেলবন্ধন। সফলতার মেলবন্ধন বলতে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহান প্রভু ইহুদিদের জন্য দুটি পরিকল্পনা করেছে। একটি পরকালীন স্বর্গীয় পরিকল্পনা। অপরটি ইহকালীন প্রার্থীব পরিকল্পনা। পরকালীন পরিকল্পনা তো ইহুদি পণ্ডিতরা বর্ণনা করে। আর ইহকালীন পরিকল্পনা হচ্ছে, ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ। যেখানে দাউদ আ.-এর সিংহাসনে বসে একচোখা দাজ্জাল পৃথিবীর শাসন

---

[৬৩] আমাদের ধর্মীয় পরিভাষায় তাজুল উলুম বা তাজুল উলামা বলা যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

করবে। সেই সময়ে পৃথিবীর লাইফস্টাইল, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও যোগাযোগ-মাধ্যমের উপর ইহুদিদের যে কর্তৃত্ব থাকবে সেটিই সফলতা অর্জনের ভূমিকা।

পিরামিডের চিত্রটির নিচে লেখা আছে ' নভাস অরডো সেকলোরাম' (Novus ordo seclorum)। সহজ ভাষায় এর অনুবাদ হচ্ছে ওই নতুন বৈশ্বিকতত্ব যা সিনিয়র ডব্লিউ বুশ 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' নামে প্রস্তাবনা করেছিল। এই তত্ত্বমতে আফ্রিকা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মতাদর্শের লোকদের জায়নবাদী ইসরাইলের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। এ তত্ত্বের সফলতা এতেই অনুমান করা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে এমন অনেক ইসরাইলের হিতাকাঙ্ক্ষী রয়েছে যারা কোনোভাবেই ইহুদি নয়; বরং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অতীতে তারা ইহুদিদের শত্রু ছিল। যেমন বর্তমান আমেরিকার বড় একটি খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী এমনকি নেতৃস্থানীয় পর্যায়েরও অনেকে রয়েছে ইসরাইলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তারা ইহুদিদের চেয়েও তৎপর। ইসরাইলের প্রতি তাদের সহমর্মিতা পূর্বের অন্যায়ের অনুভূতির কারণে নয়। এমনকি ইহুদিদের দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা দূরীকরণার্থেও নয়; বরং ইহুদিরা তাদের এ বিশ্বাস করিয়েছে যে, ইসরাইলই এমন জায়গা, যেখানে শেষ যুগে হজরত ইসা আ. অবতরণ করবেন এবং ধর্মীয় মহাযুদ্ধের 'আরমেগেডন' (Armageddon) পর খ্রিষ্টবহির্ভূত প্রত্যেকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি খ্রিষ্টানের উচিত ইসরাইলের সহযোগিতা করা। যদি খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদাহানি ঘটবে। অন্যদিকে আরবরা যেহেতু 'এন্টিক্রাইস্ট' (Antichrist)[৬৪], তাই তাদের শুধু জেরুসালেম থেকে নয়; বরং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য থেকে সমূলে বিনাশ করা খ্রিষ্টানদের কর্তব্য। যেহেতু এই আরবরা তাদের সাথে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির পথে প্রতিবন্ধক, তাই হজরত ইসা আ.-এর ভালোবাসার খাতিরে এদের বিরোধিতা করা তাদের কর্তব্য।

এখানে ইহুদিদের চাতুরতা দেখুন, তারা তাদের কল্পিত মাসিহ দাজ্জালের আগমনের পটভূমি তৈরির জন্য সত্যিকারের মাসিহ হজরত ইসা আ.-এর অনুসারীদের সহযোগিতা নিচ্ছে। বনি ইসরাইলের বোকাদের তারা এতটাই উন্মত্ত করে তুলেছে যে, কিছু খ্রিষ্টান এখন উগ্রবাদী ইহুদিদের তুলনায়ও বেশি

[৬৪] খ্রিষ্টানবিদ্বেষী।

Scanned by CamScanner

কট্টর। আর এভাবেই জায়নবাদী অপশক্তির কাতারে ইহুদিদের পাশে খ্রিষ্টানরাও শামিল হয়েছে। যারা এ ধারণা রাখে যে, পৃথিবীর ৭ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য হচ্ছে দুটি গোষ্ঠী ইহুদি ও খ্রিষ্টান। পৃথিবীর অন্য কেউই আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি পাবে না তারা সবাই শেষ মহাযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর এই দুটি সম্প্রদায়ই মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় হবে।

পিরামিডের ভিত্তিমূলে রোমান হরফে লিখিত সংখ্যা খোদাই করা দেখা যায়। MDCC XXVI। এই সংখ্যাগুলোর যোগফল হয় ১৭৭৬। বাহ্যিকভাবে এটি আমেরিকার স্বাধীনতার বছর হলেও বাস্তবে এর সাথে আমেরিকান দেশপ্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত সেই বছরেই জায়নবাদী দর্শনের স্বপ্নদ্রষ্টারা 'অর্ডার অব ইলুমিনাতি' (Order of Illuminati)[৬৫] নামক তত্ত্বের উদ্ভাবন করে। সে নীতিমালার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ইহুদিরা খ্রিষ্টানদের জানান দেয়, প্রভু আমেরিকার উপর দয়াবান এ জন্য যে, তারা ইহুদিদের উপর দয়াশীল। শুধু এ কারণেই আমেরিকানরা নিজেদের ট্যাক্স থেকে ইসরাইলকে প্রতি বছর ৬ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য দিয়ে থাকে। এই সংখ্যা অন্যান্য সংযুক্ত বাজেটের নামে ইসরাইলকে দেওয়া অনুদানের বাইরে। ইসরাইলকে দেওয়া অনুদানের পরিপূর্ণ হিসাব আমেরিকান কংগ্রেস কখনও দেয় না। আর তা এ জন্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের জোটবদ্ধ অন্যান্য রাজ্যগুলোতে ট্যাক্স আদায় করে। সেখানে হয়তো অন্য রাজ্যগুলো বলে বসতে পারে—জোটবহির্ভূত ইসরাইলকে কেন তাদের চেয়েও বেশি পরিমাণে অনুদান দেওয়া হচ্ছে?

১৯৪৯-১৯৯৫ পর্যন্ত প্রায় ২৬ বছরে আমেরিকার ট্যাক্সদাতারা ইসরাইলকে বেসরকারিভাবে প্রায় ৬২৬৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, আমেরিকা পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম একটি দেশকে[৬৬] এত পরিমাণে অনুদান দিচ্ছে, যা লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলোর মোট অনুদানের চেয়েও বেশি। যেখানে ওই দেশগুলোকে দেওয়া অনুদানের পরিমাণ জনপ্রতি ৪০ ডলারের মতো, সেখানে ইসরাইলকে দেওয়া অনুদানের পরিমাণ জনপ্রতি ১০ হাজার ৭৭৫ ডলারের মতো।

---

[৬৫] আলোকিত আত্মার লোকদের নীতিমালা।

[৬৬] যার জনসংখ্যা অত্যন্ত কম।

Scanned by CamScanner

খ্রিষ্টানদের এই অর্থনৈতিক আশকারা পেয়ে ইহুদিদের একটি দল সিনাই মরুভূমিতে মসজিদে আকসার নমুনা বানিয়ে সেখানে হামলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সেখানে তারা পরীক্ষামূলকভাবে অভিজ্ঞতা নিতে চাচ্ছে যে, বোমা হামলার মাধ্যমে মসজিদকে ধ্বংস করা হলে তার ধ্বংসস্তূপ কোন্‌দিকে কী পরিমাণ জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে।

মোদ্দাকথা, ইসরাইল একই সাথে ঘরের ভেতরে-বাইরে উভয় ফ্রন্টেই কাজ করে যাচ্ছে। যে ইসরাইলের একদিন সরাসরি লক্ষ্যবস্তু হবে একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর মুসলিম দেশ পাকিস্তান। যা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি বড় প্রতিবন্ধক। মহাইসরাইলের পরিকল্পনাকারী ও ভারত যেহেতু প্রাকৃতিকভাবেই একে অপরের বন্ধু। তাই ফিলিস্তিনের মুসলমান ও কাশ্মিরের আত্মত্যাগী মুসলিম যুবকদের আজ বা কাল অবশ্যই একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে। বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণ এবং বায়তুল মাকদিসের জায়গায় সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ উভয় পরিকল্পনার যেকোনো একটির বাস্তবায়ন অপরটির বাস্তবায়নের পথকে সুগম করবে। আজ হোক বা কাল এ আগুনে আমাদের ঝাঁপ দিতেই হবে; যার প্রকাশ্য দিকটি যন্ত্রণাদায়ক হলেও ভিতরেই জান্নাতের শান্তি বিরাজমান। তাই আমাদের ইমান অথবা কুফুরের যেকোনো একটি পক্ষকে বাছাই করে নিতেই হবে।

নিজের জানবাজি রেখে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ও নিজের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হচ্ছে ইমানের চিহ্ন। অন্যদিকে কাপুরুষতা ও কৃপণতা হচ্ছে কুফুরির লক্ষণ। একদিকে দেখা যাচ্ছে ইহুদিরা নিজেদের যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করছে এবং সমগ্র পৃথিবী থেকে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সেনাবাহিনীর জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছে; অন্যদিকে এরাই আবার মুসলমানদের মাদরাসা ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়-সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়। অথচ বাস্তবে এই সংগঠনগুলো নিষ্প্রভ হতে দেরি হতে পারে; কিন্তু সন্ত্রাসী ইহুদি-বাহিনী অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের দিকে তাদের নাপাক হাত বাড়িয়ে দিতে দেরি করবে না।

যখন দাজ্জাল মদিনা মুনাওয়ারায় যাবে তখন উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করে মসজিদে নববির দিকে দৃষ্টিপাত করে নিজের সহযোদ্ধাদের বলবে,[৬৭] 'তোমরা কি এই সাদা স্থাপনাটি দেখতে পাচ্ছো? এটি (হজরত) মুহাম্মাদের

[৬৭] যারা হবে উগ্রবাদী ইহুদি-খ্রিষ্টান ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা মুসলমান।

Scanned by CamScanner

(ﷺ)মসজিদ।' তারপর সে মদিনায় প্রবেশের চেষ্টা করবে; কিন্তু মদিনায় প্রবেশের প্রতিটি রাস্তা সশস্ত্র ফেরেশতাগণ পাহারা দেবেন।[৬৮]

হজরত ইবনে হাজার আসকালানি রাহ. *ফাতহুল বারিতে* (১৩/৯৪) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মসজিদে নববির উজ্জ্বল ও শুভ্র হওয়ার ব্যাখ্যা করেননি। বর্তমানের স্যাটেলাইট ক্যামেরা বা উপর থেকে নেওয়া মসজিদে নববির ছবিগুলোতে তাকে আলোকিত ও শুভ্র দেখা যায়। এটি মহান আল্লাহর কুদরত ও তাঁর নবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতার প্রমাণ।

ডলারের পেছনের অর্থবোধক এসব ছবি, রহস্যময় শব্দ ও সংখ্যা বছরের পর বছর ধরে এভাবেই চলে আসছে। মুসলমানরা ইহুদিদের এসব পরিকল্পনা নিজেদের পকেটে নিয়ে ঘুরছে; কিন্তু তাদের নবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওই ভবিষ্যদ্‌বাণী তারা ভুলে গিয়েছে: খোরাসানের (আফগানিস্তানসহ) কালো পতাকাধারীরা বায়তুল মাকদিসের ওপর বিজয় পতাকা উড়াবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাদের থামাতে পারবে না।[৬৯]

হে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের উলামায়ে কিরাম ও তালিবে ইলমগণ, সুসংবাদ গ্রহণ করুন যে, হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী আপনাদের জন্যই।

---

[৬৮] মুসনাদে আহমাদ : ৪/৩৩৮ মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ৩/৩০৮।

[৬৯] সুনানে তিরমিজি : ২/৫২।

Scanned by CamScanner

# জাতীয় গাদ্দারদের উপাখ্যান

## অবাঞ্ছিত ব্যক্তি

এ অধ্যায়ে মৌলিকভাবে একজন ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার আলোচনা করব। যে কিনা ভারত উপমহাদেশ হতে হিজাজ পর্যন্ত সকল মুসলমানদের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। উপমহাদেশের অসংখ্য মুসলমানের পাশাপাশি হিজাজ, জর্দান, তুরস্ক ও ফিলিস্তিনের মুসলমানরা আজ পর্যন্ত যে বিশ্বাসঘাতকতার চরম মূল্য পরিশোধ করে আসছে। হতভাগা এ ব্যক্তিটি মুসলমানদের জন্য যতটা অকল্যাণকর হয়েছে নিকট অতীতে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। মুসলমানদের দীর্ঘ ইতিহাস ইসলামের জন্য একনিষ্ঠ বীরদের বীরত্বগাথায় পরিপূর্ণ। পাশাপাশি তিক্ত সত্য হলেও বলতে হয়, ইসলামের ইতিহাসে এমন বিশ্বাসঘাতকদের সন্ধানও পাওয়া যায়, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল। নিজের ধর্ম ও জাতির বিরুদ্ধে তাদের কেউ কেউ এমন কর্মকাণ্ড করেছিল, যা ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। যার ফলে ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের জঘন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। আর এই হতভাগারা নিজেদের চক্রান্তের জেরে এসব অপকর্মের চিরস্থায়ী পাপের অংশীদার হচ্ছিল।

সবচে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে—সে ব্যক্তির স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার এ ধারাবাহিকতা তার বংশধরের মধ্যেও বরাবরের মতো এখনো বিদ্যমান। এখন পর্যন্ত তার বংশধরেরা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সেবাদাস হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। গত শতাব্দী থেকে আরব অনারবের মুসলমানরা এ গোষ্ঠীর বিভিন্ন কুকর্মের দায় নিয়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো এদের অপকর্মের দায় আরও দীর্ঘদিন ধরে বয়ে বেড়াতেই হবে।

Scanned by CamScanner

## স্বাধীনতার সেনানী

এ উপাখ্যান সে সময়ের, যখন হিজাজ-ভূমিসহ সম্পূর্ণ জাজিরাতুল আরব তুরস্কের উসমানি খিলাফাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুর্কিদের ইসলামপ্রীতি, হারামাইন শরিফাইনের খিদমাত ও সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কল্যাণকামিতার কারণে তারা সারা বিশ্বের মুসলমানদের ভালোবাসার পাত্র ছিল। ব্রিটিশরা নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে তুরস্কের উসমানি খিলাফাতের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটছিল। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দুকে ধ্বংস করা। যেন একদিকে উপমহাদেশে তাদের উপনিবেশ মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়। অন্যদিকে হিজাজ-ভূমিকে তুরস্কের উসমানি খিলাফাতের হাত থেকে মুক্ত করে এমন তাবেদার সরকারের হাতে অর্পণ করা, যারা জায়নবাদী নতুন রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হবে না। আর তখন উপমহাদেশে হজরত মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রাহ. ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীন অঞ্চল থেকে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে ভারতের ইংরেজদের ওপর আক্রমণ করে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করা। এবং সেখানে খিলাফাতে রাশেদার আদলে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র হজরত ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি রাহ.-কে মুজাহিদ বাহিনীকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কাবুল অভিমুখে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে নিজে উসমানি খিলাফাতের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে হিজাজ অভিমুখে সফর করেন।

## দ্বিমুখী তলোয়ার

হজরত মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রাহ.-এর সেই পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত হতো, তাহলে হয়তো আজ পৃথিবীর মানচিত্র অন্যরকম হতো। কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এক হতভাগা স্বজাতির বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তার অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সু মনোভাব মুসলমানদের এমন ভয়াবহ সময়ের মুখোমুখি করে যখন আরবের পবিত্র ভূমি শক্তিশালী উসমানি খিলাফাতের আয়ত্তের বাইরে চলে আসে। তদস্থলে এই পবিত্র ভূমির দায়িত্ব এমন অর্থলোভী শাসকদের হাতে আসে যারা এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মুখাপেক্ষী। যাদের তত্ত্বাবধানে ইসলামি এ পবিত্র ভূমির সম্পদ লুটে নিয়ে নিউ ইয়র্ক ও লন্ডনের মতো শহরকে সুসজ্জিত করা হয়। আর সেই হতভাগা

Scanned by CamScanner

ব্যক্তিটি ছিল তৎকালীন মক্কা মুকাররামার গভর্নর শরিফ হুসাইন। এই পাপিষ্ঠ মুসলমানদের আশা-ভরসার সকল পরিকল্পনায় পানি ঢেলে দিয়েছিল। একদিকে তুরস্কের উসমানি খিলাফাতের কেন্দ্রকে সে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছিল যে, মক্কা ও হারামাইনের পুণ্যভূমির নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমরা যথেষ্ট। আপনারা নিশ্চিন্তে বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক শক্তি ব্যয় করতে পারেন। পাশাপাশি ব্রিটিশদের পরামর্শ অনুযায়ী আরবদের জাতীয়তাবাদকে উসকে দিয়ে তুর্কি উসমানি খিলাফাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত করছিল।

অন্যদিকে হজরত মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রাহ. হিজাজের গভর্নর গালিব পাশা কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিশেষ ফরমান আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেখানে উসমানি খিলাফাতের সকল কর্মকর্তাদের ভারতের মুসলমানদের সমর্থন ও সহযোগিতার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।[৭০] পাশাপাশি তুর্কি খিলাফাতের যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সমর্থন আদায় করে নেন। ভারতের মুসলমানদের প্রতি উসমানি খিলাফাতের প্রকাশ্য সমর্থন সম্বলিত চিঠি নিয়ে তিনি অতি দ্রুত আফগানিস্তানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। তার পরিকল্পনা ছিল এমন যে, কেন্দ্রীয় তুর্কি খিলাফাতের সমর্থন পাওয়ার সুবাদে ভারতের বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানরা তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবে। অতঃপর বহিরাগত মুজাহিদদের নিয়ে তিনি ব্রিটিশদের উপর হামলা করবেন এবং ভারতের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত মুসলমানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লে তাদের পরাজয় নিশ্চিত করে খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু উল্লেখিত এই ব্যক্তিটি ইংরেজদের প্ররোচনায় তাকে গ্রেফতার করে। অতঃপর তাকে প্রথমত মিসর এবং পরবর্তীতে মাল্টায় প্রেরণ করে যেখানে তার দীর্ঘদিন কারাভোগ করতে হয়।

তার চক্রান্তের জেরে ভারত মুসলমানদের হাতছাড়া হওয়ার পাশাপাশি এসব পবিত্র স্থানসমূহও উসমানি খিলাফাতের আওতার বাইরে চলে যায়। এবং জাজিরাতুল আরবকে ছোট ছোট বিভিন্ন টুকরোয় ভাগ করে দেওয়া হয়। এই অঞ্চলের শাসনভার এমন শাসকদের হাতে চলে যায় যারা অজস্র সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ফিলিস্তিনি মুসলমান ও পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমানরা তাদের মাধ্যমে কোনো ধরনের উপকৃত হয় না। হয়তো

[৭০] যা তখন গালিবনামা নামে পরিচিতি পেয়েছিল।

Scanned by CamScanner

তারা ইসরাইলের সাথে সামরিক শক্তিতে পাল্লা দিতে পারে না; কিন্তু ফিলিস্তিনের যেসব মুসলমান অসহায়ত্বের সাথে শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে তাদের তো আর্থিক চিন্তাটাও দূর করে দিতে পারত; যেন তারা নিশ্চিন্তে যুদ্ধে শরিক হতে পারে। কিন্তু তাদের জন্য এটাও সম্ভব হচ্ছে না।

## অলক্ষুণে হাত

ইংরেজরা তাদের এই দালালকে হিজাজের শাসনকর্তা হওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিল; যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। হিজাজ-ভূমিতে আলে সাউদের প্রতিপত্তি অর্জিত হলে ইংরেজদের কুনজরে পড়ে তাকে লাঞ্ছিত হয়ে এ অঞ্চল পরিত্যাগ করতে হয়। অতঃপর সে সিরিয়াতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অতঃপর ইংরেজরা তাকে দ্বিতীয় একটি দায়িত্ব দিয়েছিল যা আজ পর্যন্ত তার বংশধররা যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। এই হতভাগা ব্যক্তিটি ইংরেজদের প্রতারণা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও ইংরেজদের কাঠপুতলি হয়ে কাজ করে যেতে সম্মত হয়েছিল এবং তার বংশধররা আজ পর্যন্ত তা করে যাচ্ছে। এবার তাকে ফিলিস্তিনের পূর্ব দিকে অবস্থিত জর্দানের দায়িত্ব গ্রহণ ও সেখানে জায়নবাদীদের স্বার্থ বাস্তবায়নে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অতঃপর এ অঞ্চল থেকে মুসলমানদের কোনো ধরনের সহযোগিতা ও যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে ও তার বংশধররা ফিলিস্তিনের পাশে থেকে ইহুদিদের স্বার্থে সকল ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে।

তারা মুসলমান হয়েও ফিলিস্তিনের চতুপার্শ্বে এমন দুর্গ নির্মাণ করে রেখেছে, যেখানে অসহায় মুসলমানদের কোনো ধরণের সহযোগিতার বিপরীতে অত্যাচারী হিংস্র ইহুদিদের স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক ছেলে ইরাক ও সিরিয়া অন্য ছেলে জর্দানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এদের হাত থেকে ইরাক ও সিরিয়া নিষ্কৃতি পেলেও আজ পর্যন্ত জর্দান এদের অলক্ষুণে হাতে আবদ্ধ রয়েছে।

## অসুস্থ হাঁস

তার ছেলে আবদুল্লাহ বিন হাসান ৩০ বছর (১৯২০-১৯৫০) যাবৎ জর্দানের শাসনকর্তা ছিল। তার শাসনামলেই ইসরাইল প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়; কিন্তু এতে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। অতঃপর শরিফ হুসাইনের পৌত্র তলাল বিন আবদুল্লাহ জর্দানের শাসনভার গ্রহণ করে আর

Scanned by CamScanner

তার শাসনকালে একবছর (১৯৫১-১৯৫২) স্থায়ী হয় এবং মস্তিষ্কজনিত অসুস্থতায় পদত্যাগ করতে হয়। অতঃপর তার প্রপৌত্র হুসাইন বিন তালাল শাসনকার্য পরিচালনা করে; যাকে পৃথিবীবাসী বাদশাহ হুসাইন নামে চিনে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত সে জর্ডানকে ইসরাইলের স্বার্থ সংরক্ষণের কেন্দ্রভূমি বানিয়ে রাখে। তার শাসনামলে ১৯৬৮ ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্মম আক্রমণ চালিয়ে ইসরাইল জর্দানের পশ্চিম তীর দখল করে ইয়াহুদা ও সামেরা নামের দুটি বসতিতে বণ্টন করে। কিন্তু দীর্ঘদিনের এই শাসকের কণ্ঠ থেকে অসুস্থ হাঁসের ফ্যাসফ্যাসে শব্দের প্রতিবাদ ব্যতীত ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

তার শাসনামলেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মাধ্যমে বায়তুল মাকদিস ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করা হয় এবং বায়তুল মাকদিস দখলকল্পে ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার পরিবর্তে শুধু ইসরাইলকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়াই নয়; বরং ইসরাইলের স্বার্থ সংরক্ষণে নিজের দেশে আমেরিকান সৈন্য স্থাপনাও নির্মাণ করে। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথে তার সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের অনুমান সাবেক ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী ইসহাক রবিনের মৃত্যুর পর তার কবরে গিয়ে কান্নাকাটি থেকেই অনুমান করা যায়। অথচ ইহুদি ধর্মমতে ইহুদিদের কবরে মুসলমানদের যাওয়ার অনুমতি নেই। অন্যদিকে যখন সে অসুস্থ হয়ে ছিল, ইহুদিদের উপাসনালয়গুলোতে তার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করানো হয়েছিল।

## টাটকা জখম

সে এতটাই হতভাগা ছিল যে, ইহুদিদের জন্য স্বজাতির ওপর অত্যাচার করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইহুদিদের অত্যাচারে হিজরত করে আসা ৩ হাজার ফিলিস্তিনিকে তার আদেশেই নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। ফিলিস্তিনিরা সেই মাসকে কালো সেপ্টেম্বর হিসেবে স্মরণ করে। জর্দানে অবস্থিত ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে অধিকৃত ফিলিস্তিনে চলমান হামলা ও প্রতিবাদ সে চরমভাবে দমন করেছিল। আর তার এসব সেবার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মৃত্যুর পর পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের পাঁচজন ইহুদি ও বিভিন্ন খ্রিষ্টান শাসকেরা তার জানাজায় শরিক হয়ে অশুভ যাত্রায় রওনা করিয়ে দেয়।

Scanned by CamScanner

ফিলিস্তিনের মুসলমানরা তাকে ঘৃণাভরে স্মরণ করলেও ইসরাইল তার নামে একটি সড়কের নামকরণ করেছে যা জাতির বেইমানদের জাহান্নামের দিকে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানে তার ছেলে আবদুল্লাহ জর্দানের শাসনকার্য পরিচালনা করছে। তার মা ছিল ব্রিটিশ খ্রিষ্টান। বাদশাহ হুসাইনের দুইজন স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে একজন আমেরিকান ইহুদি আরেকজন ব্রিটিশ খ্রিষ্টান। আর এর মাধ্যমেই তার ইহুদি-নাসারাদের সাথে উষ্ণ সম্পর্কের অনুমান করা যায়। বাদশাহ আবদুল্লাহকেও বিশেষভাবে অনৈসলামিক পন্থায় প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। আর সেভাবেই সে তার পিতার অনুকরণে ফিলিস্তিনিদের সাথে এমন আচরণ করে যাচ্ছে, যেন তাদের ক্ষতস্থানগুলো টাটকা থাকে এবং তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা না পায়।

অপেক্ষায় থাকুন, কখন ভাগ্যনিয়ন্ত্রক এই বংশকে তাদের নির্দিষ্ট পরিণামে পৌঁছিয়ে দেয়।

Scanned by CamScanner

# ফিলিস্তিন বিক্রেতাদের গল্প

## ভয়াবহ রহস্যের উদঘাটন

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। জেদ্দায় নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম এডির হাতে 'গোপনীয় গুরুত্বপূর্ণ' শিরোনামের একটি পত্র আসে। সেই চিঠিতে বলা হয় তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট সাউদি বাদশাহ আবদুল আজিজের সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী এবং আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে এর ব্যবস্থাপনা করার আদেশ দেওয়া হয়। এ বৈঠকের স্থান ও সময় সম্পর্কে কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি। দু-দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের এ বৈঠককে বেশ কিছু কারণে এতটাই গোপনীয় রাখা হয় যে, এ বৈঠকের সংবাদ মাত্র পাঁচজন ব্যক্তি জানতে পারেন। বাদশা আবদুল আজিজ, সাউদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আমেরিকান দূতাবাসের টাইপিস্ট, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ও তার স্ত্রী। কূটনৈতিকভাবে এ বৈঠকের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রদূত তার কাজ শুরু করে। কিন্তু ইহুদিদের দোসর একটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের প্রধানের জন্য তখন সাউদি আরবের পবিত্র ভূমিতে পা রাখা বাহ্যদৃষ্টিতে দুঃসাধ্য ছিল। কারণ, তখনো বিলাসিতার চাদরে ঢেকে দিয়ে আরবের সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় আত্মমর্যাদা ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিশেষত আরবের প্রভাবশালী গোত্রসমূহের কাছে এটা মোটেও সহনীয় ছিল না যে, ইসলামের পুণ্যভূমিতে এমন বিধর্মী শাসকের আতিথেয়তা দেওয়া হবে; যাদের কিনা হাজার বছর পূর্বে এখান থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। অন্যদিকে বাদশা আবদুল আজিজ ইতোপূর্বে কোনো বিদেশ সফরে যাননি। এটি ছিল তার বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে প্রথম বৈঠক এবং তার উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বি ব্রিটেনের গোয়েন্দাদের কাছ থেকে এ বৈঠকের তথ্য গোপন রাখা।[৭১] তাই এ বৈঠকের জন্য বিশাল সমুদ্রকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

---

[৭১] যদিও পরবর্তীতে এ দুটি দেশ নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে গিয়ে মিলেমিশে বিভিন্ন দেশকে ধ্বংস করতে একজোট হয়েছে।

Scanned by CamScanner

বাদশাহ আবদুল আজিজ প্রতিবছর একবার জিদ্দায় ভ্রমণে যেতেন। সেই ভ্রমণের সুবাদে সেখানকার নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করতেন এবং দুস্থ-অসহায়দের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এবার তাঁর জেদ্দা সফরের পূর্বে ঘোষণা দেওয়া হলো যে, আমেরিকান রণতরী মিরফি জিদ্দার বন্দরে নোঙ্গর করতে যাচ্ছে। আমেরিকান এই রণতরীর জিদ্দা বন্দরে নোঙ্গর করা যদিও প্রকাশ্যে সাধারণ নিয়মতান্ত্রিক সামুদ্রিক যাত্রা হিসেবে দেখানো হয়েছিল; কিন্তু এর পূর্বে কখনও এ ধরনের মার্কিন রণতরী সাউদি কোনো বন্দরে অবস্থান করেনি। ১২ ফেব্রুয়ারিকে রণতরীর বন্দর ত্যাগের দিন হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয় আর এর পূর্বে; অর্থাৎ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে রণতরীর ক্যাপ্টেন এবং ফার্স্ট অফিসার বাদশা আবদুল আজিজের সাথে সাক্ষাৎ করে উল্লেখিত বৈঠকের যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেদিনই আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জাহাজের কর্মকর্তা ব্যতীত আরও প্রায় ১৪৫ জন সাউদিতে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের সৌজন্যে নৈশভোজের আয়োজন করে। অতঃপর জিদ্দা বন্দর থেকে রণতরীর প্রস্থানের ঘোষণা দেওয়া হয়। অন্যদিকে বাদশাহ আবদুল আজিজ তার দুই ছেলেকে সাথে নিয়ে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। রণতরীর প্রস্থানের দিন শাহি প্রসাদে ঘোষণা দেওয়া হয় যে বাদশা তার ছেলেদের নিয়ে মক্কা মুকাররামার উদ্দেশ্যে রওনা করবেন।

জিদ্দার শাহি প্রসাদ থেকে মক্কা মুকাররামার উদ্দেশ্যে বাদশার গাড়ির কাফেলা এগিয়ে চলে। পথিমধ্যে হঠাৎ কাফেলাকে মক্কা মুকাররামার পরিবর্তে নৌবন্দরের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে বাদশাহ আবদুল আজিজ যুবরাজ সাউদ বিন আবদুল আজিজকে টেলিগ্রাম করে পাঠালেন যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যেন তিনি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। অন্যদিকে তাঁর দ্বিতীয় ছেলে ফয়সালকে ডেকে এনে তাঁর বিদেশ যাওয়ার সংবাদ জানালেন। এবং সফরসঙ্গীদের একটি লিস্ট তার হাতে দিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত হিজাজের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখার আদেশ দেন।[৭২] আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে উপর থেকে নির্দেশ দেওয়া ছিল, যেন বাদশাহের সফরসঙ্গী অত্যন্ত কম রাখা হয়। সে অনুযায়ী বাদশাহের সাথে চারজন সফরসঙ্গী ও আটজন দেহরক্ষীসহ মোট ১২ জনের পরিকল্পনা নেওয়া

---

[৭২] তিনি পরবর্তীকালে বাদশাহ ফয়সাল হয়েছিলেন এবং সাউদি আরবের শাসক হওয়ার পাশাপাশি ইসলামি জগতের একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বও ছিলেন। তার বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কারণে আরব ভূমি দখলের খায়েশ রাখা বিধর্মীরা তাকে শহিদ করে দিয়েছিল।

Scanned by CamScanner

হয়। কিন্তু বাদশাহ যখন সেখানে পৌঁছালেন তাঁর সফরসঙ্গীর সংখ্যা ১৮-তে গিয়ে পৌঁছেছিল। ১০০টি ছাগলসহ প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী রণতরীতে ওঠানোর জন্য একত্রিত করা হয়। বাদশাহর ইচ্ছা ছিল আমেরিকান মেহমানদের ভালোভাবে আপ্যায়ন করানো। কিন্তু রণতরীর ক্যাপ্টেন কমান্ডার কেটিং বাদশাহর প্রতিনিধি অর্থমন্ত্রী শায়খ আবদুল্লাহ সুলায়মানকে জানান যে, রণতরীতে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত মেন্যুতে খাবার পরিবেশন করতে হয়। যার ব্যতিক্রমে কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়। বাদশাহ এ কথা শুনে তা গ্রহণ করলেন এবং শুধু সাতটি ছাগল রনতরীতে ওঠানো হয়।

বাদশাহ আবদুল আজিজ পৌঁছামাত্রই মার্কিন রণতরী সুয়েজখাল অভিমুখে রওনা করে। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ বিকেল সাড়ে চারটা। সূর্য নিজ নিবাসের খুঁজে সমুদ্রের দিগন্তের দিকে ঝুঁকে চলছিল। রণতরীর আরোহীগণ সুন্দর আবহাওয়া উপভোগের পাশাপাশি বিভিন্ন সমরাস্ত্র দেখছিলেন। কারও মনে একবারও উঁকি দেয়নি যে, এ ধরনের সুন্দর ভ্রমণের পরিসমাপ্তি এমন এক চুক্তিপত্রের মাধ্যমে হবে যা ইসলামি বিশ্বকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় কয়েকশ বছর পিছিয়ে নিয়ে যাবে। বাদশাহ সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন তার ভাই যুবরাজ আবদুল্লাহ এবং তার দুই ছেলে যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন আবদুল আজিজ এবং মানসুর বিন আবদুল আজিজ। এতদ্ভিন্ন বাদশাহের সাথে ছিল তার চিকিৎসক, একান্ত পরামর্শদাতা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত মাজিদ বিন হাইকালাহ। তিনি সামুদ্রিক সফরে বাদশাহের এবং সফরসঙ্গীদের নামাজের জন্য কিবলার দিক নির্ণয় করে দিতেন।

এখানে আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, সাউদি শাসকগণ নামাজ, তিলাওয়াত এবং হারামাইনের খেদমত সম্পর্কে যথেষ্ট তৎপর হলেও তারা কেন যেন এ কথা ভুলে যান যে, আল্লাহর সম্মানিত নিদর্শনসমূহের মর্যাদা এসবের রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। আর ইসলামি নিদর্শনাবলির এ ধরনের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর উন্নত থেকে উন্নততর প্রস্তুতি ব্যতীত সম্ভব নয়। এখানে একদিকে রণতরীর বহিরাংশে নামাজ আদায়ের জন্য জ্যোতির্বিদের সহযোগিতায় কিবলা নির্ণয় করা হচ্ছে, অন্যদিকে রণতরীর মিটিংরুমে মুসলমানদের সম্মান-মর্যাদা, প্রতিপত্তিকে কাফিরদের হাতে নিলামে তোলার ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে।

লোহিত সাগরের বুকে এই মনোমুগ্ধকর জাহাজ-ভ্রমণ দুইদিন একরাত চলছিল। জেদ্দা থেকে এই রণতরী যখন রওনা হচ্ছিল, ঠিক তখনই মাল্টার

Scanned by CamScanner

বন্দর থেকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় নির্মিত কুইন্সি নামক আরেকটি রণতরী আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে নিয়ে সফর শুরু করে। একদিকে বাদশাহ আবদুল আজিজকে বহনকারী মার্কিন রণতরী মিরফিতে বাদশাহর পক্ষ থেকে মার্কিন অফিসারদের মেহমানদারির আয়োজন করা হয়েছিল। মৃদুমন্দ আবহাওয়ায় এরাবিয়ান স্টাইলে মেহমানদারি জমে উঠেছিল। এরাবিয়ান দস্তরখানে খাবারের মজা নেওয়ার পাশাপাশি সবাই গল্পে মেতে উঠেছিল। বিশেষ বাবুর্চিগণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টাইলের আরবি খাবার পরিবেশিত হচ্ছিল, যা মেহমানদের জন্য অত্যন্ত উপাদেয় ছিল।

অপরদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বহনকারী রণতরীর দেয়ালে শোভা পাচ্ছিল মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র। মার্কিন রাষ্ট্রপতির টেবিলে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফাইল শোভা পাচ্ছিল। আর সে পরিকল্পিত ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাউদি বাদশার সাথে আলোচনার খসড়া নিয়ে উপস্থিতদের সাথে আলোচনা সেরে নিচ্ছিল। উভয় দলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কর্মপদ্ধতি তখন যা ছিল আজও প্রায় তেমনটি রয়েছে। একদল সম্পূর্ণ অবহেলা ও বিনোদনের জগতে ডুবে ছিল, যেখানে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ কর্মব্যস্ততা ও চৌকস থেকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পায়তারা করছিল। আর এ ধরনের অবহেলাপূর্ণ মনোভাবই শেষ পর্যন্ত মুসলমান জাতিকে রক্তের অশ্রু প্রবাহিত করতে বাধ্য করেছে। আজ তো অবস্থা এমন যে মুসলমানদের কাছে প্রবাহিত করার জন্য অশ্রুও নেই রক্তবিন্দুও নেই।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ সকাল ১০টা। রণতরী মিরফি এবং রণতরী কুইন্সি নির্ধারিত সময়ে পাশাপাশি অবস্থানে দাঁড়িয়েছিল। সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তার স্বার্থে উভয় রণতরীর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ায়। অস্থায়ী ব্রিজের সাহায্যে রণতরীকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। মহামান্য বাদশা তার উভয় পুত্রকে সাথে নিয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার রণতরীতে তাশরিফ নিয়ে যান। দীর্ঘ ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট যাবৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বৈঠক চলছিল। অতি গোপনীয় এ বৈঠকে কিছু কিছু এজেন্ডা এখন জনসম্মুখে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্য গবেষকদের কেউ কেউ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এর কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। যদি সেই বৈঠকের যাবতীয় সিদ্ধান্তকে একটি বাক্যে প্রকাশ করতে হয়, তাহলে তা হবে নিম্নরূপ :

Scanned by CamScanner

ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাউদি বাদশাহকে আয়ত্তে আনা, সাউদি আরবের আল্লাহ প্রদত্ত খনিজ পদার্থসমূহকে লুণ্ঠন করা এবং এর বিনিময়ে আরবদের অর্জনকৃত মুদ্রাকে তাদের সামরিক শক্তিতে খরচ না করতে গিয়ে বিনোদনের কাজে খরচ করানো।

সব মিলিয়ে পাঁচ ঘণ্টা সেই রণতরীতে অবস্থান করে বাদশাহ আবদুল আজিজ যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বখশিশ বিতরণ করেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একটি করে ঘড়ি এবং সাধারণ কর্মচারীদের জন্য ১৫ পাউন্ড করে দেওয়া হয়। এটি ছিল আরবদের বংশগত দানশীলতা ও মেহমানদারির বহিঃপ্রকাশ। যদিও অভিশপ্ত ইহুদিদের কাছে এর কোনো মূল্য ছিল না। অতঃপর আমেরিকান প্রতিনিধি উইলিয়াম এডি ও সাউদি প্রতিনিধি ইউসুফ ইয়াসিন সম্মিলিতভাবে একটি বক্তব্য প্রস্তুত করেন। এদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী রণতরী যখন সুয়েজ অতিক্রম করে পোর্ট সাইদ ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন ব্রিটিশ গোয়েন্দারা এই বৈঠক সম্পর্কে জানতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইহুদিদের নিন্দিত সংগঠন ফ্রি মিশনের কায়রো অবস্থিত হেডকোয়ার্টারে বিজয় পার্টি উদযাপিত হচ্ছিল। জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পৌঁছতে পারায় ইহুদি গুরুদের আনন্দের সীমা ছিল না।

১৯৪৫ সালে এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর তার ঠিক দুই বছর পর ১৯৪৮ সালে পৃথিবীর বুকে অতীতের ৩ হাজার বছরের ইতিহাসকে চমকে দিয়ে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অবাক বিশ্ব প্রত্যক্ষ করল কীভাবে একটি অভিশপ্ত জাতি শেষ পর্যন্ত একটি রাষ্ট্র অর্জন করতে সক্ষম হয়। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? কুরআনে কারিমে যেখানে বলা হয়েছে—'কিন্তু আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বা কোনো মানুষের সাহায্য নিয়ে'[৭৩] ইহুদিরা কতটা বিনয়ী হয়ে অহংকার ও উগ্রতা পরিহার করে পৃথিবীর শক্তিসমূহের গতিপথ অনুমান করে তাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। অনুনয়-বিনয় হতে শুরু করে[৭৪] সব পন্থা প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত সকল শক্তিকে নিজেদের ইচ্ছার অনুকূলে নিতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে মুসলমানরা পারস্পরিক বিরোধের পাশাপাশি বস্তুবাদের অন্ধগলিতে হারিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। সামরিক শক্তি অর্জনে

---

[৭৩] সুরা আলে ইমরান : আয়াত-১১২।

[৭৪] চরমপন্থা পর্যন্ত।

Scanned by CamScanner

অবহেলাকে নিজেদের ঐতিহ্যে পরিণত করে। সৈন্য চৌকিতে অস্ত্রের যোগান সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে বেডরুমে ফার্নিচার ও বাথরুমে টাইলস লাগানোয় মনোনিবেশ করছে। আর এভাবেই তারা নিজেদের ভাগ্যে ওই অভিশাপ নিয়ে নিয়েছে যা মূলত ইহুদিদের নিয়তি ছিল।

শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছিল তা হলো—সাউদি আরব ফিলিস্তিন-লাগোয়া নিজেদের সীমান্ত সরিয়ে নেয়, যেন ফিলিস্তিন আর তাদের প্রতিবেশীই না থাকে। যেন কেউ সাউদি আরব থেকে ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করতে না পারে। ফিলিস্তিনিরাও যেন শরণার্থী হয়ে মহামান্য আল্লাহর প্রতিনিধির আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আসতে না পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে অতীতে কখনো এমন হয়নি যে, কোনো দেশ গোপনে নিজের অংশকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যের হাতে অর্পণ করেছে। কিন্তু বীরের জাতি সাউদি শাসকগণ এই মহান কার্যটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন—তারা ফিলিস্তিনের লাগোয়া বর্ডার অঞ্চলকে জর্ডানের হাতে অর্পণ করে পিছনে এসেছিলেন। যেন আর কোনো মুসলমান আত্মমর্যাদাবোধহেতু ইহুদিদের বিরুদ্ধে মাথাছাড়া দিয়ে না উঠে। আবার প্রতিবেশী অঞ্চলে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহযোগিতার বদনামও যেন সাউদি বাদশাদের সাদা পোশাকে কলঙ্কের তিলক এঁকে না দেয়।

ফিরতি পথে মহামান্য সাউদি শাহের জিদ্দা নৌবন্দর অতিক্রম করার অনতিবিলম্বেই মামলাকাতুল আরাবিয়া আস সাউদিয়ার মানচিত্র পরিবর্তন হয়ে যায়। এবং তাবুকের পরবর্তী সীমান্ত-লাগোয়া ভূখণ্ড মামলাকাতুল হাশিমিয়া জর্দানের হাতে অর্পণ করা হয়, যার শাসক ছিলেন নজীবুততরফাইন হাশিমি।

জাজিরাতুল আরবের এই অন্ধকার উপাখ্যানকে সামনে আনতে কেউ কেউ নিষেধ করেন। কারণ, এতে সাউদি শাসকদের মর্যাদাহানি হয়। আমার কথা হচ্ছে, শুধু বাস্তবতা বলার অপরাধেই তো আমি অপরাধী। ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিদের ইচ্ছা; উনাদের ব্যাপারগুলো যেভাবে ইচ্ছা নিতে পারেন। যেভাবে ভাবতে চান ভাবতে পারেন। হীরকখণ্ডকে যদি যথোপযুক্ত স্থানে না রেখে কেউ গিলে ফেলে তা বিষেই রূপান্তরিত হয়। এসব আলোচনায় ও মতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভিন্ন কারণে অন্য কিছু আসলে আমাদের তার জন্য দুআ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

Scanned by CamScanner

# চক্রান্তের শুরু

## নতুন জেরুসালেমের সন্ধানে

আমেরিকায় ইহুদি সভ্যতা ক্রিস্টোফার কলম্বাসের হাত ধরে আরম্ভ হয়। গ্রানাডায় মুসলমানদের পতনের ইঙ্গিত ইহুদিরা পূর্বেই পেয়েছিল তারা এটাও অনুভব করেছিল যে মুসলিম সাম্রাজ্যের ছায়া কোনোভাবে তাদের উপর থেকে সরে গেলে খ্রিষ্টানরা তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

প্রসিদ্ধ ইহুদি শিল্প উদ্যোক্তা ও লেখক হেনরি ফোর্ড *'দ্য ইন্টারন্যাশনাল জিউ' (The International Jew)* বইতে লেখেন—

> *'কলম্বাসের পরিকল্পনার সংবাদ পেয়ে ইহুদিরা তার সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে এবং তার আমেরিকা আবিষ্কারের সফরে একদল ইহুদিও সঙ্গী হয়।'*

স্পেনের প্রসিদ্ধ ইহুদি বিদ্বান এবং কবি 'জুধা হেলভি' (Judah Halevi) অভিশপ্ত ও ঘৃণিত ইহুদিদের জন্য নিজের ভ্রষ্ট গবেষণার মাধ্যমে নিজ ধর্মের উপকার ও প্রার্থিব লাভের জন্য স্বীয় ধর্মকে গোপন করার বৈধতা প্রমাণ করে। আর এভাবেই ইহুদিদের জন্য নিজেদের লাভের উদ্দ্যেশ্যে পরম শত্রুর সাথে আঁতাত করাও সহজ হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওরা কোনো ধর্মের অনুসারীদের চেয়েও বেশি নিজেদের সে ধর্মের অনুসারীরূপে প্রকাশ করে। এবং তাদের ধর্মের অনুকরণ করতে শুরু করে। আর এভাবেই তারা অল্পসময়ে কলম্বাসের সাথে অন্তরঙ্গতা তৈরি করে নেয়। বিশাল সাগরের অপর পাড়ের নতুন পৃথিবীকেই তারা নিজেদের মুক্তির স্থান হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করে। কেননা, অজেয় সমুদ্রের এপাড়ের সব জায়গা থেকেই তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য ধিক্কার খেয়ে বিতাড়িত হয়ে সমুদ্র উপকূলে এসে থেমেছিল।'

Scanned by CamScanner

গ্রানাডা পতনের পর মুসলমানদের নৌবহরের কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার আগ্রহের ব্যাপারে ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রমাণাদি পাওয়া যায়। একেতো এই জন্য যে, এই অভিশপ্তদের সামুদ্রিক সফরের খরচাদির ক্ষেত্রে ওদের সুদি কারবারে ফেঁপে উঠা অর্থসম্পদ ব্যবহারের সুযোগ ছিল।[৭৫] অন্যদিকে আমেরিকায় পৌছার পর কলম্বাসের প্রথম চিঠিটি এক ইহুদির নামেই এসেছিল, যে কিনা সেই সফরের ব্যয় নির্বাহের জন্য কয়েক হাজার পাউন্ড খরচ করেছিল। শুধু তাই নয়, লুই ডেটরস নামী যে ব্যক্তি নতুন দুনিয়াখ্যাত আমেরিকার তীরে প্রথম অবতরণ করেছিল, সে ছিল একজন ইহুদি। সে-ই সর্বপ্রথম তামাকের ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হয়েছিল আর তাকেই বিশ্বব্যাপী তামাক ব্যবসার জনক বলা হয় আর তার কারণেই এখন পৃথিবীব্যাপী তামাকের যাবতীয় ব্যবসা ইহুদিদের আয়ত্তাধীন।

এখানে এসে প্রথমেই ইহুদিরা কিউবা ও ব্রাজিলে অবস্থান করলেও ধীরে ধীরে নিজের কুকীর্তির কারণে ধিকৃত হয়ে নিউ ইয়র্কের দিকে চলে যায়; যা ছিল উত্তর আমেরিকার বাণিজ্যিক দরজা। তখন নিউ ইয়র্ক ডাচ কলোনি ছিল। স্থানীয় জনগণ এদের উপস্থিতিকে ভালোভাবে না নিলেও অর্থনৈতিকভাবে এদের বিভিন্ন প্রবৃদ্ধি তাদের আকর্ষিত করে ডাচ গভর্নর 'পিটার স্টাইভেস্যান্ট' (Peter Stuyvesant) এদের সরকারি চাকরিতে যোগদান না করার শর্তে এখানে বসবাসের অনুমতি দেয়। হয়তো সে কল্পনাও করতে পারেনি, আজ যাদের সরকারি চাকরিতে যোগদান না করার শর্তারোপ করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে এরাই নিজেদের কৌশলের মাধ্যমে শহরের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পরিচালক হবে।

সারকথা, এরা আমেরিকাকে প্রতিশ্রুত ভূমি হিসেবে প্রচার করে এবং নিউ ইয়র্ককে নতুন জেরুসালেম হিসেবে উপস্থাপন করে এখানে ইহুদিদের বসতি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। আর এভাবেই নিউ ইয়র্ক ইহুদিদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। তারা এই শহরে ভূমির মালিকানা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। সেখানে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে কর্তৃত্ব অর্জন করতে আরম্ভ করে আর এ উদ্দেশ্যে 'খেলা' নামে একটি সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়।

---

[৭৫] রানি ইসাবেলার অলংকারাদি বিক্রি করে এই সফরের ব্যয় নির্বাহের গল্প শুধুই গুজব।

Scanned by CamScanner

# আশার আলো

'খেলা' নামক সংগঠনটির আলোচনার পূর্বে ইতিহাসের নির্মম প্রতিশোধের কিছু আলোচনা করা যায়। মুসলমানদের আবিষ্কৃত নতুন ভূখণ্ডকে কলম্বাস নিজের আবিষ্কার হিসেবে দেখাতে সক্ষম হলেও এ ভূমিকে নিজের নাম অনুযায়ী কলম্বাস উপমহাদেশ অথবা 'ইউনাইটেড স্টেইট অব কলম্বাস' হিসেবে নামাঙ্কিত করতে পারেনি। মুসলমানদের এত বড় আবিষ্কারকে নিজের নামে চালিয়ে দিলেও এই ভূখণ্ডকে নিজের নামে নামকরণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। বাস্তবতা ছিল এমন যে, স্পেনে মুসলিম শাসনের পতনের পর স্পেনের তৎকালীন লোভী শাসকেরা ভারতের সামুদ্রিক রাস্তা আবিষ্কারের জন্য দুটি দল প্রেরণ করে। তন্মধ্যে একটি ছিল ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে। এ দলটি যখন দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ প্রান্তে পৌঁছায়, সেখান থেকে সমুদ্রের গতিপথ ভিন্ন দিকে যেতে দেখে। তারা আশাবাদী হয়ে ওঠে যে হয়তো সমুদ্রের এই বাঁকটি ভারতের দিকেই গিয়েছে। তাই তারা সেই বাক্যটিকে 'ক্যাইপ অব গুড হোপ' (Cape of Good Hope); আরবিতে رأس الرجاء الصالح তথা 'আশার আলোর বাঁক' বলে নামকরণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার এ প্রান্তটি পৃথিবীর ভূভাগের শেষপ্রান্ত। সেখান থেকে উত্তরমেরু পর্যন্ত শুধু পানি আর পানি। এটি ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মিলনকেন্দ্র হওয়ায় সবসময় ভয়ংকর সামুদ্রিক ঢেউয়ে উন্মত্ত থাকে।

ইতিপূর্বে স্পেনের নাবিকরা সেনেগাল, ঘানা, গাম্বিয়া ও সিয়েরা লিওনসহ আফ্রিকার পশ্চিম তীরবর্তী দেশগুলো পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এই প্রথমবারের মতো এ পর্যন্ত আসতে পারলেও তারা এরচে সামনে আর এগোতে পারেনি। প্রসিদ্ধি রয়েছে যে সমুদ্রে ভয়ংকর অবস্থা দেখে তারা পিছনে ফিরে যেতে চায় এবং ভাস্কো দা-গামাকে এ ব্যাপারে বারংবার অনুরোধ করতে থাকে। এমনকি ভাস্কো দা-গামা তাদের মতের সাথে একাত্ম না হওয়ায় তাকে হত্যার হুমকিও দেয়।

ভাস্কো দা-গামা অনেক বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিল। সে তাৎক্ষণিক সবার সামনে সামুদ্রিক মানচিত্রটি ছিঁড়ে ফেলে এবং বলে, 'এখন ফিরে যাওয়ার রাস্তা শুধু আমি জানি। তোমরা আমাকে হত্যা করে ফেললে কখনো ফিরে যেতে পারবে না।' এভাবেই সে পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত অতিক্রম করে মোজাম্বিক চ্যানেল হয়ে মোজাম্বিকে গিয়ে পৌঁছায়। সেখান থেকে নতুন করে

Scanned by CamScanner

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও জাহাজের মেরামত করে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের নৌবন্দর কালিকোট গিয়ে পৌঁছায়।

এই প্রথমবারের মতো ভারতের বুকে উপনিবেশবাদীদের পায়ের ছাপ পড়ে। এরপর ধীরে ধীরে ওলন্দাজ, ফ্রান্স ও ইংরেজরা ভারতের বুকে নিজেদের পায়ের ছাপ আঁকতে সক্ষম হয়।

## আমেরিগো থেকে আমেরিকা

কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রার গল্পও হয়তো শুনেছেন। সে-ও ভারত উপমহাদেশের সামুদ্রিক রাস্তা আবিষ্কারের জন্য রওনা হয়েছিল। সে বাহামা এবং সালভাদর দ্বীপপুঞ্জের পাশে পৌঁছে এগুলোকে পশ্চিম ভারতের দ্বীপপুঞ্জ হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করেছিল। তার ধারণা ছিল, হয়তো এই দ্বীপপুঞ্জের পরেই ভারত উপমহাদেশ আরম্ভ হয়েছে। তার এই ভুল চিন্তা থেকেই এই দ্বীপগুলো 'ভারতের দ্বীপ' নামে নামাঙ্কিত হয় এবং আজ পর্যন্ত এ নামেই চেনা হয়। কিন্তু যে আমেরিকাকে সে নিজের আবিস্কার বলে দাবি করে, তা-ও তার নামে নামাঙ্কিত হয়নি। এই উপদ্বীপগুলোকে ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনের মধ্যে পৃথকীকরণের জন্য পশ্চিম ভারত উপদ্বীপ এবং ইন্দোনেশিয়াকে পূর্ব ভারত উপদ্বীপ হিসেবে পরিচিত করানো হয়।

কলম্বাসের আমেরিকায় পৌঁছার পাঁচ বছর পর ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'আমেরিগো ভেসপুচি' (Amerigo Vespucci) নামক একজন ইতালিয়ান সমুদ্রবিদ ও নাবিক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। সে একাধারে একজন সাহিত্যিক ও লেখক ছিল। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সে আমেরিকার ভৌগোলিক অবস্থাসহ একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখে। গুরুত্বপূর্ণ সেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি আমেরিকাতে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান ভূগোলতত্ত্ববিদ মার্টিন ওয়াল্ডসিমুলার (Martin Waldseemuller) নিজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *কজমোগ্রাফায় ইনট্রোডাকটিও (Cosmographiae Introductio)*-এ 'আমেরিগোর' নামানুসারে পৃথিবীবাসীর কাছে 'আমেরিকা'কে পরিচয় করিয়ে দেয়।

তার মতে, যেহেতু আমেরিকা নামক বিশাল ভূখণ্ডকে আমেরিগোই পৃথিবীর কাছে পরিচিত করে তুলেছিল, তাই তার নামেই এ অঞ্চলটি নামাঙ্কিত হওয়া উচিত। তাই এশিয়া ও ইউরোপের স্ত্রীবাচক নামের বিপরীতে 'আমেরিগো'-এর নামানুসারে 'আমেরিকা' নামাঙ্কিত হয়। প্রফেসর মার্টিনের এই নামাঙ্কনকে

Scanned by CamScanner

ইউরোপবাসী গ্রহণ করায় কলম্বাস উপমহাদেশের পরিবর্তে এই স্থানটি 'আমেরিকা উপমহাদেশ' নামে পরিচিতি লাভ করে। কলম্বাস মুসলমানদের আবিষ্কারকে জবরদখল করেও খুব একটা লাভবান হয়। যার ফলে সে আমেরিকাকে নিজের নামে করার সুযোগ হারানোর পাশাপাশি ট্রপিকাল আফ্রিকান অঞ্চলকেও নিজের নামে নামাঙ্কিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ইতিহাসের চরম প্রতিশোধের এই উপাখ্যানের পর আমরা 'খেলা' নামক সংগঠনের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

## পৃথিবীর বারোটি অংশ

'খেলা' (Khela) শব্দটির অর্থ হচ্ছে সরকার। এটি ইহুদিদের একটি আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন। এখানে যে যত বেশি গোপনীয় সে তত বেশি শক্তিশালী। নিউ ইয়র্কের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এর ভূমিকা এত বেশি যে, আপনি এককথায় বলতে পারেন, নিউ ইয়র্কবাসী অঘোষিতভাবে এই প্রোগ্রামের আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। আর এই প্রোগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, ইহুদি ও ইহুদিবাদের স্বার্থ সংরক্ষণ। এটি মূলত একটি সংগঠন নয়; বরং একটি গোপন সরকার। যার প্রতিটি শব্দই আইন হিসেবে গণ্য হয় এবং যার প্রতিটি কর্মকাণ্ড ইহুদিদের অগ্রগতি ও ইহুদিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়।

আমেরিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে বসেই এই সংগঠনটি আমেরিকান নীতিনির্ধারণে এতটাই ভূমিকা রাখে, যার ব্যাপারে গভীর তত্ত্বানুসন্ধানীরা আশ্চর্যান্বিত হয়। আমেরিকান জীবনব্যবস্থা, আমেরিকান নীতিনির্ধারণ ও রাজনীতিতে এই সংগঠনটি এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে, যা পরিপূর্ণভাবে ইহুদি স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলে। আমেরিকান জীবনব্যবস্থায় তার নিজের একক সত্তাবোধ কোনোভাবেই বাকি থাকেনি।

ইহুদি নীতিনির্ধারকরা নিউ ইয়র্ককে মোট ১২টি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের তত্ত্বাবধায়নে একজন করে ইহুদিকে নিযুক্ত করেছে।[৭৬] আমেরিকার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর পুরো পৃথিবীকে তারা ১২ জন ইহুদির নেতৃত্বে ১২টি ভাগে বিভক্ত করে এবং নিউ ইয়র্ককে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু

[৭৬] যেমন : হজরত মুসা আ.-এর যুগে বনি ইসরাইল মোট ১২টি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি ভাইয়ের নেতৃত্বে একটি করে ভাগ নির্ধারিত ছিল।

Scanned by CamScanner

হিসেবে ইহুদিদের রাজধানী হিসেবে গণ্য করে। সচেতন মার্কিনীরা পর্যন্ত এ তথ্য জানে না যে, তাদের দেশের রাজধানী 'ওয়াশিংটন ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া' ওয়াশিংটন ডিসি হলেও তাদের দেশের একদল লোক নিউ ইয়র্ককে তাদের রাজধানী মনে করে। এবং তাদেরই পৃথিবীব্যাপী সমর্থকরা নিউ ইয়র্ককে[৭৭] এতটাই সম্মানিত মনে করে, যেমনটা ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা ভ্যাটিকেন সিটিকে এবং মুসলমানরা মক্কা মুআজ্জামাকে করে থাকে। 'রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্র' যদিও একটি প্রসিদ্ধ পরিভাষা; কিন্তু যার বাস্তব নমুনা হতে পারে এই নিউ ইয়র্ক সিটিটি। যা রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্রের একটি পূর্ণাঙ্গ উপমা; বরং বিশ্ব রাজনীতির ছোট্ট নমুনা।

'খেলা' শব্দটির অর্থ সরকার। ইহুদিরা নিজেদের এই আন্ডারগ্রাউন্ড সরকার তথা শক্তিশালী সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই শব্দের অর্থকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইহুদিদের এই শাসনব্যবস্থাটি মূলত 'আন্ডারগ্রাউন্ড রিভার'-এর মতো। গবেষকগণ এটিকে ইহুদিদের শক্তিশালী সংগঠন 'জিনজরি' (ZINJRY) এর শক্তিশালী অঙ্গ মনে করেন। 'জিনজরি' শব্দটি আন্তর্জাতিক ইহুদি সংগঠন 'জায়নিস্ট ইন্টারন্যাশনাল জুরি' (Zionist International Jewry)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইহুদি মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত এমন একটি সংগঠন, যা পৃথিবীর হাজারও ইহুদি সংগঠনকে পরিচালিত করে থাকে।

## মুসলমান নেতাদের ইহুদি স্ত্রী

এখানে এসে পাঠকদের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে; অভিশপ্ত, বিতাড়িত ইহুদিদের এত শক্তি কীভাবে অর্জিত হলো—তারা পরাশক্তিসমূহকে নিজেদের আয়ত্বে নিতে সক্ষম হয়? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের ওই নিরেট সত্য কিতাবের মুখোমুখি হতে হবে, যা আমাদের সাথে প্রভুর সম্পর্ক তৈরির দুটি মাধ্যমের প্রথম মাধ্যম। যার মাধ্যমে বস্তুজগতের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। মহান আল্লাহ কুরআনে কারিমে ইহুদিদের অভিশপ্ত হওয়ার যে কারণগুলো উল্লেখ করেছিলেন, হতে পারে কয়েক শতক ধরে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে সেসব ভ্রান্তিগুলোকে তারা অনেকাংশে কাটিয়ে তুলেছে।

---

[৭৭] যাকে ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে জেরুসালেম নামে পরিচিত করা হয়েছিল।

Scanned by CamScanner

দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, তাদের অভিশপ্ততার সেই কারণগুলোকেই মুসলমানরা রপ্ত করে নিয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীপৃষ্ঠে উল্টো ফলাফল সামনে আসছে। যেমন, তাদের অভিশপ্ততার একটি কারণ ছিল, ইহুদিদের মধ্যে একতার অভাব। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর সকল ইহুদিরা একাত্ম এবং তাদের সংগঠনগুলো একত্রিতভাবে নিজেদের লক্ষ্য পূরণে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। যদিও বাহ্যত তাদের নিজেদের মধ্যে কখনো সম্পর্কহীনতা দেখা যায়; কিন্তু ইহুদি না—এমন জাতিগুলোর প্রতি তাদের বিদ্বেষ এবং বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক ঐক্য সর্বদাই অটুট। সর্বোপরি ইহুদিদের সর্বোচ্চ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ একটি মূলনীতি তৈরি করেছেন, যেটা ইহুদিদের নিজেদের মধ্যে বা জাতীয়ভাবে কোনো ধরনের বিতর্ক বা দ্বন্ধ দেখা গেলে সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শক্তি খর্ব করা থেকে বাঁচাবেন। মুসলমানদের মধ্যে কি এ ধরনের কোনো সংগঠন আছে—যা তাদের পারস্পরিক বিতর্কগুলো থেকে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে? কুরআনে কারিমে ইহুদিদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছিল—তাদের বাহ্যিকভাবে একতাবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেলেও আন্তরিকতার দিক থেকে তাদের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান থাকবে।

এ বিষয়টা কি আজকাল মুসলমানদের মধ্যে প্রতীয়মান হয় না? যদি তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান না করতে পারে, তাহলে উভয় পক্ষ মিলে তৃতীয় কোনো ইহুদি বিদ্বান ব্যক্তিকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করে তার সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। যেমন, আনোয়ার সাদাতের ইহুদি স্ত্রী জাহান সাদাতকে তৎকালীন ইহুদিদের দুটি দলের পারস্পরিক দ্বন্ধের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।[৭৮]

## তুর পাহাড়ে সম্মিলিত কান্নাকাটি

ইহুদিদের পশ্চাৎপদ হওয়া ও অভিশপ্ততার আরেকটি কারণ হিসেবে কুরআনে কারিমে তাদের কৃপণতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ইহুদিরা নিজেদের সামগ্রিক কাজগুলোর ক্ষেত্রে খরচ করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকে। এমনকি তাদের সংগঠনগুলো কখনো আর্থিক সংকটে ভোগে না। অথচ এ

---

[৭৮] মুসলমানদের ইহুদি স্ত্রী; যেমন ইয়াসির আরাফাত, শাহ হুসাইন এবং ইমরান খান তাদের স্ত্রীদের ইতিহাস এবং কর্মকাণ্ড পর্যালোচনায় জন্য আলাদা একটি রচনা প্রয়োজন। আমাদের গবেষকগণ যদি নিরপেক্ষভাবে এর উপর গবেষণা করেন, তাহলে ভয়ংকর বিভিন্ন তথ্য সামনে চলে আসবে।

Scanned by CamScanner

ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সবচে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকে তাদের অর্থসংস্থানের খাতগুলো।

ইহুদিদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের লাঞ্ছনার আরেকটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছিল তাদের কাপুরুষতা। তাদের মধ্যে কাপরুষতা আজও বিদ্যমান; কিন্তু তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখুন, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির হাতে শতকের পর শতক ধরে লাঞ্ছিত হওয়ার পরেও তারা আজ নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। লাঞ্ছনার এত দীর্ঘসময় পার করেও তারা মানসিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেনি। তারা তাদের লক্ষ্যকে এতটাই স্পষ্ট এবং নির্ধারিত রেখেছে যে, যেকোনো ধরনের বিপদ-আপদের পরই আবার সে দিকপানে ছুটে চলতে সচেষ্ট হয়েছে।

হে আমার জাতি, আমাদের কি এ অবস্থা হতে পারত না? আমরা কি ইহুদিদের কাছ থেকেও সুদৃঢ় লক্ষ্যের প্রতি এভাবে ছুটে চলা শিখতে পারি না?

তাদের অভিশপ্ততার আরেকটি কারণ এটি উল্লেখ করা ছিল যে, তারা নবি-রাসুলদের সাথে বেআদবি করতো; আবার নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র এমনকি আল্লাহর সন্তান ধারণা করতো। কুরআনে কারিমে তাদের আল্লাহ প্রদত্ত এই অভিশপ্ততা থেকে বের হওয়ার পদ্ধতি الا بحبل من الله। 'কিন্তু আল্লাহর সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক'-কে বলা হয়েছে। নিজেদের অন্যায় কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হওয়া, অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আর কী হতে পারে।[৭৯]

বর্তমানে 'দেয়ালে বোরাক' ও সিনাই মরুভূমিতে 'তুর পাহাড়ে' ইহুদিদের সম্মিলিত আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি দেখলে যে কেউই চমকে যেতে পারে। অন্যদিকে 'শবে কদরে' মুসলমানদের অবহেলা দেখলে যে কেউই দুঃখ অনুভব করবে।

## চিরস্থায়ী শত্রুতা-তত্ত্ব

পাঠক ভাবতে পারেন ইহুদিদের এত আলোচনা ও বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? এর উত্তরে কুরআনে কারিমের সেই আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়,

---

[৭৯] এই আয়াতাংশের উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে এই অর্থটি প্রতীয়মান হয়। জিজিয়া আদায়ে সম্মত হওয়া—এই ব্যাখ্যাটি ততটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কেননা, এই আয়াতে তাদের লাঞ্ছনা, মুক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর 'জিজিয়া কর' নিকৃষ্টতম লাঞ্ছনাগুলোর একটি। এ ব্যাপারে জ্ঞানীদের মতামত কাম্য।

Scanned by CamScanner

যেখানে বলা হয়েছে যে, দুটি জাতির সাথে মুসলমানদের চিরস্থায়ী শত্রুতা বিরাজমান থাকবে।[৮০] আর সেই দুটি জাতি হচ্ছে ইহুদি এবং হিন্দু। এই দুটি জাতির সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ একটি ঐশ্বরিক নিয়তি। যাকে আপনি তৃতীয় বা সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধও বলতে পারেন। আর এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যোদ্ধাদের ব্যাপারে হাদিসে বিভিন্ন ধরনের সুসংবাদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই সচেতনতার সাথে মুসলমানদের সর্বদা এদের কর্মকাণ্ড এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত থাকা আবশ্যক।

দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে ইহুদিরা এতবার বিতাড়িত হওয়ার পরেও নিজেদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে মুসলমানদের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। ইহুদিরা তো মিথ্যা মাসিহের স্বপ্নে তার আগমনের জন্য কল্পিত শর্তগুলো পূরণ করে তাঁর আগমনের অপেক্ষা করছে। যদিও দাজ্জালের মতো নিয়তিই তাদের বরণ করতে হবে। অথচ সত্যিকার মাসিহ হজরত ইসা আ.-এর আগমনে তার সহযোদ্ধা হওয়ার মানসে নিজেদের কৃতকর্মের উন্নতি এবং মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি থেকে মুসলমানরা অচেতন।[৮১] অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মহান আল্লাহ অন্য কোনো জাতিকে মুসলমান বানিয়ে তার প্রিয় বান্দাদের সহচর হিসেবে কবুল করে নেবেন আর আমরা হয়তো তখন তাকিয়েই থাকব।

'আর যদি তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করো, তাহলে অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করা হবে; যারা তোমাদের মতো হবে না।'[৮২]

---

[৮০] সুরা মায়েদাহ : ৮২।

[৮১] যার হাতে সকল খ্রিষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে; এমনকি ইয়াহুদিদের মধ্যেও যারা দাজ্জালের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে ইসলাম আনয়ন করবে।

[৮২] হে ইমানদাররা, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজ দীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ অন্য জাতিকে সৃষ্টি করবেন; যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ; যা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সুরা মায়িদা : ৫৪)

Scanned by CamScanner

# রোম থেকে তেলআবিব

অনেককেই এ মন্তব্য করতে দেখা যায় যে, ইসলামি দেশগুলোর বিরুদ্ধে আমেরিকার পরিচালিত সামরিক অভিযানগুলো ধর্মীয় কারণে নয়। ইসলামের সাথে তাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই; বরং তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করা। এ ধরনের ধন-সম্পদ যদি হিন্দু বা বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশগুলোর কাছেও থাকে, তাদের বিরুদ্ধেও আমেরিকা এ ধরনের যুদ্ধ পরিচালনা করবে। তাই মার্কিন আগ্রাসনকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা একধরনের উগ্রপন্থা।

এই মতের প্রবক্তাদের কাছে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীদের একটি নোংরা প্রতিমূর্তি মাত্র। এর বাইরে মার্কিনীদের ব্যাপারে অন্য কোনো ধারণা রাখা এদের মতে ঠিক নয়। তাদের সামনে আমরা রোমে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারের এজেন্ডাগুলো তুলে ধরছি; যা ১০ মে ২০০৩ সালের বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ মতের প্রবক্তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে এ ধরনের মতামত ব্যক্ত না করে অনুগ্রহপূর্বক নিজেদের ও মুসলমানদের স্বার্থে কিছু করা শুরু করুন। সামগ্রিক সাংগঠনিক শক্তি অর্জন ব্যতীত শুধু গবেষণা এবং সুন্দর আলোচনা যেন মুসলিম জাতিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত না করে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, আমাদের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা এতটাই বেড়ে গিয়েছে, আমাদের একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই ভেবে আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন যে, 'আর যাইহোক, আমেরিকার সাথে আমাদের ধর্মীয় কোনো দ্বন্দ্ব নেই।' এর বিপরীতে অন্য একটি দলকে দেখা যায়, যারা হজরত মাহদির আগমনের ঔৎসুক্যতার সাথে অপেক্ষা করছেন। বিভিন্ন কিতাবাদি থেকে হজরত মাহদির আগমনের আলামতসমূহ আলোচনা করা এবং তাঁর আগমনের আনুমানিক সময় নির্ধারণ করাই তাদের গবেষণার বিষয়। অবস্থা এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, কখনো যদি হজের সময় কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিজেকে মাহদি বলে দাবি করে, তাহলে বহুসংখ্যক হাজিই তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে

Scanned by CamScanner

ফেলবেন। কিন্তু ভাবার বিষয় হচ্ছে, হজরত মাহদির আগমনের পর তাঁর সহযোদ্ধা হওয়ার সৌভাগ্য কি ওদের হবে, যারা অলস-অকর্মণ্য? নাকি এই সৌভাগ্যের অংশীদার ওই ব্যক্তিরা হবেন, যারা নিজেদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার জন্য কুরবানি দিয়ে আসছেন।

কাপুরুষতা, অলসতা ও অনিয়মে যারা অভ্যস্ত, তারা হয়তো হজরত মাহদির আগমনের পর তালুতের সঙ্গী হওয়া বনি ইসরাইলের আরামপ্রিয় ওই লোকদের ন্যায় আচরণ করবে, যারা জর্দান নদী পাড়ি দেওয়ার সময় পেট ভরে পানি পান করে শুয়ে-বসে আরাম করছিল।

আমাদের চারিত্রিক অধঃপতনের চিত্র এতটাই ভয়ংকর যে, অনেক দীনদার মনে করা হয়—এমন ব্যক্তিটিও কোনো ক্ষেত্রে ইলমের অভাবে এবং কোনো ক্ষেত্রে তারবিয়াতের অভাবে কোনো না কোনো ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত। এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম, যারা এ ধরনের প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন যে, নিজেদের জ্ঞাতসারে কোনো ধরনের পাপকাজে লিপ্ত হবেন না। এহেন অবস্থায়ও এরা হজরত মাহদির আগমনে তার হাত চুম্বন করে সৌভাগ্যশীল হওয়া এবং তার নিকটতম ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন।

প্রথম যুগের মুসলমানগণ কি কারামাতের মাধ্যমে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলেন? যদি তাদের যুদ্ধবিজয় এ ধরনের কারামতের মাধ্যমে না হয়ে পরিশ্রমের মাধ্যমে হয়, তাহলে বর্তমান বস্তুবাদী জগতের ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থেকে এ ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা কতটা সমীচীন?

হজরত মাহদি অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে আসবেন; কিন্তু সমস্ত কাজ তাঁর দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত নিজেদের ওপর আবশ্যক কাজটুকু সমাধা করার চেষ্টা করা। এমন যেন না হয় যে, হজরত মাহদির আগমনের পর আমিরের শর্ত পূরণ হওয়ায় আমরা অন্য কোনো শর্ত পূরণের কাজে লেগে যাই, যেটি হয়তো আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

১০ মে ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ, বিকেল বেলা। রোমের একটি কেন্দ্রীয় সড়কের পাশে অবস্থিত একটি সম্মেলন কক্ষে অসাধারণ তৎপরতা দেখা যাচ্ছিল। আজ এখানে ব্রিটেন ও আমেরিকার সরকারি পদবিধারী এমন খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতাগণ এক বিশেষ বৈঠকের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছেন যাদের সরকারি পাদরি বলা

Scanned by CamScanner

হয়। সরকারিভাবে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে তারা টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করতে পারেন। এই সেমিনারে ৫ হাজার এমন খ্রিষ্টান স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট নেওয়া হয়, যারা বাগদাদসহ ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত ছিল; যারা বিদেশি সহায়তা দিয়ে যুদ্ধপীড়িত মুসলমানদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে থাকে এবং সুযোগমতো খ্রিষ্টধর্মের প্রচার-প্রসার করে। তারা নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে ইরাকের মুসলমানদের এ কথা বোঝাচ্ছিল যে, পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের তোমাদের নিয়ে কোনো ধরনের অনুভূতি নেই। তাই তোমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এমন ব্যক্তিদের সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করো, যারা বিভিন্ন সময়ে তোমাদের পক্ষে আন্দোলন করে এবং যেকোনো ধরণের ত্রাণসামগ্রী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

আরব দেশগুলো থেকে যাওয়া ত্রাণসামগ্রীও এদের মাধ্যমেই বিতরণ করা হচ্ছিল, যাদের ঠোঁটে কৃত্রিম হাসি, চোখে মেকি ভালোবাসা ও গলায় ক্রুশদণ্ড ঝুলন্ত ছিল। এই সম্মেলনে তাদের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছিল—তারা খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য স্থাপনে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কতটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যমতে, এখানে উপস্থিত রাজনৈতিক পাদরিগণ; যাদের মধ্যে পোপ জন পলের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিল।[৮৩] তারা ব্রিটেন ও আমেরিকার সরকারের কড়া সমালোচনা করেছিল নিজেদের প্রয়োজনীয় ফান্ড সরবরাহ না করার অভিযোগে। উক্ত সেমিনারে তারা এ প্রস্তাবনা পাশ করে যে, খ্রিষ্টান রাষ্ট্রসমূহকে এ কথা বোঝাতে হবে, আমেরিকা, ব্রিটেন ও তাদের মিত্রদের জন্য ইরাককে খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করা ব্যতীত অবস্থান করা যথেষ্ট প্রতিকূল হবে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদসমূহে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ অঞ্চলে কর্মরত পাদরিদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক ফান্ড সরবরাহ করতে হবে। এমনকি কাজ সম্পাদনের পর অবসরকালীন সময়ের জন্যও তাদের ভাতা দিতে হবে।

---

[৮৩] জি হ্যাঁ, উনিই সেই পোপ জন পল, যিনি মার্কিন হামলাসমূহের বিরুদ্ধে বাণী দিয়ে মুসলমানদের মন জয় করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় রাজধানী ভ্যাটিকান সিটিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের পরবর্তী ধাপ ১৪ মে ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে জায়নবাদী ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তেলআবিবে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে খ্রিষ্টবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রায় ১ হাজার ৮০০ পাদরিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যারা পৃথিবীব্যাপী খ্রিষ্টবাদের প্রচার-প্রসারে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে এবং তাদের পরিশ্রমের ফলে পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য মানুষ খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত হয়েছে। এর পাশাপাশি সেখানে সিআইএ-এর ধর্মীয় শাখার কর্মকর্তারা নিজেদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতির সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। যারা 'পশ্চিম ইরাক' নামে একটি খ্রিষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রম পাদরিদের পদতলে সমর্পিত করতে অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছিল। আর এদের সহযোগিতার জন্য জায়নবাদী ইহুদিদের সর্বোচ্চ স্তরের এমন বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিল, যারা দীর্ঘদিন অভিশপ্ততার গ্লানি নিয়ে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ধূর্ততার জালে খ্রিষ্টানদের আবদ্ধ করে তাদের দাউদি সাম্রাজ্যের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। তাদের পরিকল্পনা ছিল, ইহুদি পাদরিরা যদি এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে পারে, তাহলে তাদের 'বৃহত্তর ইসরাইল' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপ নিষ্কণ্টকভাবে সম্পন্ন হবে।

পাঠক হয়তো আশ্চার্যান্বিত হবেন, যেখানে খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে ইহুদিরা ভ্রান্ত ধর্মের অনুসারী এবং প্রভুর দরবারে অভিশপ্ত; অন্যদিকে ইহুদিদের মতে, খ্রিষ্টানরা ভ্রান্তির শিকার; এমনকি এই অভিশপ্তরা হজরত ইসা আ.-এর হত্যার যাবতীয় প্রচেষ্টা করেছিল। হজরত মরিয়ম আ.-এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতো। সেখানে এ দুটি দল কীভাবে রোম এবং তেলআবিবে একের পর এক নিজেদের মধ্যে পরামর্শ চালিয়ে যেতে পারে। মূলত এটিই হচ্ছে তাদের মধ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে একটি পার্থক্য। এর মাধ্যমেই মুসলমানদের ঐশী বাণীর অনুসারী হওয়া এবং তাদের মনগড়া মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার প্রমাণ স্পষ্ট হয়। মুসলমানদের মতে শুধু একটি লক্ষ্য সুন্দর হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সে লক্ষ্যে পৌছানোর মাধ্যমগুলো বৈধ এবং সঠিক পন্থায় হতে হবে। অন্যদিকে এসব ধর্মের অনুসারীদের মতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাদের স্বার্থের অনুকূলে হওয়াই যথেষ্ট। চাই সেটির অর্জন বৈধ পন্থায় হোক বা অবৈধ পন্থায়। এই ব্যাপারে তাদের ভিন্ন কোনো ভাবনা নেই। আর তাই ইহুদিরা যখন ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায়, খ্রিষ্টানদের সাহায্য এবং সমর্থন থেকে তারা বঞ্চিত হয় না। ঠিক তেমনিভাবে অস্ট্রেলিয়া

Scanned by CamScanner

যখন পূর্ব তিমুরে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালায়, তাদের উপর থেকে ইহুদিদের আশীর্বাদ বিলুপ্ত হয় না। এমনিভাবে এই দুটি জাতি নিজেদের স্বার্থের জন্য অবৈধভাবে সম্পদের লেনদেন, অর্থের লোভ এমনকি নারীদের ব্যবহার করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। তাই ইরাকে ইহুদি স্বার্থ সংরক্ষণে খ্রিষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের সমন্বিত আগ্রাসন ধারাবাহিকভাবে চলছে। নিজেদের ধূর্ততা ও অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা কেন যেন এ কথা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেখানে শয়তানকে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ছাড় দিয়েছেন, তাহলে কি তার সহযোগীদের সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখবেন? আল্লাহর কসম, মুসলমানদের আজকের অধঃপতন এই জন্য নয় যে, তাঁদের শত্রুরা অত্যধিক সচেতন এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন; বরং তাদের আজকের এ পরিণতির জন্য আকিদা, বিধিবিধান ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশকে অমান্য করাই দায়ী।

যে জাতি নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শত্রুদের হাতে বন্ধক রাখে, নিজেদের সম্পদ দিয়ে শত্রুদের সুদভিত্তিক অর্থনৈতিকেই উন্নত করে তোলে, কোনো কিছু আবিষ্কারের বদলে অন্যের অনুকরণকেই উন্নতি মনে করে, সামগ্রিক শক্তিমত্তাকে এগিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদকে ধারণ করে সে জাতিকে অধঃপতন থেকে কে রক্ষা করতে পারবে।

ইসলামের অনুসারীগণ আপনারা যারা হজরত মাহদির অপেক্ষা করছেন, একবার কিয়ামাতের আলামতসমূহের অধ্যায়ে হজরত মাহদির সঙ্গীদের গুণাবলিগুলোও পড়ে নিন। তারপর নিজেদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন— হজরত মাহদির যুগের খালিস মুমিনদের গুণাবলি আপনাদের মধ্যে বেশি বিদ্যমান নাকি তৎকালীন মুনাফিকদের গুণাবলি। কারণ, ইমাম মাহদি আ.-এর যুগে মুসলমানদের মধ্যে এ দুটি দল কিন্তু বিদ্যমান থাকবে।

Scanned by CamScanner

# আহ ফিলিস্তিন!

[পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে অভিশপ্ত ইহুদিদের
ধারাবাহিক পরিকল্পনার হৃদয়বিদারক উপাখ্যান]

## বিষধর পোকামাকড়

ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচে জঘন্য কূটচালের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। রহস্যেঘেরা এ ষড়যন্ত্র সহজেই বোঝা যায় না। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্র কে বোঝা ও বোঝানো উচিত। যেন পৃথিবীবাসী ও বস্তুবাদে বিশ্বাসীদের কাছে ফিলিস্তিনের সাধারণ জনগণের অবস্থান পরিষ্কার হয়। যাতে করে সেখানে আত্মঘাতী হামলাকারীদের[৮৪] সাহসিকতার মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের কথা। খ্রিষ্টান ও মিত্রশক্তির কূটকৌশলে তুরস্কের উসমানি খিলাফাতের সমাপ্তি ঘটে। ইসলামি চেতনার পরিবর্তে আরবদের মাঝে আরব জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করা হয়। শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে ভূভাগে এবং আকাশপথে সংঘটিত থাকলেও তারা কেন্দ্রীয় খিলাফাতের বাইরে গিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের খ্রিষ্টানদের করুণার পাত্র বানিয়েছিল। ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনে নিজেদের কর্তৃত্ব বহাল রেখেছিল। ব্রিটিশ মধ্যবর্তী সরকারের নামে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদিদের এনে এখানে একত্রিত করছিল। দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে তাদের এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছিল। তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা আরব নেতৃত্ব নিজেদের অঞ্চলে ইহুদিদের বেড়ে ওঠাকে স্বচক্ষে অবলোকন করছিল।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে 'ইউনাইটেড ন্যাশন' নামের আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাপ্তির মাধ্যমে 'জাতিসংঘ'[৮৫] নামের একটি নিরপেক্ষতার দাবিদার প্রতিষ্ঠান

---

[৮৪] যাদের কর্মকাণ্ডকে অপপ্রচারের মাধ্যমে সবার সামনে বিষিয়ে তোলা হয়েছে।

[৮৫] লেখক এখানে কী বুঝিয়েছেন—তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। আমরা তাঁর এই বাক্য দ্বারা এখানে দুইটি উদ্দেশ্য অনুমান করছি : ১. 'ইউনাইটেড ন্যাশন' সংগঠনটি ইহুদি প্রভাবিত ছিল না। পরে এই সংগঠনটি ইয়াহুদি প্রভাবিত সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২. আগে হয়তো 'ইউনাইটেড ন্যাশন' নামের সংগঠনটি নামেমাত্র ছিল। পরে নতুন করে এটাকে রূপদান করা হয়।

Scanned by CamScanner

সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই কসাই প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম ছুরির আঘাতে জর্জরিত হয় ফিলিস্তিনের সাধারণ মুসলমানরা; যখন জাতিসংঘে এই প্রস্তাবনা পাশ করা হয়—যেখানে 'ফিলিস্তিনি মুসলমান ও ইহুদিদের আলাদা আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়।' বাহ্যদৃষ্টিতে এই প্রস্তাবনাকে যথেষ্ট ইনসাফভিত্তিক মনে হলেও বাস্তবে তার অধীনে যেসব কূটকৌশলের বিষধর পোকামাকড় অপেক্ষা করছিল—

## পরধনে দানশীলতা

জাতিসংঘের নামধারী ন্যায়বিচারকগণ নির্ধারণ করেছিল যে, ফিলিস্তিনের ৫২ শতাংশ জায়গা ইহুদিদের এবং ৪৬ শতাংশ জায়গায় আরবদের বসতি নির্মাণ করা হবে।[৮৬] আর দুই শতাংশ জায়গা[৮৭] আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থার নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়। অথচ সেখানে ইসরাইল রাষ্ট্র স্থাপনের কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। ইহুদিদের উপর তথাকথিত নির্যাতন থেকে যদি তাদের বাঁচানোর উদ্দেশ্য হতো, আমেরিকা নিজেদের প্রায় ৫০টির মতো প্রদেশ থেকে দু-একটি তাদের জন্য বরাদ্দ দিতে পারত। কানাডার মতো বৃহৎ একটি দেশ ইচ্ছা করলে এদের জন্য কিছু জায়গা ছেড়ে দিতে পারত। যদি আমেরিকা মহাদেশে এদের জন্য জায়গা না হতো অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ; যেখানে হাজার হাজার একর খালি জায়গা রয়েছে, সেখানে ইহুদিদের জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যেত। এসব দিকগুলোকে অগ্রাহ্য করে যে বণ্টন করা হয়, তা-ই বা কতটা ন্যায়সঙ্গত ছিল?

ফিলিস্তিনের সম্পূর্ণ ভূমি হচ্ছে ২৭ হাজার বর্গকিলোমিটার। তৎকালীন সময়ে ১,৪০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে ইহুদিদের বসতি ছিল। আর এই ১,৪০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বসবাস করা সংখ্যালঘুদের জন্য ৫২ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া কতটা ন্যায়সঙ্গত ছিল? আবার আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের জন্য বরাদ্দকৃত ২ শতাংশও মূলত ইহুদিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। অন্যদিকে ২৫,৪০৯ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী[৮৮] বসবাস করা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিলিস্তিনিদের জন্য মাত্র ৪৬ শতাংশ জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

---

[৮৬] কৌশলগতভাবে এখানে মুসলমান বা ফিলিস্তিনি শব্দের পরিবর্তে আরব শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

[৮৭] বায়তুল মাকদিসসহ।

[৮৮] মূল ভূমির প্রায় ৯০ শতাংশ।

Scanned by CamScanner

## আলোচনার অভিনয়

ইহুদিদের উগ্রতা লক্ষ করুন। এ ধরনের অন্যায়-অসম বণ্টনেও তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ফিলিস্তিন থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ সরে যাওয়ার পর প্রস্তাবনা অনুযায়ী উভয়পক্ষকে তাদের জন্য নির্ধারিত জায়গা বরাদ্দ দেওয়ার কথা থাকলেও জাতিসংঘের এ প্রস্তাবনাকে ইসরাইল অগ্রাহ্য করে। এবং আমেরিকান অস্ত্রের সহযোগিতায় ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চল[৮৯] বাদ দিয়ে প্রায় ৭৮ শতাংশ জায়গা নিজেদের দখলে নেয়। এর বাইরেও যে ২২ শতাংশ জায়গায় মুসলমানদের দুটি বৃহৎ শহর অবস্থিত ছিল, তা-ও ভূমিগতভাবে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন ছিল। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ৭৮ শতাংশ জায়গায় ইহুদিরা নিজেদের চিরস্থায়ী অধিকার রয়েছে বলে গণ্য করে। এর বাইরে থাকা ২২ শতাংশ জায়গা নিয়ে আলোচনার নামে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে।

## দুর্বল ছাগলের চিৎকার

কিন্তু ইহুদিরা কি ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশ জায়গা দখল করেও সন্তুষ্ট রয়েছে? এমনটা মনে করাও একধরনের বোকামি। যারা নীলনদ থেকে টাইগ্রিস নদী পর্যন্ত নিজেদের মনে করে, তারা ফিলিস্তিনের এত অল্প ভূমিতে কীভাবে সন্তুষ্ট থাকবে। আর তাই দেখা যায়, মুসলিমবিশ্ব ইহুদিদের আগ্রাসী মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পূর্বেই ১৯৫৬ সালে ইহুদিরা তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যায়।

অক্টোবরের এক কালো রাতে মুসলিম অধ্যুষিত দুটি বড় শহরের একটিতে (গাজা) ইহুদিরা হানাদারের ভূমিকায় প্রবেশ করে এবং তা দখল করে সীনাই মরুভূমি অতিক্রম করে সুয়েজ খালের দিকে অগ্রসর হয়। মিসরের মহামান্য শক্তিশালী শাসকগণ যারা কিনা মুজাহিদদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করে নিজেদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে বেড়ায়, সেদিন তারাও ইসরাইলি বাহিনীর সামনে দুর্বল ছাগলের মতো চিৎকার করছিল। সেদিন তারাই পৃথিবীর সবচে গুরুত্বপূর্ণ টানেল; যেটি এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার সম্মিলনস্থল হিসেবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে, ইসরাইলের হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হয়। যেখানে পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করলেও

---

[৮৯] জর্দান নদীর পশ্চিম পাড় এবং গাজা।

Scanned by CamScanner

নীলনদের পাড়ে তৈরি বিনোদনকেন্দ্রে বসে তারা আরব জাতীয়তাবাদের জয়গান করছিল।

## আটাত্তর যোগ বাইশ

এখন মুসলমানদের হাতে শুধু জর্দানের পশ্চিম তীরের একটি বড় শহর ছিল। ১৯৬৭ সালে ইহুদিরা মুসলমানদের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল সেই শহরটিকেও নিজেদের আগ্রাসনে নিয়ে যায়। এবার তারা দ্বিমুখী যুদ্ধের মাধ্যমে একসাথেই পরিপূর্ণ কাজ সমাধা করতে মনস্থ করে। এ লক্ষ্যে তারা উত্তর দিকে লেবানন সীমান্তে অবস্থিত সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়সমূহে[৯০] হানা দেয়। দীর্ঘ ছয় দিনের যুদ্ধ শেষে ফিলিস্তিনের প্রায় সম্পূর্ণ ভূমি তাদের আয়ত্তে চলে আসে। প্রথমেই ৭৮ শতাংশ জায়গা তাদের আয়ত্তে ছিল; তারপর গাজা অঞ্চলটিকে তারা নিজেদের আয়ত্তাধীন করে। আর শেষমেশ মুসলমান শাসকদের অবহেলার সুযোগে ষড়ভুজ আকৃতির তারকা-বিশিষ্ট ইহুদি পতাকা সমগ্র ফিলিস্তিনে নিজের অবস্থান তৈরি করে নেয়।

## ফিলিস্তিনিরা এসব প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে কেন

এখানে পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারবেন ফিলিস্তিনি জনগণ কেন আপসকামী আরব শাসকদের ১৯৬৭ সালের স্ব স্ব সীমানায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবনাকে লঙ্ঘন করছে। ১৯৪৮ সালেই তো ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশ জায়গা ইসরাইলি হানাদার বাহিনী নিজেদের দখলে নেয়। ১৯৫৬ ও ১৯৬৮ সালের প্রস্তাবনা তো তাদের সেই দখলদারিত্বকে মেনে নেওয়ার শামিল। কেমন যেন ইসরাইলের সাথে শত্রুতার ভয়ে আরব শাসকরা ফিলিস্তিনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জায়গায় ইসরাইলের আগ্রাসনকে মেনে নিচ্ছেন। এবং বাকি ২২ শতাংশ জায়গা ফিলিস্তিনিদের জন্য ছেড়ে দেওয়ার শর্তে তাদের আধিপত্যকে মনজুরি দিয়ে প্রতিদিনের ঝগড়া থেকে মুক্তির আশ্রয় খুঁজছিলেন। বানরের পিঠা বণ্টনের মতো এ ধরনের বণ্টনতো জাতিসংঘের প্রস্তাবিত বণ্টন নীতিমালার সাথেও সাংঘর্ষিক। আর এই কারণেই আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা এ ধরনের প্রস্তাবনাকে বোমার আঘাতে উড়িয়ে দিচ্ছে। তারা নিজেদের প্রাপ্য অংশকে কারও বোকামি এবং কাপুরুষতাপূর্ণ প্রস্তাবনার বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে রাজি নয়।

---

[৯০] গোলান পাহাড়।

Scanned by CamScanner

## পা ভাঙা সিংহাসন

১৯৭৩ সালে আরবদের কিছুটা স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল এবং তারা আরব জাতীয়তাবাদের দুর্গন্ধমুক্ত মতবাদ থেকে পিছনে এসে কিছুটা ইসলামি চেতনার প্রদর্শন করেছিল। তখন ইসরাইল অধিকৃত সিনাই মরুভূমিতে মিসর এবং গোলান পাহাড়ি এলাকায় সিরিয়া হামলা করেছিল। সিনাই মরুভূমিতে ইসরাইলের বিশেষ কোনো স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ছিল না; কিন্তু গোলান পাহাড়ি এলাকা তাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, এখান থেকে তারা সমগ্র আরবের উপর দৃষ্টি রাখতে পারত। তাদের স্থাপিত এন্টিনার আধিক্যে সেখানের আবু নিদা উপত্যকা ইলেকট্রিক-সামগ্রীর জংগল বলে মনে হতো; যার মাধ্যমে সিরিয়া, লেবানন হতে জর্দান বর্ডারের প্রতি ইঞ্চি জায়গা পর্যবেক্ষণ করা যেত।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এখানে স্থাপিত শক্তিশালী ক্যামেরার মাধ্যমে আরব সাগর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখা যেত। তাই এ পাহাড়টি তারা হাতছাড়া করতে চাইত না। যদি কোনোভাবে তাদের হাত থেকে এই অঞ্চলটি ছিনিয়ে নেওয়া যেত, তাহলে যেন একচোখা দাজ্জালের সেই একটি চোখও অন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু শত্রুর চোখ অন্ধ করার জন্য তো ইসলামের প্রহরীদেও জাগ্রত হতে হবে। যদিও নামধারী ইসলামি শাসকদের ভঙ্গুর সিংহাসন রক্ষার বহু মুহাফিজ রয়েছে; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী আজও তৈরি হয়নি। ফিলিস্তিনিরা বুঝতে পেরেছে যে, নিজেদের কাজ তাদেরই করতে হবে। তাই শত্রুদের জুলুম ও স্বজাতির কাপুরুষতা সত্ত্বেও তারা ভালোভাবেই নিজেদেও দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ফিলিস্তিনে এ হৃদয়বিদারক ঘটনাবলি এখনো ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলছে। প্রশ্নবিদ্ধ থেকেই যাচ্ছে ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচি। যেমন ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসিত আলাদা ভূখণ্ড দেওয়ার পরেও মুজাহিদদের এ হামলা কতটা বৈধ? যে হামলাগুলোর ফলে মুসলমানরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাহলে সেগুলোর বৈধতা কী? রাতারাতি কীভাবে আল কুদুস শহরের সীমানা পরিবর্তিত হয়ে যায়?

## এ বি সি দ্বারা কী বোঝানো হয়

এ বি সি জোন দিয়ে কী বোঝানো হয়? আল কুদুস শহরের পরিবর্তে ইসরাইল মুসলমানদের কী দিতে চায়? ইহুদিরা নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলে এক ফুট

Scanned by CamScanner

পিছনে গিয়ে কীভাবে তাকে এক বর্গমাইল প্রমাণিত করে? অঙ্কের বণ্টনের মতো এ ধরনের বণ্টন-নীতিমালার সুফল কেন বারংবার ইসরাইলের ইহুদিরাই ভোগ করে? 'রামাল্লা' এবং 'রামলা'র মধ্যে কোন শব্দটি উচ্চারণগতভাবে ঠিক? তেলআবিবের পাশে 'বাবুল্লুদ' নামক জায়গাটির ঐতিহাসিক ভূমিকা কী? ইসরাইলি সেনারা কেন বারংবার পশ্চাৎমুখী হওয়ার অভিনয় করে? ইয়াসির আরাফাতের অধীনস্থ ফিলিস্তিনের পুলিশদের কেন প্রতিটি গুলির বিনিময়ে দেড় ডলার করে বেতন থেকে কর্তন করা হতো? দুর্গসদৃশ ইসরাইল কলোনী থেকে কেন ইহুদিরা বার বার পালিয়ে যায়? যখন ইহুদিরা বিপদগ্রস্ত হয় তখনই আলোচনার নামে কেন সময়ক্ষেপণের অভিনয় করে?

এ ধরণের আরও বহু প্রশ্নের উত্তর সামনের অধ্যায়গুলোতে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

## অঙ্কের মিষ্টান্ন বণ্টন

অঙ্কের বণ্টনের ওই প্রবাদবাক্য আপনি অবশ্যই শুনেছেন, যেখানে হেরফের করে বণ্টনকৃত সবটুকুই তার নিকটজনের কাছে থেকে যায়। ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দুটি শহর[৯১] ছিল, সে দুটি শহরের ব্যাপারেও ইহুদিরা এই নীতিমালা অনুসরণ করেছে। তারা এই অঞ্চলগুলোকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেছে।

'এ-জোন' নামে একটি অঞ্চলকে নির্ধারণ করে সেখানে ফিলিস্তিনিদের নামেমাত্র স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে। এ স্বায়ত্তশাসনও খুবই আশ্চর্যধরণের। নামেমাত্র এ স্বায়ত্তশাসনকে বুঝে নিতে আপনি আমাদের এখানে কর্মরত কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককেই ধরে নিতে পারেন। স্বায়ত্তশাসিত হলেও এ অঞ্চলের নেতাদের বিদেশি কোনো ধরনের যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ছোট একটি শহরের পরিচালনা করাই এদের একমাত্র কাজ। বাহিনী হিসেবে শুধু পুলিশবাহিনী রাখার তাদের অধিকার রয়েছে। তা-ও পুলিশের ক্ষমতা এতটাই খর্ব, যেকোনো ফিলিস্তিনি নাগরিককে যদি ইসরাইলের কেউ পুলিশের সামনে হত্যাও করে, তাহলেও এ পুলিশদের কিছু বলার ক্ষমতা থাকে না। কেননা, এ পুলিশ প্রত্যেকটি গুলির হিসাব ইসরাইলিদের কাছে দিতে বাধ্য থাকে। কোনোভাবে কোনো পুলিশ যদি

---

[৯১] পশ্চিম তীর ও গাজা।

Scanned by CamScanner

এমনকি ফিলিস্তিনি নাগরিকদের প্রতিবাদকে ভণ্ডুল করতেও যদি তারা গুলি ছুড়ে, তাহলে প্রতিটি গুলি বাবত তাদের বেতন থেকে দেড় ডলার করে কর্তন করা হয়।

'বি-জোন' নামে একটি অঞ্চলকে ধরা হয় যা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এই অঞ্চলটিকে ইসরাইল নিজেদের আয়ত্তে রেখেছে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ অঞ্চলে ধীরে ধীরে ইহুদি নাগরিকদের জড়ো করে ইহুদিগরিষ্ঠ বানানোর চেষ্টা করে চলছে। অতীতে এ অঞ্চলে ইহুদিদের স্বল্পতা থাকলেও বর্তমানে এ অঞ্চলকে অনেকটাই ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদের এনে এসব অঞ্চলে নতুন করে ইহুদি কলোনী তৈরি করা হচ্ছে।

'সি-জোন' নাম দিয়ে তৃতীয় একটি অঞ্চলকে ইহুদি এবং মুসলমান স্বায়ত্তশাসকদের সম্মিলিত ব্যবস্থাপনায় রাখা হয়েছে। পাঠক সহজেই এই শাসনব্যবস্থায় মুসলমানদের কত শতাংশ অংশীদারত্ব রয়েছে বুঝতে পারছেন। কার্যত এই অঞ্চলটিও ইহুদিদের অধীনেই রয়েছে। এ জোনের তুলনায় এমনিতেই বি ও সি জোনে তুলনামূলক বড় অংশ রাখা হয়েছে। এ জোনে নামমাত্র মুসলমান স্বায়ত্তশাসন হলেও জায়নবাদী ইহুদি চক্র কৌশলে সেখানেও নিজেদের কর্তৃত্ব বহাল রেখেছে।

এই অঞ্চলগুলোতে এ ধরনের বণ্টন করতে পেরে ইহুদিরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছে তা হচ্ছে, ফিলিস্তিনি মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা। রাতারাতি মুসলমানদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সামনের কয়েকটি গলি পেরিয়ে যেতেই তাদের জন্য আলাদা অনুমতির প্রয়োজন হবে। অবস্থার ভয়াবহতা এতটাই তীব্র যে, কোনো কোনো এলাকাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে একটি থেকে আরেকটিতে যাওয়ার জন্য অনুমতিপত্রের আবশ্যকতা করে দেওয়া হচ্ছে। কয়েক মাইল দূরে অবস্থানরত মুসলমানদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাতের জন্যও যেতে হলে বার বার চেকপোস্টে নিজেদের পরিচয় পেশ করতে হচ্ছে। এভাবেই নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে গত প্রায় অর্ধশতাব্দী পার করে চলছে সেখানকার নিরীহ মুসলমানরা।

সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখে থাকবেন যে, মুসলমান এলাকাগুলোতে ইহুদি ট্যাংক অবৈধভাবে প্রবেশ। সেটিই A Zone যেখানে মুসলমানরা নামমাত্র স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছেন। B Zone নামে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থেকে প্রায়ই তারা A Zone-এ প্রবেশ করে মুসলমানদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড

Scanned by CamScanner

চালায়। নিজেদের মনমতো হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর মানবতার ধ্বজাধারী মার্কিনীদের অভিনয়ে মূলত প্রতিবাদের মুখে তারা নিজেদের অধিকৃত 'বি-জোনে' ফিরে যায়। আর এ কৌশলেই মুসলমানদের অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে পিছু হটার নাটকের মাধ্যমে তারা তাদের বিরুদ্ধে ওঠা ইসলামি জাগরণকে থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

ইহুদিদের এ ধরনের জঘন্য, নোংরা, ঠাট্টামূলক আচরণই তাদেরকে অভিশপ্ত করে রেখেছিল। যেমন, শহরে প্রবেশের ক্ষেত্রে কুরআনে কারিমের বর্ণনামতে, মহান আল্লাহ তাদেরকে ইসতেগফারের হালতে মাথা নিচু করে প্রবেশ করতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু এই অসভ্য সম্প্রদায় নিতম্বের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে আল্লাহর বাণীকে বিকৃত করে শহরে প্রবেশ করে। এই আচরণের প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদগ্রস্ত হলেও তাদের সে আচরণ আজ পর্যন্ত পরিবর্তন করেনি। যেমন, আপনারা প্রায়ই শুনে থাকবেন যে, পশ্চিমা ও মার্কিনীদের চাপে পড়ে ইসরাইল তাদের দখলকৃত এত কিলোমিটার জায়গা ফিলিস্তিনিদের জন্য ছেড়ে দিচ্ছে। বাস্তবে যেটি হয়, তারা নিজেদের দখলকৃত অঞ্চল থেকে নিজেদের সীমানা হিসেবে চিহ্নিত করা বস্তুকে এক-দুই ফুট পেছনে এনেই সার্বিকভাবে তাকেই কয়েক বর্গকিলোমিটার হিসেবে প্রচার করে। ওদের এই ঠাট্টামূলক ধোঁকার আচরণ যদিও পৃথিবীবাসীর চোখে অস্পষ্ট; কিন্তু আকাশের স্রষ্টা কি তাদের হিসাব চুকিয়ে দেবেন না?

## দুই গাছের একই ফল

শক্তি, অর্থনীতি ও নারী।

একই গঠনের সাদৃশ্যপূর্ণ দুটি সমীকরণ সর্বত্রই চর্চিত হচ্ছে।

একদিকে আমেরিকা, ইসরাইল ও অত্যাচার।

অন্যদিকে ফিলিস্তিন, ইরাক ও নিপীড়িত হওয়া। আমেরিকা ইরাককে এবং ইসরাইল ফিলিস্তিনকে যেন যুদ্ধ মহড়াস্থল বানিয়ে রেখেছে। মার্কিনী ও তার মিত্রশক্তিদের যুদ্ধের জয়জয়কারের সংবাদ নিয়ে যে সূর্যেও উদয় হয়, ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলিদের নির্যাতনের রক্তাক্ত ঘটনা চাক্ষুষ করে তার অস্ত হয়। তারা মার্কিন ও ব্রিটিশদের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে দিন দিন নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে আর ইরাক ও ফিলিস্তিন বিশ্বের তাবৎ মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুখ বুজে সেই নির্যাতন সহ্য করে যাচ্ছে।

Scanned by CamScanner

একসময় ছিল যখন ইরাক বিশ্বের সকল মুসলমানদের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতো। আর আজ সেই রক্তাক্ত ইরাকের পাশে এমন কোনো ইমানদার নেই, যে কুফা ও বাগদাদে নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন ফিলিস্তিন সকল মুসলমানের হৃদয়ের স্পন্দন ছিল। আর আজ ইসরাইল কোথাও অস্ত্রের জোরে, কোথাও অর্থ ও নারীর প্রলোভনে মুসলমানদের ইমানি চেতনাকে জৈবিক চেতনায় রূপান্তরিত করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে নিচ্ছে। পরিস্থিতি এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, নিরুপায় ফিলিস্তিনিদের আত্মঘাতী হামলা মুসলমানদের কাছেই বোকামি বলেই মনে হচ্ছে। অন্যদিকে ইসরাইল ও তার সহযোগীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদকে আমেরিকা-ইউরোপের রেসলিংয়ের নিউজ বুলেটিনের মতো শুনছে।

## কুঠারের হাতল

একদিকে আত্মগোপন করে থাকা ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের খুঁজে খুঁজে ইহুদি ও মার্কিনীদের হত্যা করা; অন্যদিকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে নিজের সদর দপ্তরে প্রকাশ্যে অবস্থানরত ইয়াসির আরাফাতের[৯২] উপস্থিতি অবশ্য অন্য তাৎপর্য বহন করে। যা নিজেদের সাথে প্রতারণা ও শত্রুদের পক্ষাবলম্বনের হৃদয়বিদারক উপাখ্যানের সাক্ষী। যেখানে রয়েছে চোখে ধূলি দেওয়া, কালোকে সাদা বানানোর চতুরতা, নিজেকে বিক্রি করা থেকে নিয়ে জাতিকে বিক্রি করা ও নিজস্ব স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে স্বজাতিকে বিকিয়ে দেওয়ার নির্মম ইতিহাস।

ইসরাইল বৈরুত থেকে ইরাক পর্যন্ত কোনো মুসলিম মুজাহিদকে নিজেদের শত্রু বিবেচনায় নিয়ে বেঁচে থাকতে দেয়নি। অথচ ইয়াসির আরাফাত তাদের ব্যবস্থাপনায় তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ইহুদি স্ত্রী নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করে চলছেন। তার ঐতিহ্যবাহী রুমালের বাঁধনেও কোনো পরিবর্তন আসেনি এবং স্বভাবসুলভ তর্জন-গর্জনেও কোনো ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে না। পৃথিবীব্যাপী নির্যাতনের হোতা মার্কিনী ও ইহুদিরা ফিলিস্তিনে নিজেদের স্বার্থে কুড়ালের এমন হাতল নির্বাচন করেছে, যা দীর্ঘদিন তাদের কাজে আসবে। হত্যা নাটকের যে পরিকল্পিত দৃশ্য তাকে নিয়ে মঞ্চায়িত করা হয়, তা শুধুমাত্র একধরনের মৃত্যু নিয়ে ভেলকিবাজি।

---

[৯২] এখন তাঁর ব্যাপারটি মহান আল্লাহর হাতে।

Scanned by CamScanner

# ফিলিস্তিনি মুজাহিদের সাথে এক বিকেল

মুহাম্মাদ বিসাম নাজিবুত তরফাইন একজন ফিলিস্তিনি আরব। লম্বা, ফর্সা সুঠাম দেহের অধিকারী সম্ভ্রান্ত স্পষ্টভাষী একজন যুবক। উচ্চশিক্ষা, আরবি সাহিত্যচর্চা ও তার জিহাদি মনোভাবের কারণে মাঝেমাঝে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো। আমার অনারবি-আরবি সে যেভাবে উপভোগ করতো ঠিক সেভাবেই আমি তার উর্দুমিশ্রিত আরবি উপভোগ করতাম। তার অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে আমি ফিলিস্তিনের বাস্তব অবস্থাকে অনুসন্ধানের চেষ্টা করতাম। আর তাই ফিলিস্তিনি আত্মঘাতী হামলাকারীদের পটভূমি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, তাদের ত্যাগের ইতিহাস, ফিলিস্তিনের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক শহরসমূহ ও ইসরাইলিদের মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতাম। আর সে তথ্যবহুল বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন উত্তরের মাধ্যমে আমার আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসু মানসিকতাকে তৃপ্ত করত।

সবচে চমৎকার মূহূর্ত হতো যখন আমার কোনো কোনো প্রশ্ন তার চোখে এক জ্যোতির্ময় চাহনি তৈরি করত আর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তার শ্রুতিমধুর কণ্ঠ যখন আরবি থেকে উর্দুতে নেমে আসত—যেন আমার বুঝতে কোনোভাবেই কষ্ট না হয়। যখনই তার চোখে একধরনের সরু দৃষ্টি দেখতে পেতাম, তখনই আমি বুঝতে পেতাম যে, তার শ্রুতিমধুর কণ্ঠ আরবি থেকে উর্দুর দিকে যেতে চলেছে এবং তার সেই মধুভরা কণ্ঠের বর্ণনা আমার ভিতরে বসে যেত।

একদিন আমি তাকে এমন একটি প্রশ্ন করে ফেললাম, যা বারংবার মুখে এসেও থেমে যেত। আমি আশঙ্কা করতাম আমার প্রশ্নটি না-জানি শহিদদের আত্মার সাথে বেআদবি হয়ে যায়। যদিও এ প্রশ্নের কয়েকটি তাত্ত্বিক উত্তর আমার জানা ছিল এবং সেগুলো সঠিক হওয়ার ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত; তবুও

Scanned by CamScanner

আমি শহিদদের এ ধরনের আত্মত্যাগের ব্যাপারে ফিলিস্তিনিদের মুখে তাদের অভিব্যক্তি শুনতে চাচ্ছিলাম। আশানুরূপভাবে তার চমৎকার চক্ষুযুগল থেমে যায় এবং তা থেকে একধরনের আলোর আভা বের হয়; যা সুন্দর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তার মধ্যে দেখা যেত। তারপর সে সামনের দিকে ঝুঁকে এসে উত্তর দিতে শুরু করে।

'আত্মত্যাগের এ পদ্ধতি আমরা নিজেরাই নির্বাচন করেছি অনেক চিন্তাভাবনা করে। মূলত এর বাইরে আমাদের অন্য কোনো পন্থাও ছিল না। নিজেদের মধ্যেই গোয়েন্দা ও বিভিন্ন ধরনের এজেন্টদের আনাগোনা ছিল। অন্যান্য দেশ থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা পৌঁছার আশাও ছিল না। তখন আমরা দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম।

প্রথমত আত্মশুদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুরু করা। কেননা, খালি হাতের পাশাপাশি যদি কোনো জাতি ধর্মহীনতায় ভেসে যায়, তাহলে তাদের লাঞ্ছনা থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না। তাই আমরা যুবকদের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে শুরু করি। অতি দ্রুতই এর সুফল পাওয়া যায় এবং নামাজের কাতারে যুবকদের উপস্থিতি বেড়ে যায়। চায়ের আড্ডা ও ক্লাবের পরিবর্তে মসজিদ ও ইসলাহি মজলিসগুলোতে যুবকদের আনাগোনা বেড়ে যায়। নিজেদের মধ্যে আত্মোপলব্ধির শুরু হয় এবং ধর্মের সংস্পর্শে এসে তাদের আত্মার খোরাক তৈরি হওয়ায় তাদের জীবনের মোড় পাল্টে যায়।

আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল—নিজেদের ব্যবস্থাপনার স্বল্পতা সত্ত্বেও যা আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় রুখে দাঁড়ানো। আত্মশুদ্ধিমূলক সচেতনতার ফলে যুবকদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত হয়; যা শাহাদাতের তামান্না নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। কাফিরদের কোণঠাসা করতে বদ্ধপরিকর করে তোলে।

স্বল্পশক্তি নিয়ে পূর্বে শত্রুদের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের জন্য সেটিও সম্ভব ছিল না। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করে দেওয়ার তীব্র মানসিকতা আল্লাহর করুণায় আমাদের সামনে আত্মঘাতী হামলার পথকে সুগম করে দেয়। যা ছিল আমাদের অন্তরের আগুনকে নিবারিত করা ও শত্রুদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যম। ইহুদিরা নিজেদের অবৈধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং শয়তানি মানসিকতা নিয়ে পৃথিবীবাসীদের চরম উত্ত্যক্ত করলেও আজ আমাদের আত্মঘাতী

Scanned by CamScanner

হামলাকারীরা তাদের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। নিজেদের কুচক্রী মেধা নিয়ে তাদের চরম অহংকার ছিল, সর্বদাই তারা এর বহিঃপ্রকাশ করতো এবং নিজেদের নারকীয় সঙ্গী হিন্দুদের নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সহযোগিতা করতো। কিন্তু আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা তাদের সেই অহংকারকেও চূর্ণ করে দিয়েছে। এসব হামলায় তাদের বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের এই যুদ্ধাস্ত্র এতটাই কর্মশীল, যার সামনে ইহুদিদের যেকোনো রাসায়নিক অস্ত্র নিষ্ফল।

এবার আমি আপনার মূল প্রশ্নের উত্তরের দিকে যাচ্ছি। সাধারণ মুসলমানরা আমাদের এ ধরনের আক্রমণের সাফল্যের সংবাদে আনন্দিত হওয়ার পাশাপাশি হিংস্র ইসরাইলিদের হত্যাযজ্ঞে ব্যাপক হতাহত ও অনেকের আশ্রয়হীন হওয়ার আশঙ্কায় ভুগেন। বুলডোজারের থাবায় যাদের আশ্রয় বিলীন করা হতো। এই বিষয়গুলো প্রতিটি ইমানদারকে ব্যথিত করে তুলে। কিন্তু আমাদের ভাইদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ইনতিফাদার[৯৩] পূর্বে ইহুদিদের তুলনায় মুসলমানদের মৃত্যু হার ছিল প্রায় ১০ গুণ। ইহুদি মিডিয়া যা অত্যন্ত গর্বভরে প্রচার করতো। এই বিপ্লব শুরু হওয়ার পর যা দ্রুত কমতে শুরু করে। এখন যার আনুপাতিক হার হচ্ছে তিনজন মুসলমানের বিপরীতে প্রায় একজন ইহুদি। অর্থাৎ, তিন জন মুসলমানকে হত্যা করার পরিবর্তে ইহুদিদের নিজেদের একটি লাশ তুলতে হচ্ছে। সব ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ইহুদিদের তুলনায় আমাদের অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও এই আনুপাতিক হার তুচ্ছ করার মতো নয়; বরং আনুপাতিক হারে আমাদের এই সফলতা দিনদিন ইহুদিদের শক্তিমত্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্যভাবে এটাও বলা যায় যে, ইহুদিরা তো আমাদের দেশ, ঘরবাড়ি সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছিল। সর্বশেষ আমাদের হত্যা করে ফিলিস্তিনকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের করায়ত্ত করতে চেয়েছিল। আমাদের সামনে দুটি পথ ছিল, হয়তো ইহুদিদের অধীনস্থ হয়ে জীবন কাটিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া অথবা নিজেদের সর্বস্ব বিলীন করে কষ্ট সহ্য করে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। আমরা অনেক চিন্তাভাবনা করে দ্বিতীয় পথটি অবলম্বন করেছি। এ জন্য[৯৪] এই আত্মত্যাগে আমাদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করে

---

[৯৩] বিপ্লব।

[৯৪] বিসামের চোখে একধরনের উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করা যায়, যা তার কণ্ঠকে গাম্ভীর্যে ভরে তোলে।

Scanned by CamScanner

সহমর্মিতার প্রয়োজন নেই। এই পথ আমরা নিজেরাই নির্বাচিত করেছি এবং এ পথে আমরা চলতেই থাকব; যতদিন পর্যন্ত ওদের মস্তিষ্ক থেকে অন্যায় চিন্তাসমূহ দূরীভূত না হয়।'

বিসামের উপরোক্ত কথাগুলো আমাকে সম্মোহিত করে তুলছিল। দ্বিতীয় ইনতিফাদার দুই বছর পর ফিলিস্তিনের শহিদ ও ইসরাইলের মৃতদের সংখ্যার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিসামের বলিষ্ঠ কণ্ঠের সেই উত্তরটিই মনে পড়ল; যা সে আমার ওই প্রশ্নের উত্তরে দিয়েছিল, যেটি শুধু আমার প্রশ্ন নয়; অনেকের মনেই প্রশ্ন রয়েছে যে; ফিলিস্তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের হামলার প্রেক্ষিতে যেহেতু ফিলিস্তিনিদেরই বেশি ক্ষতি হয়; তাহলে এই হামলা করার যথার্থতা কী! মূলত ইহুদিদের কূটকৌশলের বিরুদ্ধে এটাই একমাত্র মাধ্যম ছিল, যা অসহায়ত্বের মৃত্যুর চেয়ে বহুগুণে ভালো।

সম্মানের জীবন যদি না থাকে তাহলে আত্মত্যাগের এই মৃত্যুই অনেকগুণে সম্মানের। সর্বোপরি এই হামলা ইহুদিদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে টক্কর দিচ্ছে, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই তাদের শক্তির মূল। পাশাপাশি ইনতিফাদার পূর্বে ফিলিস্তনের পবিত্র ভূমিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে ইহুদিদের এনে নতুন নতুন বসতি নির্মাণের যে ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়েছিল তা বহুলাংশেই বন্ধ হয়েছে। যেখানে প্রতি ছয় মাসে একটি করে নতুন ইহুদি বসতির ঘোষণা করা হতো আজ তা বন্ধ হয়ে পুরাতন ইহুদি বসতির সদস্যরাই মৃত্যুভয়ে নিজেদের চতুর্পাশে দুর্গসদৃশ প্রাচীর তৈরি করছে। তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিশ্রুত ভূমিতে অবস্থান করা তাদের জীবনে এতটাই ভয়ংকর স্বপ্নে পরিণত হয়েছে যে, ইসরাইল সরকারের বিভিন্ন সহযোগিতার আশ্বাস সত্ত্বেও তারা পুরাতন ভূমিতে ফিরে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পুরাতন ভূমিতে ফিরে গিয়ে তারা স্রষ্টার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে যে, প্রতিশ্রুত ভূমিতে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে তাঁরা পুরাতন দেশের পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলেনি।

সত্য কথা বলতে কি, বিসামের মতো যুবকরাই আজ ইহুদি ও মার্কিনীদের নাকে রশি লাগিয়ে রেখেছে। যদি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা আজ তাদের পাশে দাঁড়াত, তাহলে এই রশি দিয়ে টেনে অভিশপ্ত ইহুদিদের অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো।

Scanned by CamScanner

# অনারব বংশোদ্ভূত আরব শাসক

যুদ্ধের সময়ে সামরিক একটি বড় কৌশল হচ্ছে বিরোধী শিবিরে নিজেদের এমন গোয়েন্দা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া, যে প্রতি মুহূর্তে তাদের কর্মকাণ্ডের খবর সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু কর্মদক্ষ কোনো সমরবিদ যদি নিজের কোনো অনুগত ব্যক্তিকে শত্রুপক্ষের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে, নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তার মাধ্যমে শত্রুর চোখ-কানকে বশীভূত করে নিতে পারে, তাকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য বলা যেতে পারে।

আবু মাজেন এদিক থেকে সবচে বড় সাফল্যের দাবিদার। তার পূর্বপুরুষগণ ইরানের অধিবাসী ছিলেন। ১২৬০ হিজরি মোতাবেক ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে একটি ভ্রান্ত বাতিনি দলের জন্ম হয়। বাতিনি ফিরকা বলতে মুসলমানদের এমন একটি দলকে বোঝায়, যারা কুরআন ও হাদিসের নিজেদের মনগড়া এমন রহস্যপূর্ণ অর্থ বের করে, যা তাদের দৃষ্টিতে সহজসাধ্য হয়। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষের চাহিদাসমৃদ্ধ কোনো বস্তু শরিয়তে হারাম থাকে না। আবার এমন কোনো ইবাদাত করতে হয় না, যে ইবাদাত করতে গিয়ে কষ্ট সহ্য করতে হয়। জৈবিক চাহিদা পূরণের নিমিত্তে এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে গোপনে গোপনে তারা এই বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার করে। এ ধরনের দলগুলো মুসলমানদের শত্রুদের খুব কাজে আসে। এ জন্য তারা মুসলমানদের এই ধরনের দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে মুসলমানদের ক্ষতি করা এবং নিজেদের জন্য উপযোগী অবস্থা তৈরি করার কোনো সুযোগকে হাতছাড়া করে না। এ দলগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মাপূজারি নামসর্বস্ব ধর্মগুরুদের এমন চক্রান্তের ফলাফল হয়, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের পার্থিব, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য অনুসারীদের ধর্মকে বিনষ্ট করে থাকে। প্রাচীন যুগের মৃত্যুদুর্গের 'কারামেতা' সম্প্রদায় ও বর্তমানের বেলুচিস্তানের পাহাড়ে 'জিকরি' সম্প্রদায় এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আজ থেকে ১৬০ বছর পূর্বে ইরানের মৃত্যুদুর্গে একটি নতুন বাতিনি ফিরকা জন্মগ্রহণ করেছিল। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিল আত্মাপূজারি মির্জা আলি মুহাম্মাদ বাব শিরাজি।[৯৫] সে নিজের তত্ত্বাবধানে এ মতবাদ প্রচার করতে শুরু করে যে, মানুষের দেহে ঈশ্বরের প্রবেশ সম্ভব।

---

[৯৫] ১২৩৫-১২৬৬ হিজরি-১৮১৯-১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ।

Scanned by CamScanner

বলাবাহুল্য যে, অচিরেই সে এই মানুষের দেহ বলতে নিজেকেই প্রচার করতে আরম্ভ করতো। সে নিজের অনুসারীদের মাঝে 'যোগী রজনীশ'-এর মতো পুরুষ-মহিলার অবাধ মিলনের প্রবর্তন করতে চাইত, যেন এতে করে নিজের কামপূজা সহজসাধ্য হয়। নামাজ এবং জাকাতকে অস্বীকার করে রোজা ও হজকে অপ্রয়োজনীয় বলে নিজস্ব মতবাদ তৈরি করে। পাশাপাশি জিহাদের বিধানকে অস্বীকারের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে অবস্থান করে।

বাতিল মতবাদসমূহের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ মিল লক্ষ করা যায় যে, নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার পাশাপাশি জিহাদের বিধানকে অস্বীকারের ক্ষেত্রে এরা একাত্ম থাকে। দুর্ভাগ্যবশত এই ব্যক্তির এক শিষ্য ছিল বাহাউল্লা-নামীয়। যে কিনা মোসাহেবানা তোষামোদের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। নিজেদের মতবাদকে দূরদুরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে এবং সহযোগিতার লক্ষ্যে সে এমন বিধর্মী সংগঠনের সন্ধান করতে থাকে, যারা ভোগবাদী সরঞ্জামের সরবরাহ করার পাশাপাশি মুসলমানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রচারে সহযোগিতা করবে। শেষ পর্যন্ত এই ইবলিশের প্রতিনিধি এমন শয়তানি শক্তির সন্ধান পেয়ে যায়, যারা নিজেদের স্রষ্টার উপাসক মনে করলেও অন্যান্য সকলকে শয়তানের উপাসক হিসেবে দেখতে চায়।

ঠিক তখনই সুইজারল্যান্ডের বাসিল শহরে ইহুদিদের নেতৃত্বপর্যায়ের এক গোপন সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বাহাউল্লা সুইজারল্যান্ডে গিয়ে ইহুদিদের এ কথা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলো যে, যদি তারা তাকে সহযোগিতা করে তাহলে সে নিজেকে এমন ধাতুতে পরিণত করতে পারবে যা দিয়ে তরবারি, ছুরি অথবা বন্দুক যেকোনো অস্ত্র হিসেবে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে।

ফিলিস্তিনের প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরে যেতে ইহুদিদের এমন মুসলমান ইহুদির প্রয়োজন ছিল। এই ব্যক্তির মধ্যে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সকল যোগ্যতার সমাহার দেখতে পেল। তাই তারা তার পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে। এই বাহায়ি এবং ইহুদি জোটের বন্ধন এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, ইরান সরকার যখন বাহায়িদের কর্মকাণ্ড নিজের দেশে নিষিদ্ধ করে, তখন তারা সেখান থেকে অধিকৃত ফিলিস্তিনে গিয়ে উপনীত হয়। যেখানে জায়নবাদীদের দোসর ব্রিটেন সরকারের প্রতিনিধি জেনারেল এল এন বি[৯৬] তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়।

---

[৯৬] আল কুদুস শহরে ইয়াহুদি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে ক্রুসেডযুদ্ধ চলাকালীন খ্রিষ্টান নেতা ফ্রান্স লুইস দ্বিতীয়-এর ভূমিকা রাখে।

Scanned by CamScanner

এবং তাদের প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য হাইফা শহরে একটি জায়গার বন্দোবস্ত করে। আবু মাজেন সেই ইরান থেকে বিতাড়িত দলের সদস্য ছিল। যুবক বয়সে আবু মাজেনকে বাহায়ি দলের সবচে মেধাবী সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কেননা, তার প্রশিক্ষণে জায়নবাদীদের বিশেষ অংশগ্রহণ ছিল। আর কিছুদিন পূর্বে ইহুদিদের এই তুরুপের তাস ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল, পৃথিবীর সামনে যে মাহমুদ আব্বাস মির্জা নামে পরিচিত।

এরাই পৃথিবীতে মুসলমান মনে করা এমন দ্বিতীয় দল; যাদের ইসরাইলে নিজেদের কার্যালয় পরিচালনা করা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলার অনুমতি রয়েছে। বাহায়িদের ইসরাইলে দুটি কার্যালয় রয়েছে। প্রথমটি হাইফায়, যেখানে তাদের একটি বড় উপাসনালয় কম্পাউন্ড রয়েছে। যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইসরাইল নিজস্ব বিশেষ ফোর্স 'শিন বেট' (Shin Bet) মোতায়েন করে রেখেছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইসরাইলের নৌবন্দর শহর আক্কায়। যেখানে অতীতের কোনো একসময় ইসলামি সিংহশার্দুল সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহ. খ্রিষ্টবাদের ধ্বজাধারীদের পরাজিত করেছিলেন। আজ সেখানে ইসলামি নামধারী এই জঘন্য দলটির শীর্ষ গুরু বাহাউল্লার কবর অবস্থিত।

এই দলের স্বেচ্ছাসেবকরা যখন জায়নবাদীদের সেবা থেকে অবসর গ্রহণ করে তার কবরে হজের নিয়তে গমন করে। নিকট অতীতে এই দলটি ফিলিস্তিনে জায়নবাদীদের অবস্থান দৃঢ় করতে যথেষ্ট কাজ করেছে। মুসলমানদের উচ্ছেদ করে তাদের বাসস্থান ও কৃষিভূমিতে ইহুদিদের অবস্থান নিশ্চিত করতে এই অভিশপ্ত দলটির হাত ছিল। মুসলমানদের বেশ ধরে এরা স্থানীয় মুসলমানদের নিজেদের জায়গা জমি বিক্রি করতে উদ্বুদ্ধ করত এবং জায়গা-বিক্রি না করলে সহানুভূতিমূলকভাবে বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দিত। বর্তমানেও এ ধরনের কাজেই জায়নবাদীরা এদের ব্যবহার করছে।

জায়নবাদীদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষিত এই অনারবি বংশোদ্ভূত ফিলিস্তিনের এই শাসককে একটি মৌলিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর তা ছিল ফিলিস্তিনের জিহাদি সংগঠন যথা 'ফাতাহ', 'হামাস' ও 'জিহাদুল ইসলামি'র বিভিন্ন স্তরে এমন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, যার ফলে এরা মুসলমানদের নৈতিক সমর্থন হারায়। এর মাধ্যমে তাদের শক্তি খর্ব হবে এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ততটা সফল হবে না। নিজস্ব শাসনামলে মাহমুদ আব্বাসের সবচে বেশি তৎপরতা ছিল আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের নিবৃত্ত করা।

Scanned by CamScanner

ইহুদি এবং হিন্দুরা পার্থিব জীবনের প্রতি সবচে বেশি লোভী; আর তাই তারা মুসলমানদের আত্মত্যাগের বাসনাকে সবচে বেশি ভয় পায়। কেননা, বিভিন্ন ধরনের পথভ্রষ্টতা, আর্থিক ও সামরিক দৈন্যতা সত্ত্বেও এটিই একমাত্র এমন চেতনা; যা মুসলমানদের উন্নত জীবনের অধিকারী করতে পারে।

১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পাক-ভারত যুদ্ধে চোম্ভা বর্ডারে অসংখ্য ভারতীয় বাহিনী ও যুদ্ধযানের বিপরীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুবকদের নিজের শরীরে বোমা বেঁধে আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে 'ট্যাংকপ্রতি একজন সৈন্য' নীতিমালার বাস্তবায়ন যদি না করা হতো, তাহলে আজ হয়তো হিন্দু বেনিয়াদের ধুতি পাকিস্তানের বড় বড় শহরেও উড়ে বেড়াত। ঠিক তেমনিভাবে হিংস্র ইহুদিদের বিরুদ্ধে স্থানীয় ফিলিস্তিনি যুবকদের এ আত্মঘাতী হামলার ধারাবাহিকতা না থাকলে আজ হয়তো সেখানে বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে সুলায়মানি কাঠামো বিরাজমান থাকত।

যদি পাকিস্তানের কোনো কলামিস্ট ও লেখক বা শিল্পী পাকিস্তানের নাগরিকদের ভারতের সাথে বন্ধুত্বের পরামর্শ দেয় বা রক্তাক্ত সীমান্তগুলোকে শুধু একটি সাধারণ সীমারেখা হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়, তাহলে যেমন কারও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ভারতীয় লবি একটি নতুন কর্মচারী নিয়োগ করেছে, ঠিক তেমনিভাবে ফিলিস্তিনি মুসলমানরা নিজেদের বন্ধু বা হিতাকাঙ্ক্ষী নির্বাচন করতে 'সে কতটা ইসরাইলের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধে নিয়োজিত' তার বিবেচনা করে। কিন্তু এই মাহমুদ আব্বাসকে পরিমাপ করতে ফিলিস্তিনিদের কোনো নিক্তির প্রয়োজন নেই। সবার কাছে এ কথা স্পষ্ট যে, ইহুদিরা গত কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনে ইয়াসির আরাফাতের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনাময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যেকোনো উপায়ে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই তুরুপের তাসকে ফিলিস্তিনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করা। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের পারস্পরিক বিভেদ তৈরিতে সত্তরের দশক থেকে বাহায়িদের ইসরাইলের অন্তর্গত করে নিয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তাই বাহায়িরা নিজেদের প্রভুভক্তির পরিপূর্ণ হক আদায় করেছিল। আর তাদের একজনকেই ইহুদি এজেন্ট হিসেবে ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়েছিল।

ঠিক যে সময়ে আবু জিহাদ, আবু আয়াজের মতো প্রভাবশালী ফিলিস্তিনি যোদ্ধানেতাদের ইহুদিরা হত্যা করছিল, ঠিক তখনই প্যারিসের বিভিন্ন মনোরম প্রাসাদে বসে মাহমুদ আব্বাস নিজের জীবনকে উপভোগ করছিল। শুধু

Scanned by CamScanner

ইউরোপের শহর নয়; গাজা এবং রামাল্লাতেই তার একেকটি প্রাসাদের মূল্য ১০ বিলিয়ন ডলারের মতো। ইহুদি অর্থনীতির সাহায্যে এই পরম ভোগ-বিলাসের ঋণ সে জিহাদের প্রতি মুসলমানদের অনীহা ও যোদ্ধা নেতাদের প্রতি অবজ্ঞা তৈরির মাধ্যমে আদায় করেছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার শাসনামল ইংরেজ স্টাইলের শাসনামল ছিল। যেখানে নিপীড়িত মুসলমানরা স্লোগান দিতে পারবে, সমাবেশ করতে পারবে; অতঃপর নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। অস্ত্র হাতে নেওয়া বা কোনো ধরনের হামলা চালানো তাদের স্বার্থ বিরোধী। যার মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়া বা আলোচনা ভেস্তে যেতে পারে।

সহমর্মিতার অভিনয় করে মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনিদের এ কথা বোঝাতে শুরু করে, যদি ইসরাইলিদের উপর হামলা করা হয়, তাহলে তারা এই অজুহাতে মুসলিমদের উপর হামলা করার বৈধতা খুঁজে পাবে। তাই এ ধরনের হামলার বৈধতার সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত না। এই কথাটি হচ্ছে ঠিক এমন বলা যে পাকিস্তান যদি উন্নত অস্ত্র বানানোর চেষ্টা করে তাহলে এর বিপরীতে ভারতও দূরপাল্লার বিভিন্ন অস্ত্র বানাতে শুরু করবে; তাই সীমান্তে উত্তেজনা নিরসনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্র তৈরিতে হাত না দেওয়া।

মাহমুদ আব্বাস যদি ভয়ংকর কিছু ভুল না করে ফেলত, তাহলে হয়তো ফিলিস্তিনের সাধারণ মুসলমানরা তার প্রতারণায় ধোঁকা খেয়ে বসত। এই ভুলগুলো ঠিক যেমন আমাদের কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীরা দিল্লি বা মুম্বাই যাত্রার পরে করে থাকেন, যার মাধ্যমে তাদের ক্যারিয়ার কলঙ্কিত হয়ে পড়ে। তার প্রথম ভুলটি ছিল, ফিলিস্তিনের সর্ববৃহৎ ইহুদি বসতি আবু গানিমের নির্মাণের ঠিকাদারি নেওয়া। দ্বিতীয় ভুলটি সে করেছিল এ কথার প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে যে, বর্তমানে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মুসলিম বিশ্বের কাছে কোনো আশা রাখা উচিত নয়; বরং তাদের উচিত পশ্চিমা শক্তির আশাবাদী হওয়া। কারণ, একমাত্র পশ্চিমারাই তাদের জন্য কিছু করতে সক্ষম।

একবার তো সে প্রকাশ্যেই স্বরূপে উন্মোচিত হয়ে যায়, যখন সে এ কথা বলে যে, 'আমার ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের কর্মপদ্ধতি সর্ম্পকে আমার অধিক অবগতি আছে—তাই বিনা বাক্যব্যয়ে আমার প্রস্তাবনা মেনে নেয়া উচিত।' সবচে বড় ভুলটি করেছিল; যখন ফিলিস্তিনি জনগণকে এ কথা বোঝাতে চেয়েছিল যে, 'ইসরাইল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের চরম মূল্য দিতে হবে।'

Scanned by CamScanner

এ ধরনের ভীতি প্রদর্শন করে সে গায়ে পড়ে 'অসলো চুক্তি' করে ফেলে। এই চুক্তির ফলে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের চরম মূল্য দিতে হোক বা না হোক; কিন্তু ফিলিস্তিনের ৮০ শতাংশ জায়গা থেকে তাদের কর্তৃত্ব রহিত হয়। ঠিক এ ধরনের শক্তি থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমাদের দেশের কিছু বুদ্ধিজীবীও ভারতের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের সাফাই গায়।

অসলো চুক্তির কারিগর হিসেবে ভূষিত হওয়ায় এই মহান ব্যক্তিটি অনারবি বংশোদ্ভূত কোনো আরব রাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। হতাশার বিষয় হচ্ছে, যখন মুসলমানরা তাদের যোগ্য ব্যক্তিত্বদের থেকে প্রয়োজনীয় কাজ নিচ্ছে না, ঠিক তখনই হিন্দু ও ইহুদিরা তাদের ঘরেই তাদের সাপ প্রতিপালিত করছে।

মজার বিষয় হচ্ছে, এই সকল সাপের ধর্ম, বর্ণ এবং কর্মপদ্ধতি সবই এক; তবু আমরা একটু খুঁজে দেখি না যে, আমাদের ঘরে এই সাপগুলো কীভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে।

ইহুদি ও হিন্দুদের কর্মপদ্ধতি প্রায় এক। পাকিস্তান ও ফিলিস্তিনে তাদের এজেন্টদের কথা বলা ও কর্মপদ্ধতিও এক; তবুও আমরা তাদের চিনতে পারি না। যখন দারোয়ানই অন্ধ হয়ে যায়, তখন চোরের আর বেশি কী করার থাকে?

Scanned by CamScanner

# হে আমার গোত্রের লোক

## একটি শয়তানি উত্তর

বাতিলের একটি কার্যকারী হাতিয়ার হচ্ছে নিজের কাজকে অগ্রগামী করার জন্য কোনো হকের সাথে সম্বন্ধিত করা। আর সেই সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে এমন মাধ্যমের আশ্রয় নেওয়া হয়, যাকে যাচাইয়ের নিক্তিতে ওঠানো সম্ভব হয় না। নিজেদের বাস্তব সম্পর্ক লুকিয়ে হকপন্থী কারও দিকে নিজেদের সম্বন্ধিত করা বাতিলের এমন প্রতারণার ফাঁদ, যা তারা কয়েক শতক ধরে ব্যবহার করে আসছে। ঠিক যেমনি যখন আপনি কোনো জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ভবিষ্যদ্‌বক্তা জ্যোতিষীকে দেখবেন যে, সে মানুষের ভবিষ্যতের সুলক্ষণ এবং কুলক্ষণগুলো বলছে—'এই সপ্তাহ কেমন যাবে, এই দিনটি কেমন যাবে'। তখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন—'তোমার এটা কেমন জ্যোতিষশাস্ত্র যে, তুমি সম্পদশালী ব্যক্তিদের ভবিষ্যতের সংবাদ দিতে পারছ; অথচ নিজের লাঞ্ছনাকর অবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারছ না।'

তখন সে আপনাকে উত্তর দেবে, 'এটি অমুক নবি বা অমুক বুজুর্গ থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা ইলমে বাতিনি।'

আর যদি আপনি তাকে প্রশ্ন করেন—এমন কোনো ঘটনা এসব নবি বা বুজুর্গের জীবনে কখনো পাওয়া যায় না বা তাঁরা এমনসব কাজকে নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। বরং তাঁরা সারাজীবন এসব কাজকে শয়তানি কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে এসেছেন এবং এসব হতে অন্যদেরকে বারণ করেছেন। তাহলে নবিদের কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত এই কাজকে তুমি কোন মাধ্যমে পেয়েছ?'

তখন সে এমন এক শয়তানি উত্তর দেবে, যা প্রতিটি ভ্রান্ত দল-গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে। বলবে, 'এই ইলম আমাদের কাছে সিনা থেকে সিনায় এসেছে।'

কোন বুজুর্গদের মাধ্যমে এসেছে, কার সিনা থেকে কার সিনায় এসেছে এবং কোন পরম্পরায় এসেছে—এসব জিজ্ঞেস করলে সে নিশ্চুপ হয়ে যাবে।

Scanned by CamScanner

## শিরকের একটি ডিজিটাল পদ্ধতি

মূলত শরিয়তে এমন কোনো বস্তু নেই যা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে। হিদায়াত এবং হিদায়াতের জ্ঞান তো সকল মানুষের জন্য। হিদায়াতকে কিছু মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে অন্যদের হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করা একধরনের অন্যায়। মহান আল্লাহ, নৈকট্যতাপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, নবি-রাসুল ও বুজুর্গ বান্দাগণ এ ধরনের অন্যায় থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত। ভবিষ্যতের কোনো সংবাদ কাউকে দেওয়া ইলমে গায়েবের দাবি করার সমার্থক; যা প্রকাশ্য শিরক। কাউকে হাত দেখিয়ে বা নিজের রাশি বর্ণনা করে তার কাছ থেকে ভবিষ্যতের তথ্য জানা এবং এর উপর বিশ্বাস করা এই শিরককে সত্যায়ন করার শামিল। শিরককে সত্যায়ন করা শুধু শিরকই নয়; বরং শিরকের প্রচারও জঘন্য অন্যায়। আমাদের সমাজে শিরকের এ পর্যায়টি অত্যন্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে সাধারণ পর্যায়ে চলে এসেছে। পত্রিকা এবং বিলবোর্ডে এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে যে, শুধু একটি কল করেই আপনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন গুপ্তরহস্য জানতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের অজানা। বিভিন্ন ধরনের প্রভাবশালী পাথরের বিজ্ঞাপনও সচরাচর দেখা যায়। আর এই সবগুলো হচ্ছে শিরক ফিসসিফাতের নিকৃষ্টতম প্রকার; যা ইহুদিরা জাদুনগর ব্যাবিলন থেকে উদ্ভাবন করেছিল এবং এর ফাঁদে পতিত ব্যক্তিরা ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতিতে নিপতিত হবে।

## সত্তর ধর্মগুরুর বর্ণনা

যখন ইহুদি ধর্মের আলোচনা করা হয় সত্যিকারার্থে হজরত মুসা আ.-এর ওপর নাজিলকৃত আসমানি ধর্মকে বোঝানো হয় না; বরং বনি ইসরাইলের বস্তুবাদী নামধারী ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃক বিবর্তিত শরিয়ত উদ্দেশ্য হয়, যা মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের বিরোদ্ধাচরণের উপর নির্ভরশীল। 'তালমুদ' নাম দিয়ে ইহুদি ধর্মীয় নেতারা নিজেদের পদ ও সম্পদের লোভকে চরিতার্থ করতে শয়তানের প্ররোচনায় একটি ধর্ম প্রবর্তন করে। উপরিউক্ত প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তারা এসব ভ্রান্ত মতবাদকে ওই ৭০ জন বুজুর্গ ব্যক্তির দিকে সম্পর্কিত করে, যারা হজরত মুসা আ.-এর সাথে 'তুর' পাহাড়ে কিতাব আনার জন্য গিয়েছিলেন। উপরোক্ত প্রতারণার সাথে উল্লেখিত ৭০ জন বুজুর্গ থেকে এ সমস্ত মতবাদের কোনো পারস্পরিক সূত্র নেই। তাদের পণ্ডিতরা গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ওদের এ কথা বোঝায়—এসব কথা

Scanned by CamScanner

মৌখিক ছিল, যা সিনা থেকে সিনায় এসেছে এবং লিখিত আকারে ছিল না। এসব গোপন তথ্যকে তারা 'সেপচুয়াজিন্টা' (Septuaginta) নামে অভিহিত করে ইহুদি ধর্মের মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যা মূলত তাদের ভোগবাদী আত্মাপূজারি ধর্মীয় নেতাদের সংকলন। বনি ইসরাইলের পথভ্রষ্ট পণ্ডিতগণ মিথ্যা এবং মনগড়া এসব মতবাদগুলোকেই ধর্মের মূলনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাদের ধারণামতে এসবের বিরোধিতাকারী প্রত্যেকেই এমনকি বনি ইসরাইলের অন্যান্য নবিগণও পথভ্রষ্ট এবং হত্যার উপযুক্ত। আর এই মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠার সময়কাল হচ্ছে হজরত ইসা আ.-এর আগমনের পূর্বেকার ৪০০ বছর, যে সময়ে এসব ভ্রান্ত নেতাদের কথামতে এই অভিশপ্ত ইহুদিরা অনেক নিষ্পাপ নবিদের রক্তপাত করেছিল।

## ঐতিহাসিক শত্রুতার মূল ভিত্তি

ঐশী বাণীর সাথে ইহুদিদের বিরুদ্ধাচরণ তখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল। নবিগণ এবং হকের পথে আহ্বানকারীগণ তাদের এসব পাপকর্ম থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাধা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের পাপকাজের শাস্তি এবং তাওবা করে ফিরে আসার প্রতি বিভিন্ন ধরনের সুসংবাদ শোনাচ্ছিলেন। সাথে সাথে হজরত ইসা মাসিহ আ.-এর আগমন এবং দাজ্জালের আগমনের সংবাদ দিচ্ছিলেন। কিন্তু এমন সম্মানিত জাতি, যাদের উম্মাতে মুহাম্মাদির পূর্বে সবচে সম্মানিত জাতির উপাধি দেওয়া হয়েছিল; তারা নবিদের বার বার বোঝানো ও বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদের মাধ্যমে পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার পরেও শয়তানের ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসতে প্রস্তুত ছিল না। আর এ জন্যই তাদের সর্বশেষ সুযোগ হিসেবে অত্যধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং বিভিন্ন ধরনের মুজিজাসমৃদ্ধ একজন নবি[১৭] প্রেরণ করা হয়, যেন ইহুদিরা তাদের পাপাচার থেকে ফিরে আসে। অন্যথায় তাদের অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে চিরদিনের জন্য তাদের অভিশপ্ত করে দেওয়া হবে এবং চিরস্থায়ী অভিশপ্ততার এক চূড়ান্ত উদাহরণ হিসেবে রেখে দেওয়া হবে। কিন্তু এই অভিশপ্তদের কাছে উল্লেখিত মর্যাদাবান নবি এলেনও; কিন্তু তারা তাদের অন্যায় কাজকর্ম থেকে বিরত হলো না। তারা এই সম্মানিত নবিকে নিজেদের ধারণা অনুযায়ী ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার পরিকল্পনা নেয় এবং সত্যিকারার্থেই বিদ্রোহী সন্ত্রাসীর রূপ ধারণ করে। এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করে তারা ঘোষণা করে যে, তারা একমাত্র মাসিহ

[১৭] হজরত ইসা আ.।

Scanned by CamScanner

দাজ্জালের আগমনের অপেক্ষা করছে। এর পূর্বে আসা কোনো নবি বা মাসিহকে তারা পরিপূর্ণরূপে নিজেদের শত্রু বিবেচনা করে। নিজেদের চিরাচরিত বিকৃতকরণের অভ্যাসমতো তারা হজরত ইসা আ.-এর আগমনকেন্দ্রিক সুসংবাদগুলোকে দাজ্জালের সাথে এবং দাজ্জালকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিপদ-আপদের সতর্কতামূলক বাণীগুলোকে হজরত ইসা আ.-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করতে শুরু করে। এই ঐতিহাসিক শত্রুতার উত্থান তখন অস্তিত্বে আসে, যখন ফিলিস্তিনের তিনটি ইহুদি গোত্র খেজুরবাগান-বেষ্টিত ইয়াসরিবে এসে বসবাস করতে শুরু করে।[৯৮]

## ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দ

এ কথা প্রসিদ্ধ যে, রাসুল ﷺ-এর জন্মের পূর্বে ইহুদিরা তার অপেক্ষায় এবং তার ওপর ইমান আনার লক্ষ্যে মদিনায় এসে অবস্থান করছিল। যারা দুজন নবির ওপর ইমান আনয়ন করা এবং দুটি কিতাবের অধিকারী হওয়ার মাধ্যমে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হয়েছিলেন, তাদের জন্য যদিও এ কথাটি সত্য; কিন্তু বক্রস্বভাবের ইহুদিদের স্বাভাবিক অবস্থা দেখে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকাংশ ইহুদির ক্ষেত্রে এ কথাটি প্রয়োগযোগ্য নয়। নিজেদের ধারণামতে ইহুদিরা হজরত ইসা আ.-কে হত্যা করেছিল। এখন তাদের সামনে শুধুমাত্র একটি ভয় বাকি ছিল। যদিও পৃথিবীবাসীর জন্য এটি রহমত ছিল; কিন্তু হজরত মুসা ও ইসা আ.-এর বাণীসমূহে শেষ নবির সুসংবাদ শুনতে শুনতে এরা তাকে নিজেদের নোংরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে ক্ষতিকর বাধা হিসেবে বিবেচনা করে। নিজেদের বিবেচনায় সর্বশেষ এই আশঙ্কাকে নিশ্চিহ্ন করতে ইহুদিরা ইয়াসরিব অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং তাদের একটি বড় সংখ্যা সেখানে একত্রিত হয়। যারা নিজেদের বংশের তথা বনি ইসরাইলের নবিদের বিনা কারণে হত্যা করেছিল।[৯৯]

তারা অন্য বংশে; অর্থাৎ, বনি ইসমাইলে আগত একজন নবির প্রতি ইমান আনার লক্ষ্যে সেখানে গিয়ে একত্রিত হবে এটা অনেকটাই অবিশ্বাস্য। মূলত

---

[৯৮] যার মধ্যে বিন্দুপরিমাণ বিবেক ও ন্যূনতম ইমান রয়েছে, তিনি সহজেই বুঝবেন এই ঐতিহাসিক শত্রুতার স্বরূপ কী। যদিও বর্তমানে ইসরাইলের জন্য সকল মুসলমান দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রবর্তন এবং এ কথা বলা, যেকোনো মুসলিম দেশের সাথে আমাদের বিদ্বেষ নেই; পৃথিবীর বুকে বলা সবচে জঘন্য মিথ্যাচার।

[৯৯] বিশেষ করে হজরত ইয়াহইয়া আ.-ও তাদের ধারণামতে হজরত ইসা আ.।

Scanned by CamScanner

তারা তাদের এই অন্যায় মিশনের অংশ হিসেবে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ইয়াসরিব অভিমুখে রওয়ানা হয়।

ফিলিস্তিন থেকেই ইয়াসরিব পর্যন্ত প্রতিটি ইতিহাস সাক্ষ্য যে এরা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে নিজেদের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেনি। যদি ইমান আনার উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে যেহেতু তাদের কিতাবে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর যাবতীয় গুণাবলি স্পষ্টভাবে বর্ণিত ছিল, তাহলে তো তাদের সবার আগে ইমান আনার কথা ছিল। কিন্তু তারা তো সাধারণ ইহুদিদের ইমান আনয়ন করতে দিত না; এমনকি যারা ইমান আনয়ন করতো, তাদেরকেও হত্যা করার চেষ্টা করতো। নিজেদের কূটবিদ্যায় নববি রশ্মিকে নিভিয়ে দিতে এই অভিশপ্তরা ইসলামের শত্রুদের যেভাবে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করতো, তা আল্লাহর অশেষ রহমত এবং মুসলমানদের জিহাদি প্রচেষ্টায় থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। আর এভাবেই তাদের লাঞ্ছনার শুরু হয়, যার সর্বোচ্চ পরিণতি 'জাজিরাতুল আরব' থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অতঃপর ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হয়ে বিতাড়িত হতে থাকে।

## পাঁচকোনা-বিশিষ্ট রহস্যময় ইমারত

এটি ওই বছরের কথা যখন কলম্বাস ভারতের খুঁজে বের হয়ে পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জ হয়ে আমেরিকায় গিয়ে উপনীত হয়। আবু আবদুল্লাহ-নামী পিতার অবাধ্য কুসন্তানের অযোগ্যতায় যদি স্পেনে ইসলামি খিলাফাতের সমাপ্তি না ঘটতো, তাহলে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের সুনাম কোনো মুসলমানের নামেই হতো এবং সেখানে খ্রিষ্টবাদ ও জায়নবাদীদের পরিবর্তে ইসলামের পতাকা উড্ডীন থাকত। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রানাডার পতন ঘটে, যখন ইসলামি নাবিক ও ভূগোলবিদদের সামুদ্রিক অভিযান সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল। এর দুই বছর পর মুসলমান নাবিক এবং ভূগোলবিদদের সহায়তায় কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

উন্নত মানসিকতা, ক্ষমা ও মহৎ গুণের অধিকারী মুসলমানদের শাসনামলে স্পেনে ইহুদিরা আরাম-আয়েশে ছিল। এদিকে মুসলমানদের পতনের পর তাদের স্থানে নেতৃত্বভার নেওয়া খ্রিষ্টানদের নিপীড়নে ইহুদিদের স্পেনে অবস্থান কষ্টসাধ্য ছিল। তাই নিজেদের সুদভিত্তিক সমৃদ্ধ অর্থনীতিসহ তারা দলে দলে কলম্বাসের আবিষ্কৃত নতুন দুনিয়া তথা আমেরিকায় পৌঁছতে আরম্ভ

Scanned by CamScanner

করে।[১০০] আর এভাবে আমেরিকা মূলত বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও দাজ্জালের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বকার একটি মধ্যবর্তী শাসনব্যবস্থা।

যদি আমেরিকা বাস্তবে খ্রিষ্টান রাষ্ট্র হতো, তাহলে তাদের জাতীয় উৎসব হিসেবে ক্রিসমাসকে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু তাদের জাতীয় উৎসব হিসেবে 'থ্যাংকসগিভিং ডে' (Thanksgiving Day) তথা 'ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিন' উদযাপন করা হয়। যা মূলত ইহুদিদের 'জিউস ফেস্টিভ্যাল অব হারভেস্ট অব সুকোত' (Jewish festival of Harvest of succoth)-এর অন্য নাম।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বাসভবন যা পৃথিবীবাসী হোয়াইট হাউস হিসেবে চিনে, ইহুদিরা একে দাজ্জালের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার সুলায়মানি কাঠামো[১০১] হিসেবে গণ্য করে। আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রিম কমান্ডার হেডকোয়াটার পঞ্চভুজ-বিশিষ্ট হওয়া শুধু একটি কাকতালীয় ঘটনা নয়। মূলত এগুলোকে পঞ্চভুজ বিশিষ্ট করে হজরত সুলায়মান আ.-এর আংটির নমুনা অনুসারে বানানো হয়েছে। যাকে ইহুদি ধর্মবিশ্বাসীদের মতে, দাজ্জাল বের হওয়ার পূর্বে দাজ্জালের পূর্বসূরিদের হেডকোয়ার্টার হিসেবে দেখা হয়। এখানে ২৭ হাজার মানুষ কর্মরত রয়েছে। যাদের মধ্যে প্রায় ৭ হাজার হচ্ছে মনোবিদ। এদের কাছে প্রতিটি দেশের প্রতিটি নেতার জন্য আলাদা ফাইল তৈরি করা আছে। এখানে ইসলামি বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ নেতা, সকল দল এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন পূর্ণাঙ্গরূপে বিশ্লেষণ করা হয় এবং নিজেদের গবেষণা অনুযায়ী তাদের জন্য বিভিন্ন ফর্মুলা তৈরি করা হয়।

আমেরিকান শাসনব্যবস্থা মূলত ইহুদিদের আত্মিক ও রাজনৈতিক দীর্ঘ সফরের মধ্যবর্তীস্থল। যাদের সরকারি প্রতীক ও সিলমোহরসমূহ প্রসিদ্ধ ফ্রি মিশন সংগঠনের সিল এবং প্রতীকের অনুরূপ। আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ফ্রি মিশনের শুধু একজন কট্টর সমর্থকই নন; বরং তাকে ইহুদি উচ্চপর্যায়ের আধ্যাত্মিক ধর্মীয় নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধকে ফ্রি মিশনের সামরিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সহায়তায় ফ্রান্স বিপ্লবের অনুসারে পরিচালিত করে এবং ইহুদিদের পরিকল্পনা-মাস্টারপ্লান অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করা হয়।

---

[১০০] ইহুদিরা তাদের এই দেশত্যাগকে ফেরাউনের রাজ্য থেকে ফিলিস্তিন অভিমুখে সফর করার সমপর্যায়ের মনে করে।

[১০১] তাদের মতে, যেটি দাজ্জালের রাজদরবার হবে।

Scanned by CamScanner

## ৭০ জন ধর্মগুরুর বৈঠক

আমেরিকার রাজনৈতিক, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইহুদিবাদের স্পষ্ট ছাপের পাশাপাশি জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর বিভিন্ন প্রতীকে ইহুদি মস্তিষ্কলব্ধ বিভিন্ন চিহ্ন ও প্রতীক যেকোনো গবেষককেই চমকে দিতে পারে। ধরুন জাতিসংঘের শান্তিপরিষদের বৈঠকের ছবি। অর্ধবৃত্তাকার এ বৈঠক মূলত প্রাচীনকালের সুলায়মানি কাঠামোতে ইহুদিদের ৭০ জন বুজুর্গের বৈঠকের প্রতিকৃতি বহন করে। অর্ধচন্দ্রিমা আকৃতির এই শৃঙ্খলাবদ্ধ বৈঠক থেকে তাদের বিভিন্ন ফরমান জারি করা হতো। যেন এটি ইহুদিদের ভবিষ্যতের সুলায়মানি কাঠামোতে পরিকল্পিত শান্তিপরিষদের পূর্ববর্তী একটি শান্তিপরিষদ।

আল্লাহ না করুন, যদি ফিলিস্তিনের বায়তুল মাকদিসকে ধ্বংস করে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ করা হয়, তাহলে হয়তো বর্তমান শান্তি পরিষদ ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে ৭০ জন ইহুদি পণ্ডিতের শান্তি পরিষদের বৈঠক সেই কাঠামোতে জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। এবং তারা সেখান থেকে দাজ্জালের ফরমানসমূহ জারি করবে।

## কেউ প্রতিবাদ করুক

হে আমার গোত্রের লোকেরা, হয়তো এসব হৃদয়বিদারক উপাখ্যান শুনে তোমরা এগুলোকে আলিমদের পাগলামি হিসেবে চিহ্নিত করবে। কিন্তু আল্লাহর শপথ, এটা হাসির বিষয় নয়; বরং কান্না করার বিষয়। মহান আল্লাহ আমাদের অর্থাৎ, পাকিস্তানিদের ইসরাইলের শয়তানি রাজত্বের বিপরীতে পাকিস্তানরূপে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ও তার অগ্রগতির জন্য নির্বাচন করেছেন। কিন্তু আমরা আত্মোপলব্ধি করে ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা করে নিজেদের মূল ভিত্তিকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে অর্ধশতাব্দী যাবৎ বনি ইসরাইলের মতো তিহের প্রান্তরে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরছি। কুরআনি শাসন ও মাদানি জীবনব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে পশ্চিমা শাসনব্যবস্থার চাকচিক্য ও শয়তানি জীবনব্যবস্থা আমাদের আকৃষ্ট করে রেখেছে। হজরত ইসা আ.-কে স্বাগত জানিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরিবর্তে দাজ্জালের আগমনকে ত্বরান্বিত করে তার সহযোগিতা করতেই যেন আমরা অপেক্ষমাণ।

Scanned by CamScanner

আমাদের প্রিয় দেশ এবং তার উদ্যমী প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের উচিত ছিল, একে বিশ্বব্যাপী আল্লাহর রাজত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা এবং এর সেনাবাহিনীকে ইসলামি বিশ্বের সেবক হিসেবে প্রস্তুত করা। অথচ আমরা একে দাজ্জালের মধ্যবর্তী সরকারের মিত্র ও ইহুদিদের সহযোগিতার জঘন্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। কোনো জাতি হয়তো এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয় না, যা আমরা নিজেদের ব্যাপারে নিচ্ছি। কেউ কি আমাদের সচেতন করবে—আমরা কারা? কী করতে চাই এবং কোন দিকে যাচ্ছি?

Scanned by CamScanner

# দুটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত

মানুষের ত্যাগের বিপরীতে পুণ্য এবং গুনাহ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়াই হচ্ছে ঐশী বিধান। তার দুটি দৃষ্টান্ত অত্যন্ত অসাধারণ এবং শিক্ষণীয়। যা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণকারীদের এই আশ্বাস দেয় যে, আল্লাহর কাছ থেকে কেনা পণ্যে সর্বদা লাভ হবে; যেখানে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং তার শত্রুদের এ কথার প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তাদের পাপকাজ সত্ত্বেও যতই শিথিলতা প্রদর্শন করা হোক, একদিন অবশ্যই তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে; এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ দুটি দৃষ্টান্ত শুধু ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়; বরং পৃথিবীর ইতিহাসেও একমাত্র উদাহরণ। উভয়টি কিয়ামাতের পূর্বসময়ের সাথে সংশ্লিষ্টতার পাশাপাশি ইসলাম, খ্রিষ্টবাদ ও ইহুদিদের পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিবৃত হওয়ার দিক থেকে সামঞ্জস্যতা রাখে। যা উপরোক্ত তিনটি ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ ধর্মকে পৃথিবীব্যাপী বিজয়ী করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

তন্মধ্যে প্রথম দৃষ্টান্তটি হচ্ছে শেষ যুগের খলিফা, প্রতীক্ষিত মাহদি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ।[১০২] হাদিস শরিফে কিয়ামাতের পূর্বকার বড়-ছোট বিভিন্ন নিদর্শনাবলির ক্ষেত্রে হজরত মাহদির[১০৩] আলোচনা যত বেশি করা হয়েছে তা অর্থগত/ভাবগত মুতাওয়াতির হতে পারে। মুতাওয়াতির এমন হাদিসকে বলা হয়, যা এতসংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, যাদের মিথ্যার ওপর একমত হওয়াকে অসম্ভব মনে হয়। যদি সকল বর্ণনাকারীদের বর্ণনার শব্দ একরকম হয়, তাকে 'তাওয়াতুরে লফজি'; আর যদি প্রত্যেকের বর্ণনার অর্থ একই হয়, তাহলে তাকে 'তাওয়াতুরে মানাবি' তথা অর্থগত মুতাওয়াতির বলে। প্রায় সকল আলিমের মতে, এ ধরনের মুতাওয়াতির থেকে নিশ্চিত তথ্য অর্জিত হয়।

---

[১০২] যিনি হাসান বিন ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধর থেকে হবেন।

[১০৩] তাঁর নামের শুরুতে ইমাম এবং শেষে আলাই সালাম যোগ করা অনুচিত; বরং অন্যান্য সম্মানিত নামের মতো শুরুতে হজরত যোগ করা যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

ইমাম শাওকানি[১০৪] তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *নাইলুল আওতার* এবং *আত তাওজিহ ফি তাওয়াতুরি মা জাআ ফিল মুনতাজার ওয়াল মাসিহে ওয়াদদাজ্জাল* গ্রন্থে হজরত মাহদি-এর আগমন-সংক্রান্ত বর্ণিত সকল হাদিসের পর্যালোচনার পর লিখেন, 'হজরত মাহদি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হাদিসের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে কিছু সহিহ, কিছু হাসান এবং এসব হাদিস নিঃসন্দেহে মুতাওয়াতির।'

কনৌজের নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান[১০৫] নিজের গ্রন্থ *আল ইজাআহ লিমা কানা ওয়ামা ইয়াকুনু বাইনা ইয়াদাইস সাআহ*-এ বলেন, 'হজরত মাহদি সম্পর্কে এত বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে।'

এ দুজন ব্যতীত আরও বিভিন্ন উলামায়ে কিরাম এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ব্যাপারে আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন যার সংখ্যা প্রায় ৩০টি।[১০৬] যেসব বর্ণনার মূল বক্তব্য হচ্ছে, শেষ যুগে মহান আল্লাহ এই উম্মাতের আহলে বায়তের[১০৭] মধ্য থেকে এমন এক যোগ্য সন্তান প্রেরণ করবেন, যিনি ভয়ংকর রক্তাক্ত যুদ্ধসমূহে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন। যিনি পাহাড়ের তলদেশ থেকে নয়; বরং হাসান বিন ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদের বংশোদ্ভূত এক সম্ভ্রান্ত যুবক হিসেবে আবির্ভূত হবেন। যার নাম হবে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ। অর্থাৎ, যার নাম হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামের অনুরূপ এবং তাঁর পিতার নাম নবি ﷺ-এর পিতার নামের অনুরূপ হবে। তিনি হবেন অনুসৃত সঠিক পথপ্রাপ্ত নেতা মাহদি। জিহাদের বরকতময় পন্থায় যিনি অন্যায়-অবিচারের এ পৃথিবীতে ন্যায় ও শান্তিতে ভরিয়ে দেবেন। সাত-আট অথবা নয় বছর পর্যন্ত তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং তার শাসনামলেই হজরত ইসা আ.-এর আগমন ঘটবে; যখন মানুষেরা এত প্রাচুর্য ভোগ করবে, যা তারা কখনো কল্পনাও করেনি। আল্লাহ তাআলা হজরত মাহদিকে তৈরি করে তাঁর ইসলাহ করবেন এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

'মহান আল্লাহ তাঁর ইসলাহ করবেন'—এটা হাদিসের ভাষ্য। এই বক্তব্যের অর্থ কী?

---

[১০৪] মৃত্যু ১২৫০ হিজরি

[১০৫] মৃত্যু ১৩০৭ হিজরি।

[১০৬] আমি এ ব্যাপারে লিখিত প্রায় ১২টি কিতাবে সরাসরি এবং আরও ছয়টি কিতাব বিভিন্ন রেফারেন্স আকারে পড়েছি।

[১০৭] রাসুল ﷺ-এর বংশধর।

Scanned by CamScanner

এর দুটি অর্থ হতে পারে। তাঁর থেকে কিছু ছোট ছোট গুনাহ হতে পারে। কিন্তু তাঁর তাওবা কবুল করত আল্লাহ এসব গুনাহ মাফ করে দিয়ে তাঁর অন্তরে হিদায়াত ভরে দেবেন। প্রাথমিকভাবে তা থেকে কিছু অন্যায় প্রকাশ পেলেও পরবর্তীকালে এ ধরনের কিছু প্রকাশ পাবে না।

দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, শেষ যুগে বিভিন্ন ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাকে মুসলিম উম্মাহের নেতৃত্বের জন্য যোগ্য করে তৈরি করবেন। এখানে উভয় অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে।

বর্তমানের নামধারী পীরেরা সস্তা ও মিথ্যা প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে ইমাম মাহদি দাবি করার একটি প্রচলন তৈরি করেছে। যদি হাদিসে বর্ণিত হজরত মাহদির বিবরণ জানা থাকে, তাহলে এসব প্রতারকদের পাল্লায় পড়তে হবে না।

প্রথমেই এ কথা জেনে নেওয়া উচিত, তিনি কোনো পাহাড়ি গুহা থেকে বা কোনো আস্তানা থেকে বের হয়ে নিজেকে মাহদি বলে দাবি করবেন না। নেতৃত্বগুণের এতটাই যথার্থতা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইবেন; কিন্তু মানুষেরা তাকে খুঁজে বের করবে। দাবি করা তো দূরে থাক তাকে নেতা বানিয়ে ফেলবে—এ ভয়ে তিনি লুকিয়ে থাকতে চাইবেন। লোকেরা তার মধ্যে যথার্থ নেতৃত্বগুণ দেখে তার হাতে বায়আত হতে চাইবে এবং তাকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য বাধ্য করবে।

এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মিথ্যাবাদী দাবিদারদের প্রথম চিহ্ন এটাই—তারা নিজেরাই নিজেদের মাহদি বলে দাবি করবে। এই ধরনের ব্যক্তি নিঃসন্দেহে চরম মিথ্যুক এবং প্রতারক।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি লক্ষণীয়, হজরত মাহদি আরব ভূমিতে আবির্ভূত হবেন। তার হাতে নেতৃত্ব ও জিহাদের বাইয়াত বায়তুল্লাহ এবং মাকামে ইবরাহিমের মধ্যখানে সম্পাদিত হবে। তাই যে ব্যক্তি অন্য কোথাও আবির্ভূত হবে বা জিহাদের সাথে বৈরিতা আসবে, তার মাহদি হওয়ার দাবিকে তারই মুখে ছুড়ে মারা উচিত। অন্যদিকে হজরত মাহদির হাতে যারা বায়আত হবেন তারা ইমানের বলে বলিয়ান হবেন। সংখ্যাধিক্য বা অন্য কোনো ধরনের সাজ-সরঞ্জামের বাহুল্যতা থাকবে না। বিজাতিদের এমনকি নিজ ধর্মের অনেকে তাদের বিরোধিতা করবে। এমনকি স্বজাতির কেউ কেউ তাদের গ্রেফতার করতে এগিয়ে আসবে।

Scanned by CamScanner

হজরত মাহদি এবং তার সঙ্গীরা বায়তুল্লাহর ভেতরে আশ্রয় নেবেন আর তখন হজরত মাহদির সবচে বড় প্রমাণটি প্রকাশ পাবে। যার ক্ষেত্রে এটি প্রকাশ হবে না, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত নয়; বরং পথভ্রষ্ট। আর তা হচ্ছে, হজরত মাহদির বিরুদ্ধে আগত সৈন্যবাহিনী মদিনার অদূরে 'জুল হুলাইফা' নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে ভূমিতে ধসে যাবে। মাটি বিদীর্ণ হলে তারা এর ভিতর ধসে যাবে অতঃপর মাটি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে এক-দুইজন বেঁচে যাবে, যারা অন্যদের এ সংবাদ দেবে। আর এ ঘটনার সংবাদ শুনে সবার এই বিশ্বাস হবে, বায়তুল্লায় আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিটিই হজরত মাহদি; যিনি শেষ যুগের খলিফা এবং মুসলমানদের জিহাদের নেতৃত্ব দেবেন। অতঃপর যাদের কপালে সৌভাগ্যের তিলক থাকবে, চরম অন্যায় যুগেও যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকবে। নিজেদের মুখ ও লজ্জাস্থানকে যারা অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত করবে না তারা দলে দলে এসে হজরত মাহদির হাতে বায়আত গ্রহণ করবে।

অর্থাৎ, তাঁর হাতে হাত দিয়ে তাঁর আনুগত্য ও ধর্মকে উঁচু করার লক্ষ্যে নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে। বিজয় অথবা শাহাদাত—এটাই হবে তাদের একমাত্র স্লোগান।

সত্যিকারের হজরত মাহদি নিজে অনুসারীদের কাছ থেকে কোনো ধরনের অর্থ বা উপঢৌকন নেবেন না। এসব দিকে মনোনিবেশ করার মতো সময়ই তাঁর হবে না। নিজের আবির্ভাবের পরপরই তিনি এমন যুদ্ধসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়বেন, যা অত্যন্ত ভয়ংকর ও বীরত্বের পরীক্ষা নেবে।

পুরো পৃথিবী তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইবে আর তিনি তার অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। স্বল্পসময়েই তিনি জাজিরাতুল আরবের কিছু আরব মুসলমান, পারস্যের কিছু পারসিক মুসলমান, তুর্কির বিধর্মী, ইউরোপের খ্রিষ্টান ও রাশিয়ার কমিউনিস্টদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমেরিকা ও ইসরাইলের ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আল্লাহর রহমতে সব যুদ্ধে তাঁর ও তাঁর সহযোদ্ধাদের বিজয় হবে। সবদিকে আল্লাহর বাণী সমুন্নত হবে এবং পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ইসলামের এমন বিজয় হবে, বহুকাল ধরে মুসলমানরা যার অপেক্ষা করছিল।

যাদের এ সৌভাগ্যের বিন্দুমাত্র অর্জন করতে ইচ্ছা আছে তাদের উচিত, সব ধরনের পাপ কাজ থেকে তাওবা করে, পদ-পদবি ও সম্পদের লোভ বিসর্জন

Scanned by CamScanner

দিয়ে নিজের ও নিজের অধীনস্থদের এমন রক্তাক্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখতে জিহাদি চেতনায় সমৃদ্ধ রাখা।

উপরোক্ত কথাগুলো হজরত মাহদির ব্যাপারে পঞ্চাশের ওপরে বর্ণিত হাদিস এবং ত্রিশোর্ধ্ব কিতাবের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম। এগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, হজরত মাহদি শেষ যুগে এসে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী করবেন। যে ব্যক্তি নিজেকে মাহদি বলে দাবি করবে এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে জিহাদভিন্ন অন্য কোনো ব্যাপারে মানুষকে একত্রিত করতে চাইবে, অথবা নিজের ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে মানুষকে ধর্মের পরিবর্তে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইবে, সে নিঃসন্দেহে বড় মিথ্যুক। এবং যে ব্যক্তি বর্তমান ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্বের প্রতি বিরূপ হয়ে ইসলামের বিজয়ের জন্য কারও নেতৃত্ব কামনা করে, সে যেন নিজের বিশ্বাস ও আমলকে বিশুদ্ধ করে, জিহাদি চেতনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে চেতনায় বলিয়ান করে তোলে। ইনশাআল্লাহ, হজরত মাহদির সহযোদ্ধাদের ফজিলতের কিয়দংশ হলেও সে অর্জন করবে; যা তাঁরা দাজ্জালকে হত্যা করে অর্জন করবেন। প্রতীক্ষিত মাহদির আলোচনা, নিজস্ব সামর্থ্য ও শক্তিকে বাহ্যত অচল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা এবং কোনো আসমানি বিপ্লবের জন্য হাত গুটিয়ে বসে অপেক্ষমাণ হওয়ার বাহানা নয়। এটি মূলত নিজের প্রচেষ্টার দৃঢ়তা ও পরকালের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্তে যার আলোচনা করা।

আমরা এখন পুরাতন কথায় ফিরে যাচ্ছি যেখান থেকে এই অধ্যায় শুরু করা হয়েছিল। ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি দিতে গিয়ে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা মহান আল্লাহর একটি নীতি, যেন ভালো কাজের প্রতিদানের ক্ষেত্রে তাঁর বান্দার ত্যাগের সামঞ্জস্যতা রক্ষা পায়। রাসুল ﷺ-এর দৌহিত্র হজরত হাসান রা. উম্মাতকে একক নেতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে এক অসাধারণ ত্যাগ ও বিনয়ের পরিচয় দিয়ে হজরত মুআবিয়া রা.-এর হাতে খিলাফাতের দায়িত্ব অর্পণ করে তার হাতে বায়আত হয়েছিলেন। উম্মাতের স্বার্থে তাঁর এই ত্যাগ এমন মহৎ উদাহরণ, যার ফলে বহু মূল্যবান প্রাণ, সম্পদ ও সময় ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচেছে; বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের জন্য ব্যয় হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. লেখেন, 'মহান আল্লাহ এই ত্যাগের বিনিময়ে তাঁর ত্যাগের অনুরূপ প্রতিদান দেবেন। আর সেটি তাঁর বংশধরদের মধ্যে

Scanned by CamScanner

এমন নেতৃত্ব তৈরির মাধ্যমে, যার অধীনে সমগ্র উম্মাত একত্রিত হবে। তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী খিলাফাত শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে এবং উম্মাহর মধ্যে এমন একতা ও সমন্বয় তৈরি হবে; যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি।'

আর দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছেন হজরত ইসা আ.। তাঁর বিরুদ্ধে তৎকালীন আসমানি কিতাবের অধিকারী ইহুদিরা জোটবদ্ধ হয়েছিল। তারা তাঁর সম্মানিতা মা'কে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে লাঞ্ছিত করে এবং বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ জুটিয়ে তাঁকে হত্যা করতে সচেষ্ট হয়। তাঁর যুগেই ইহুদিরা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল।[১০৮] একটি দল ছিল তারা ধর্মকে বিকৃত করতো।[১০৯] এদের 'ফারিসি' বলা হতো। দ্বিতীয় একটি দল নিজেদের ধর্মের আওতামুক্ত মনে করতো।[১১০] এদের 'সিন হিডরিন' বলা হতো। তৃতীয় দলটির নাম ছিল 'এসিন্স' (Essenes) যারা অত্যন্ত উগ্র মানসিকতা পোষণ করতো এবং বর্তমানের বকধার্মিক ধর্মগুরুদের ন্যায় বিভিন্ন কপট ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হতো। তিনটি দলই হজরত ইসা আ.-এর বাণী প্রচারে বাধা দিয়ে তাঁর দাওয়াতি কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাঁর সম্মানিত নবিকে নিরাপদে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং কিয়ামাতের পূর্ব-সময়ে এই শত্রুরাই যখন তাদের শীর্ষ নেতা দাজ্জালের নেতৃত্বে একত্রিত হবে, তখন ইসা আ.-কে আকাশ থেকে পুনরায় পাঠানো হবে; যেন তাঁর হাতে দাজ্জাল এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের হাতে দাজ্জালের চেলাচামুণ্ডরা নিহত হয়।

হজরত ইসা আ.-এর তৎকালীন সহচররা যুদ্ধের বিধানপ্রাপ্ত ছিলেন না।[১১১] তাই হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীদের একটি দল এই সম্মানপ্রাপ্ত হবে যে, তারা হজরত ইসা আ.-এর চতুর্পার্শ্বে থেকে আত্মত্যাগের এমন উদাহরণ তৈরি করবে, যা তাঁদের পূর্বসূরি তথা সাহাবায়ে কিরাম রাসুল ﷺ-এর পাশে তৈরি করেছিলেন এবং শান্তি ও মুক্তির সংবাদপ্রাপ্ত হবেন; যা তাদের পূর্বসূরিরা প্রাপ্ত হয়েছিল।

---

[১০৮] প্রত্যেকে একটু আত্মোপলব্ধি করার চেষ্টা করি, তিনটি দলের কোনোটির সাথে আমাদের সাদৃশ্যতা নেই তো? হাদিসে এসেছে, আমরা পূর্ববর্তী উম্মাতের পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করব।

[১০৯] যেমন বর্তমানে পশ্চিমা স্কলারগণের আধুনিক 'ইসলামাইজেশন' পদ্ধতি।

[১১০] যেমন, বর্তমানের ভোগবাদী হাই সোসাইটির লোকেরা নিজেদের ধর্মের বাঁধনমুক্ত মনে করে।

[১১১] তাদের একজন অবশ্য তাঁর সাথে প্রতারণা করেছিল।

Scanned by CamScanner

অনেক নবি ধর্মের বাণী প্রচার করতে গিয়ে শত্রুদের হাতে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। কিন্তু শত্রুর হামলা থেকে নিরাপদে বেঁচে আকাশে আরোহণ করা ও পরে এসে সেই শত্রুদের সমূলে বিনষ্ট করা হজরত ইসা আ.-এর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পৈতৃক সূত্রে বিশ্ব নেতৃত্বের দাবিদার ইহুদিরা যতই প্রচেষ্টা করুক; কিন্তু তাদের বাস্তবতা অনুযায়ী নিজেদের চূড়ান্ত পরিণাম ভোগ করার জন্য তারা আজ ইসরাইলে একত্রিত হচ্ছে। যে চূড়ান্ত পরিণতির আলোচনা সুরা আম্বিয়াতে করা হয়েছে—

> 'অতঃপর সে জনবসতিকে আমি ধ্বংস করে দিই তারা আর কখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না।'[১১২]

ইসরাইল ও মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্ধ মূলত অতীতের পাপাচারে লিপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়[১১৩] এবং বর্তমান মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যকার দ্বন্ধ। এই দ্বন্ধে যারা ঐশীবিধানের উপর নিজেদের অটল রাখতে পারবে, তারাই বিজয়ের পথ মাড়াবে।

কিছু দিন আগে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গভর্নর হাউজে সাংবাদিক ও কলামিস্টদের সাথে মতবিনিময় সভায় বলেছিলেন, 'ইসরাইলকে সমর্থন দানের প্রস্তাবনা আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে নয়; বরং এর মাধ্যমে ইসরাইল ও ভারতের মাঝে যে সম্পর্ক দিন দিন গভীর হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ইসরাইলি নাগরিকদের মনোভাব তৈরি করা।'

এ ধরনের প্রস্তাবনা সত্যিই আশ্চর্যজনক। মদিনা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেও যে ইহুদিরা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ ও ইসলামের সাথে গাদ্দারি করেছিল, তাঁর শত্রুদের তাঁর বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে যুদ্ধে নামিয়ে ছিল। তারা কি আজ আমাদের একপক্ষীয় সমর্থনের মাধ্যমে আমাদের ক্ষমা করবে বা আমাদের শত্রুদের সহযোগিতা বন্ধ করবে? আমরা নিজেদের আমেরিকার নির্ভরযোগ্য বন্ধু প্রমাণে কী কী কাজ করিনি? এর বিনিময়ে তারা কি ভারতকে সামরিক সহযোগিতা দেওয়া বন্ধ রেখেছে?

নিজেদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে যদি আমরা নিজেদের চিরশত্রুদের অবৈধ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিই, তাহলে কি তারা আমাদের মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা

---

[১১২] সুরা আম্বিয়া : ৯৫

[১১৩] ইয়াহুদিরা তাদের যুগে মুসলমান হিসেবে অভিহিত হতো; তবে পরবর্তিতে অভিশপ্ততাস্বরূপ এ নাম থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়।

Scanned by CamScanner

কাদিয়ানি, বাহায়ি ও আগাখানি নিজেদের এজেন্টদের দেশে ফিরিয়ে নেবে; যাদের তারা নিজেদের স্বার্থ বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের দেশে রেখেছে?

আল্লাহর ওয়াস্তে! হে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ইহুদিদের চিকিৎসা, সহযোগিতার মাধ্যমে নয়; বরং বিরোধিতার মাধ্যমেই করতে হবে।

বাস্তবে ইহুদিরা নিজেদের ভিন্ন অন্য ধর্মের মানুষদের মানবরূপী পশু বা Gentile নামে অভিহিত করে। তারা সরাসরি সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য চায়। যারা প্রমাণ ইসরাইলের সরকারি ওয়েবসাইট পাওয়া যায়। যেখানে স্পষ্ট দেখতে পাবেন, পাকিস্তানের স্বীকৃতি অর্জন করা তাদের বিশ্বনেতৃত্ব অর্জনের একটি ধাপ।

ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, প্রতিবেশী শত্রু আরবদের উপর কর্তৃত্ব লাভ, সমগ্র পৃথিবীর ইহুদিদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে একত্রিত করা, মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করা (নাউজুবিল্লাহ), সুলায়মানি কাঠামোর দ্বিতীয়বারের নির্মাণ[১১৪] সর্বশেষ ইসরাইলের ত্রাণকর্তার আগমন। তাদের সম্রাট মাসিহ বিন দাউদের আগমন এবং বিশ্বব্যাপী তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। মূলত ইসরাইল সর্বদা নিজেদের আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয়ী দল মনে করে।

হে আমার প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা! আসুন, শপথ করি, আমরা পৃথিবীব্যাপী সকল মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষার্থে চেষ্টা করব। মুসলমানদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধকারী সকল অপশক্তিকে এত দূরে নিয়ে যাব; যতটা নেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ আমাদের নির্বাচিত করেছেন।

---

[১১৪] প্রথম দুবার তারা নির্মাণ করেছিল; কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সেগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

Scanned by CamScanner

# অন্বেষণের সফর

যশ-খ্যাতির লালসা একটি মানসিক প্রবৃত্তি। যা মূলত মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা, যে অন্যান্য রিপুর ন্যায় একে-ও সে নিজের আয়ত্তে রাখতে পারে কি না। মানুষের মানসিক রোগের অনুসন্ধানী সুফি-সাধকগণ একে 'হুব্বে জাহ'[১১৫] বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের কিতাবসমূহে অন্যান্য রোগের ন্যায় এর চিহ্ন, কারণ ও এর ক্ষতিকর দিকসমূহের পাশাপাশি তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। তাসাউফ মূলত এমন একটি ইলম, যেখানে মানুষের আত্মার ব্যাধিকে পরিপূর্ণভাবে চিহ্নিত করে তার চিকিৎসা করা হয় এবং যে ধরণের সুন্দর গুণাবলি একজন মানুষের অর্জিত হওয়া উচিত, তা অর্জন করতে সহযোগিতা করা হয়। ইলমে তাসাউফের অধিকারীদের বিভিন্ন ধরনের জিকির ও সাধনার একমাত্র লক্ষ্যই এটি। যারা ইলমে তাসাউফের বিরোধিতা করেন, তারা মূলত ইলমে তাসাউফের অধিকারীগণের কাছ থেকে তাসাউফের মর্মার্থ বুঝেননি অথবা কোনো ভণ্ড ব্যক্তির নিজস্ব অস্বাভাবিক কাজকর্মে তাসাউফের লেভেল দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

সারকথা, এই ইলমের গবেষকদের মতে সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এমন দুটি রিপু, যা মানুষের আত্মায় আরও বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির জন্ম দেয়।

প্রতিপত্তির লোভের বেশ কয়েকটি ধরণ হতে পারে। যার মধ্যে সবচে নিকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে—কারও মধ্যে অমুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও পছন্দনীয় হওয়ার মানসিকতা তৈরি হওয়া অথবা তাদের কাছে স্বীয় কাজের প্রশংসার মানপত্র বা প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নিজের মধ্যে তৈরি করা। বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসক ও নেতৃত্বস্থানীয় লোকেরা ভয়াবহভাবে এ ধরনের

---

[১১৫] পদমর্যাদার লোভ।

Scanned by CamScanner

অসুস্থতার শিকার। এমনিভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের এমন একটি দল যারা ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে পশ্চিমা সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত, আত্মমর্যাদাবোধের অভাবে মানসিকভাবে পরাজিত হয়ে পড়ছে। তারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের প্রতিটি চালচলন এ ধরনের মানসিকতার সাক্ষর বহন করে।

মুসলিম শাসকদের শাসনকার্য পরিচালনায় তাদের প্রতিটি মুহূর্তই এই চেষ্টায় অতিবাহিত হয় যে, কীভাবে এই অদৃশ্য শক্তিকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখা যায়; যাদের হাতে তাদের ধারণা অনুযায়ী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের তাবৎ ক্ষমতা বিদ্যমান। অথচ এসব অদৃশ্য শক্তির জনকেরা এদের সেবায় প্রীত হলেও নিজেদের ইহকালীন স্বার্থে পরকালকে বিকিয়ে দিতে দেখে তাদেরকেই বোকা হিসেবে ভাবে।

পশ্চিমা সভ্যতা প্রভাবিত উন্নত প্রজন্মের মধ্যেও এ প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, কীভাবে যুগের সাথে খাপ খাইয়ে নিজেদের সবসময় 'আপ টু ডেট' রাখা যায়। অথচ পশ্চিমা সভ্যতার নীতিনির্ধারকরা ওদের শুধু নিজেদের তুরুপের তাস মনে করে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আড়ালে একটি কার্টুনচরিত্র মনে করে।

শুধু মুসলমানদের মধ্যে কেন খোদ পশ্চিমা দেশগুলোতে; যেগুলো ইহুদি রীতিনীতি-কৃষ্টিকালচারে পরিপূর্ণ, সেখানেই কোনো ব্যক্তির উপর তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চিন্তা-চেতনা এবং মানসিকতা ইহুদিবাদের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়।

মূলকথা, তাদের দৃষ্টিতে কারও গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হওয়া। চাই সে নিজেদের বংশোদ্ভূত হোক অথবা অন্য বংশের। এটা একটি স্পষ্ট বাস্তবতা; কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন ইমানি শক্তি নেই, যা মাটির শরীরকে নুরানি গুণে গুণান্বিত করতে পারে। ভালোবাসার এমন শক্তিও নেই, যা নিচুকে উঁচুতে পরিণত করতে সক্ষম। তাই আমরা এসব স্পষ্ট বিষয়গুলোকে বুঝেও বুঝি না।

বর্তমানে অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত মুসলমানদের এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝানোর সময় এসেছে যে, আমাদের নিজেদের মর্যাদার মাপকাঠি অন্যদের কাছ থেকে অর্জনকৃত সার্টিফিকেটে নয়; বরং আমাদের মর্যাদার মাপকাঠি নিজেদের আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে স্বকীয়তা ও স্বাবলম্বিতা অর্জন করা। আর এই

Scanned by CamScanner

আত্মমর্যাদাবোধ পশ্চিমা সভ্যতার প্যান্ট এবং বুটজুতার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়; বরং তা অর্জনের একমাত্র উপায় সুন্নাতে নববির অনুসরণ।

'পোক বার্নাডাট'-এর কথাই আলোচনা করা যাক। ইউরোপের অধিবাসী এই ব্যক্তিটি নিজের শিক্ষাজীবনে স্কাউট দলের লিডার ছিল। নিজের উদ্যমী কার্যক্রম ও মেধার মাধ্যমে সে সুইডেনের রেডক্রসের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে ইহুদিদের জন্য অবিস্মরণীয় সেবা দান করেছিল। যখন জার্মানিতে নাজি বাহিনী ইহুদিদের উপর চরম অত্যাচার করছিল, তাদের জেলখানা থেকে ইহুদিদের নিজের জীবনবাজি রেখে এ ব্যক্তিটি উদ্ধার করেছিল। সে ইহুদিদের নির্যাতিত মনে করতো। এ জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে ইহুদিদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিত। আর এভাবেই ইহুদিদের সামনে সে সম্মানিত হয়ে ওঠে এবং অ-ইহুদি ওই একজন ব্যক্তিকে তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে শুরু করে। তখন হয়তো সে ভাবতেও পারেনি যে, এই মানবতার অভিনয়কারী ইহুদি সম্প্রদায়ই একদিন তার পিছনে লেগে তার জীবন নিয়েই ক্ষান্ত হবে।

২০ মে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে এই ব্যক্তিকে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ইসরাইল ও আরবদের মাঝে সালিশ[১১৬] হিসেবে প্রেরণ করা হয়। তাকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করায় ইহুদিরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে এবং তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। শান্তিপ্রিয় মানসিকতার বার্নাডাট উগ্র মানসিকতার ইসরাইলি ও নিরীহ ফিলিস্তিনিদের মধ্যকার অসম যুদ্ধে বিচলিত হয়ে পড়ে। ইসরাইলি সৈন্যদের হিংস্রতা থামাতে সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। ফিলিস্তিনের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ১৫ সেপ্টেম্বর বার্নাডাট প্রস্তাব উত্থাপন করে। তার সেই প্রস্তাবনায় নিজের নিরপেক্ষ ও শান্তিপ্রিয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ছিল। কিন্তু তার এই শান্তিপ্রিয় প্রস্তাবনা 'এবং তারা মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করে তাদের হত্যা করে'[১১৭]—এই আয়াত অনুসারে তার মৃত্যুর পরোয়ানা হিসেবে সাব্যস্ত হয়। তার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল—'যদি মানবতার নামে জায়নবাদীদের ফিলিস্তিনে একটি ভূখণ্ডও দেওয়া হয়, তাহলে এর সাথে ফিলিস্তিনিদের সামনে দুটি প্রস্তাবনা রাখা যেতে পারে। প্রথমত ভবিষ্যতে তারা যখন চাইবে তাদের এসব ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

---

[১১৬] সমাধানকারী।

[১১৭] সুরা আলে ইমরান : আয়াত-২১।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়ত যদি তারা ভবিষ্যতে কখনো চায় ইসরাইলের দখলদাররা তাদের দখলকৃত জায়গার সময়োপযোগী বিনিময় প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।'

সারকথা, সেই প্রস্তাবনায় ফিলিস্তিনিদের জন্য ভবিষ্যতে যেকোনো সময় নিজেদের ভূমিতে ফিরে আসা বা নিজেদের ভূমির ন্যায়সঙ্গত মূল্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তার দাবি করা হয়েছিল।

এখানে আমরা এটা আলোচনা করছি না যে, তার প্রস্তাবনায় মুসলমানদের প্রতি কোনো বৈষম্য করা হয়েছিল কি না! ভাবার বিষয় হচ্ছে, এই লোকের অতীত কর্মকাণ্ড দেখে কেউ এ কথা ভুলেও ভাববে না যে, এই ব্যক্তি কখনো ইহুদি-বিরোধী কোনো পরিকল্পনা করতে পারে। কিন্তু যে একক ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় রক্তাক্ত অবস্থায় প্রায় ২০ হাজারের অধিক ইহুদিকে হিটলারের বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছিল, এই প্রস্তাবনার দ্বিতীয় দিনই ইহুদিরা তাকে হত্যা করে। আর তাকে হত্যা করা সাধারণ ইহুদিদের প্রস্তাবে নয়; বরং ইহুদিদের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে করা হয়েছিল। সাধারণ কোনো ইহুদির আদেশে নয়, শীর্ষস্থানীয় ইহুদি নেতা ইসহাক শিমরের আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। আর এভাবেই স্কাউট গ্রুপলিডার থেকে রেডক্রসের শীর্ষস্থানে পৌঁছা ব্যক্তি, যাকে তারা নিজেদের ত্রাণকর্তা ভাবত; তাকেও তারা হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

হে প্রিয়, এই হচ্ছে কাফিরদের ইতিহাস এবং তাদের মেধাশক্তি। তাদের চোখে নিন্দনীয় এ ধরনের কাজ করা বন্ধ করে দিলে হয়তো আমরা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারি—এ ধরনের মানসিকতা পোষণ করা আমাদের ভুল। তাদের দৃষ্টিতে আমাদের সম্মান অর্জনের একটাই পথ, আর তা হচ্ছে—নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধের সাথে অর্জন করা স্বকীয়তা। বাহ্যিকভাবে এ ধরনের লোকদের নিয়ে ওরা যতটাই ঠাট্টা করে; কিন্তু ভেতরগতভাবে এ ধরনের লোকের মাধ্যমেই ওরা প্রভাবিত হয় এবং অত্যন্ত ভীত থাকে।

সকল সম্মান ও প্রতিপত্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। সম্মানের এ দুটি মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে যে কেউ অন্য কোনো পন্থায় সম্মান খুঁজবে, তার অবস্থা ওই কাপুরুষদের মতই হবে, যারা স্পেনের পতনের পর জীবন বাঁচাতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করেছিল। নিজ ধর্ম ত্যাগ করে কুফুরি অবলম্বন করার চেয়ে একজন মুসলমান একজন কাফেরের আর কতটা অনুগত হতে পারে। কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এত কিছু করেও তাদের কাছ থেকে

Scanned by CamScanner

নিরাপত্তা পাওয়া যায়নি। খ্রিষ্টান সম্রাট ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলা তাদের জন্য 'ইনকুইজিশন' (Inquisition)-এর আইন প্রবর্তন করেছিল। তৃণমূল পর্যায়ে এই নতুন খ্রিষ্টানদের নিবন্ধন করা হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে ধর্মীয় আদালতের মাধ্যমে এদের ওপর নির্যাতন এবং পরিশেষে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এসব নতুন খ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতনের ফন্দি অবলম্বন করা হতো।

ওই সময়ে এদের উপর খ্রিষ্টানরা যত অত্যাচার করেছিল তা যদি আজ পাকিস্তানে অবস্থানরত খ্রিষ্টান ধর্মের আহ্বানকারী মিশনারিদের দেখানো হয়, তাহলে হয়তো লজ্জায় তাদের মুখ লুকানোর জায়গা থাকবে না। হতভাগা এসব মুসলমানদের ঘরবাড়ি এবং সব সম্পত্তি গির্জার নামে উৎসর্গ হয়ে যেত। আর অর্থলোভী পাদরি নামের পশুরা এসব সম্পত্তির লিপ্সায় নিরপরাধ নতুন খ্রিষ্টবাদে দিক্ষীত মুসলমানদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার শাস্তি দিত। অথচ ধর্ম পরিবর্তনে তারা স্বেচ্ছায় আগ্রহ দেখিয়েছিল। আর এ কারণেই স্পেনের খ্রিষ্টান গির্জাগুলো পৃথিবীর সবচে ধনী উপাসনালয়। কেননা, এসব উপাসনালয় স্পেনের প্রতিটি বড় শহরের হাজার হাজার মুসলমানদের ঘর-সম্পদের অধিকারী হয়েছিল।

স্পেন এবং পর্তুগালের দীর্ঘ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজ মুসলমানদের কোনো কবরস্থান দেখা যায় না। যদিও কর্ডোভা ও গ্রানাডার মুসলমানদের ৫০০ বছরের পুরাতন বিভিন্ন ঘরবাড়ি ও মসজিদ আজও বিদ্যমান রয়েছে; কিন্তু খ্রিষ্টানরা এসব নিজেদের মতো করে ব্যবহার করছে। মসজিদগুলোকে গির্জায় পরিণত করা হয়েছিল এবং ঘরবাড়িগুলোকে লোভী পাদরিরা নিজেদের করায়ত্ত করেছিল। আজও মারাকেশের সমুদ্র উপকূলে বসবাসরত মুসলমানদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের ছেড়ে আসা বাড়ি-ঘরের চাবি রয়েছে। স্পেনের সেসব বাড়িঘরে ফিরে যাওয়ার আশায় আজও তারা ত্রাণকর্তার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মুক্তিদাতা তো ওদের মধ্যে জন্ম নেবে, যারা মুক্তির আশায় আশান্বিত। কিন্তু আজ তো আমরা 'বেঁচে থাকাই বিজয়'—এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে বেঁচে আছি।

এসব ঘরবাড়িতে আজও ইনকুইজিশনের চিহ্ন বিদ্যমান। এসব চিহ্ন অবশ্যই আমাদের দেখা উচিত যারা মুসলমানদের সংকীর্ণমনা এবং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের উদারমনা ভাবছেন। এই চিহ্নগুলো দুই ধরনের হতো। তার মধ্যে একটি ছিল এমন চিহ্ন, যা দ্বারা বোঝানো হতো যে, এই ঘরের তল্লাশি নেওয়া হয়েছে।

Scanned by CamScanner

অন্য একটি চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হতো যে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার ফলে কেউ এসব ঘরে বসবাস করা বা ক্রয় করার দুঃসাহস দেখাতে পারত না। খ্রিষ্টান ধর্মীয় সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে লাগানো এসব চিহ্ন অনেক ধরনের শিক্ষণীয় বিষয়ের ধারক-বাহক হওয়া সত্ত্বেও রক্তাক্ত এসব উপাখ্যান থেকে উপদেশ অর্জন করার মতো সত্যিকারের মুসলমানের সংখ্যা অনেক কম; যদিও ভোগবাদী মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশি।

আজ থেকে দুই মাস পূর্বে ১০ জুলাই ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে গ্রানাডার আলহামরা প্রসাদের পার্শ্ববর্তী আল বাইস[১১৮] পাহাড়ের চূড়ায় ৫০০ বছর পর প্রতিষ্ঠিত প্রথম কোনো মসজিদে আজান দেওয়া হয়। সেই আজানের সুরলহরী কেমন যেন মুসলমানদের এই পয়গাম দিচ্ছে—আল্লাহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার পরিবর্তে কেউ যদি মানুষের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবে; যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে ফেরত আসতে সচেষ্ট না হবে। স্পেনের মুসলমানগণ তো নিজেদের পূর্ব অবস্থানে ফিরে যাওয়ার সফরকে আরম্ভ করেছে। মূলে ফিরে যাওয়ার এই মিশনে বুদ্ধিমত্তার সাথে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান তাদের সফর আরম্ভ করবে?

[১১৮] মূল আরবি নাম আল বায়াদিন।

Scanned by CamScanner

# বিচ্ছুর চক্রান্ত

জীববিজ্ঞানীগণ বিচ্ছুর ব্যাপারে একটি আশ্চর্যজনক তথ্য দেন। বিচ্ছুর জন্ম তাদের স্বভাবগত ক্ষতিকারক সত্তাকে প্রকাশ করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সারাজীবন যেমন তারা আল্লাহর বান্দাদের দংশন করতে থাকে ঠিক তেমনিভাবে জন্মের সময় অন্যান্য প্রাণীর মতো জন্ম নেওয়ার পরিবর্তে নারী বিচ্ছুর পেট বিদীর্ণ করে তাদের জন্ম হয়। অকৃতজ্ঞতার এই ধারাবাহিকতায় সারাটি জীবন সে এভাবেই অন্যান্যদের দংশন করে যেতে থাকে। মানবিক চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে গেলে ইহুদি ও হিন্দু—এই দুটি জাতিকে দুটি রঙয়ের একজোড়া বিচ্ছুর মতো মনে হয়। মার্কিনীরা ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষায় এমন জঘন্য অমানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যার কারণে পৃথিবীব্যাপী তাদের ঘৃণ্য দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু এর বিনিময়ে ইহুদিরা তাদের সাথে কী আচরণ করেছে—এই চমৎকার আলোচনাকে আমরা 'অপারেশন সুজনা' (Operation Sujna) বা 'লিবার্টিতে হামলা' শিরোনামে করতে পারি।

গত শতকের ষষ্ঠ দশকে যখন ইহুদি রাষ্ট্র নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে, ঠিক তখনই মিসরে জিহাদ ও ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়ার এক নতুন বিপ্লব আরম্ভ হয়। এ বিপ্লবে ভীতসন্ত্রস্ত ইহুদিরা নিজেদের মিসরের সাথে টক্কর দেওয়ার সাহসিকতা না থাকায় আমেরিকাকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করে। এই উদ্দেশ্যে তারা নির্দিষ্ট বিরতিতে দুটি অমানবিক জঘন্য নোংরা প্রতারণার আশ্রয় নেয়। তন্মধ্যে একটি ছিল 'অপারেশন সুজনা'; যা ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। ইসরাইল সরকারের পক্ষ থেকে এটি একটি পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদের ষড়যন্ত্র ছিল। সে-মতে মিসরে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের হত্যা করা ও মার্কিন স্থাপনাসমূহে গোপনে হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্তের সাহায্যে এসব হামলা মিসরিদের কর্তৃক

Scanned by CamScanner

সংঘটিত হয়েছে; তা প্রমাণের প্রস্তুতিও নেওয়া হয়। যেন এর ফলে মিসর ও আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা জর্দান নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে পারে। যেমনটি তারা কান্দাহার ও কাবুলের পতনে করেছিল। ইহুদি এজেন্টরা আদেশ পেয়েই তৎপর হয়ে ওঠে। তারা কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় মার্কিন স্থাপনা ও লাইব্রেরিসমূহকে সফলভাবে বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।[১১৯]

কিন্তু মিসরে অবস্থিত আমেরিকান সিনেমা হল 'মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার' (Metro-Goldwyn-Mayer)-এ বোমা বিস্ফোরণ করার পূর্বেই বোমাটি ওই ইসরাইলি এজেন্টের হাতেই বিস্ফোরিত হয়, যে এই বোমা বিস্ফোরণের দায় মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল। বোমা বিস্ফোরণকালে ইসরাইলি এজেন্ট হাতেনাতে গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ মিসরজুড়ে তোলপাড় শুরু করে। অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীবাসী ইসরাইলিদের নীচতা ও অমানবিকতা প্রত্যক্ষ্য করে, যারা নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানি দেওয়ার জন্য নিজেদের একান্ত বন্ধুদের হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। নিশ্চয়ই এটি ছিল ভয়ংকর ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা। হাতেনাতে ধরা পড়ার এ ঘটনায় মিডিয়ার তোলপাড়ে শেষ পর্যন্ত ইসরাইলের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিনহাস লিওন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[১২০]

পরবর্তীতে এই ঘটনা 'লিওন ঘটনা' নামে ইনসাইক্লোপিডিয়া ইন্‌কারটাতে স্থান করে নেয়। ইহুদি প্রভাবিত তথ্যপ্রবাহে এ ঘটনাটিও কিছুটা বিকৃতির শিকার হয়। সেখানের বিবরণটি লক্ষ্য করুন, বেন গোরিয়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিনহাস লিওনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। যিনি মিসরের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক সাবোটাজ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পদত্যাগ করেন।[১২১]

এখানে দেখুন, এই লেখক ও সাংবাদিকরা কীভাবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংবাদ বিকৃতির আশ্রয় নেয় এবং মূল বক্তব্যকে কীভাবে বিকৃত করে। 'এনসাইক্লোপিডিয়া এনকারটা' (Encyclopedia Encarta)-এর এই দ্বিতীয়

---

[১১৯] পাঠক এখানে পৃথিবীব্যাপী মার্কিন নাগরিক ও তাদের স্থাপনার ওপর কৃত হামলাসমূহকে মাথায় রাখতে পারেন।

[১২০] সে এতটাই প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল, যার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য David Ben-Gurion-এর মতো কট্টর জায়নবাদী নেতাকে প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসতে হয়।

[১২১] এনসাইক্লোপিডিয়া এনকারটা ২০০১, বেন গোরিয়ান।

Scanned by CamScanner

বিবরণটি এমন হওয়া উচিত ছিল, 'পিনহাস লিওন, যাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কেননা, তাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় হাতেনাতে ধরা হয়েছিল। ইসরাইলের দুশমনদের বিরুদ্ধে সে আমেরিকাকে ব্যবহার করতে এমনটি করেছিল।'

এই ব্যর্থ অভিযানে ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে আমেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে স্পষ্ট জড়িত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলেও আমেরিকা এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এমনকি তেলআবিবের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা তো দূরের কথা; বরং তাদের জন্য কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র সাহায্য বৃদ্ধি করে।

বিচ্ছু কখনো তার জন্মগত দংশনের অভ্যাস ছাড়তে পারে না—এর দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে 'লিবার্টি' হামলা। 'ইউ.এস লিবার্টি' আমেরিকান বৃহৎ রণতরী, যা ১৯৬৭ সালের ছয় দিনব্যাপী চলমান যুদ্ধে ইসরাইলের সাহায্যার্থে লোহিতসাগরে টহল দেয়। ৮ জুন ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বাহ্যিকভাবে নিজেদের পতাকার চিহ্নকে মুছে দিয়ে বেশ কয়েকটি ইসরাইলি যুদ্ধ বিমান এই রনতরীর ওপর বোমা হামলা করে। সাথে সাথে পরিচয়বিহীন কয়েকটি টর্পেডো নৌযান নিজেদের ত্রাণকর্তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে ৩৪ জন মার্কিন নাগরিককে হত্যা করে। সেই হামলায় প্রায় ১৭৪ জন মার্কিনী আহত হয়।

ইহুদিরা এই হামলায় সর্বপ্রথম রণতরীর রেডিও এন্টেনাকে লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণ করে, যাতে আমেরিকান ষষ্ঠ নৌবহরে এ সংবাদ না হয় যে, এই হামলা তাদেরই প্রতিপালিত ইহুদি-নামক বিচ্ছুরা করেছে। চিহ্নবিহীন বিমানগুলো নিজেদের হেফাজতকারীদের লক্ষ করে ততক্ষণ পর্যন্ত বোমা বর্ষণ করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়। আর টর্পেডো নৌযানের মাধ্যমে বেঁচে থাকা পলায়নরত অবশিষ্ট মার্কিন সৈন্যদেরও হত্যা করা হয়। ইসরাইলি নৌযানগুলোতে মোতায়েন মেশিনগানের গুলিগুলো মার্কিনীদের বেধড়কভাবে হত্যা করতে থাকে; যেন পৃথিবীবাসীকে এর সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করার মতো কোনো সদস্য জীবিত না থাকে আর এ হামলার দায়ভার মিসরের উপর চাপিয়ে দিয়ে মিসরের উপর আমেরিকাকে লেলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ইসরাইলি বাহিনী নিজেদের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার তৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল আর এদিকে রণতরীর ক্যাপ্টেন ও তার সহযোগীরা এমন অবিশ্বাস্য সাহসিকতা ও মেধার পরিচয় দেন; যার ফলে ইসরাইলিদের অপতৎপরতা নস্যাৎ হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

তারা সবাই মিলে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জাহাজকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করে ধীরে ধীরে চালিয়ে নেয়; ততক্ষণে নিজেদের মূল নৌবাহিনীর সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়। তারা তাদের হাইকমান্ডকে এ কথা নিশ্চিত করে যে, এই হামলা মিসর থেকে নয়; বরং তাদের প্রতিপালিত বিচ্ছু ইসরাইলই করছে।

লিবার্টির ক্যাপ্টেনের দায়িত্বশীলতা ও সাহসিকতা ইসরাইলের এই দুরভিসন্ধিকে নস্যাৎ করে দেয়। যার ফলে ইহুদিদের দু-দুটি ধোঁকামূলক পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। যুদ্ধবিমান খুব কাছ থেকেই রণতরীর উপর হামলা করেছিল এবং পাইলটরা তাদের দিকে এমনভাবে বন্ধুত্বসুলভ হাত নাড়ছিল, যেন তাদের সন্দেহ না হয়—কারা হামলা করছে। কিন্তু যখন তাদের এই অপতৎপরতার তথ্য প্রকাশ হয়ে যায়, তখন তারা তাদের চিরাচরিত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এ কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে যে, পরিচয়গত ভুলের কারণে এই হামলা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন আমেরিকান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেন রিস্ক এবং 'চেয়ারম্যান জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ' এডমিরাল থমাস মুর স্পষ্টভাবে বলেছিল, 'এই হামলা কোনো ধরনের ভুল নয়; বরং ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছিল। আর তা এ জন্য যে, হামলার সময়-পরিবেশ দিনের অত্যন্ত আলোকিত সময় ছিল। রণতরীতে আমেরিকান পতাকার পাশাপাশি জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতীক ও সংখ্যা স্পষ্টভাবেই লেখা ছিল।' কিন্তু আমেরিকার ইহুদি মিডিয়া এ হামলার ব্যাপারে কোনো ধরনের তৎপরতা দেখায়নি; বরং তারা 'বাস্তবতার কাছাকাছি' অযুহাতেই ভুল বোঝাবুঝির সেই দাবিকে মেনে নেয়।

উচ্চপদস্থ মার্কিন সরকারি কর্মকর্তাদের স্পষ্ট বিরোধ সত্ত্বেও ইহুদি লবি এই হামলার ন্যূনতম অনুসন্ধানও করতে দেয়নি। ঠিক এভাবেই আজ পর্যন্ত এমন কোনো স্পষ্ট গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যাতে এ কথা প্রমাণ করা সম্ভব যে, আফগানিস্তানের তৎকালীন সরকার আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলার অনুমতি দিয়েছে বা এ সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু এই জোড়া বিল্ডিংয়ে হামলার আধাঘন্টার মধ্যে একজন ইসরাইলি সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফগানিস্তানকে স্পষ্টভাবে নাম নিয়ে এই হামলার জন্য দায়ী করে। কোথায় আধাঘন্টা আর কোথায় ৩৫ বছর। লিবার্টিতে হামলার আজ প্রায় ৩৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে; কিন্তু এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য আজ পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি।

Scanned by CamScanner

আমেরিকান শাসনব্যবস্থায় ইহুদিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব কতটা, তার একটা নমুনা দেখা যাক। ইউ.এস লিবার্টির কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ম্যাককে ইসরাইলি হামলা চলাকালীন অবিস্মরণীয় সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য আমেরিকার সবচে সম্মানিত পুরস্কার 'কংগ্রেশনাল মেডল অব অনার' (Congressional Medal of Honor)-এ ভূষিত করা হয়। কিন্তু সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই পদক প্রদানের অনুষ্ঠানটি হোয়াইট হাউসে আয়োজন করার পরিবর্তে আমেরিকান নেভাল ইয়ার্ডে অনেকটাই চুপিসারে আয়োজন করা হয়। আর তা শুধু এ জন্যই, যেন এ আয়োজনের মাধ্যমে ৩৪ জন মার্কিন নাগরিকের হত্যাকারী এবং ১৭৪ জনকে আহতকারী নিষ্পাপ শত্রুদের! মানসিক যন্ত্রণা না হয়।

এই হচ্ছে সেই সত্য ও ন্যায়ের পথ, যা আমেরিকা পৃথিবীবাসীর ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। আমেরিকায় অবস্থানরত আরব, পাকিস্তানি ও অন্যান্য মুসলমানদের বাকস্বাধীনতা হরণকারী আমেরিকান জনগণ ও শাসকদের এ কথা ভাবা উচিত যে, আমেরিকান স্বার্থে এত জঘন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার পরেও যেসব আমেরিকান ইহুদি ইসরাইলের সাথে কথা বলছে, তারা কি আমেরিকার সাথে গাদ্দারি করছে না? ইসরাইলকে সহযোগিতাকারী ইহুদিরা কি আমেরিকার দৃষ্টিতে দেশদ্রোহী নয়? এমন রক্তাক্ত ঘটনার পরেও যদি কোনো আমেরিকান শাসক বা নাগরিক মুসলমানদের আমেরিকা-বিদ্বেষী এবং ইহুদিদের দেশপ্রেমিক স্থায়ী নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে, তাহলে বিচ্ছুর দংশন হতে ওদের কে রক্ষা করবে?

ইহুদিদের সাথে আমাদের এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব এবং তার প্রেক্ষিতে ওদের কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করেও যদি বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে ওদের সাথে আমরা সুন্দর সম্পর্ক বহাল রাখতে চাই, তাহলে এত বড় পৃথিবীতে আমাদের আশ্রয় এবং সহযোগিতা করার মতো আর কেউ থাকবে না।

Scanned by CamScanner

# বহুরূপী ব্যক্তি

ইয়াহইয়া আব্বাস ফিলিস্তিনের এমন একজন নাগরিক, যাকে নিয়ে ফিলিস্তিনের মায়েরা সর্বদা গর্ববোধ করতে পারে। তার বীরত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ফিলিস্তিনের যুবকদের শত্রুর সাথে টক্কর দেওয়ার মানসিকতা জাগিয়ে তুলেছিল। তার অনুসরণে ফিলিস্তিনি শিশুরা অভূতপূর্ব বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়। জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে ইয়াহিয়া আব্বাস এমন কয়েকটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, যা ইতোপূর্বে কারও অভিজ্ঞতায় ছিল না। তার অসাধারণ মেধা ও বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার বিভিন্ন আবিষ্কার ফিলিস্তিনের জিহাদকে অনেকটাই সমুন্নত করেছিল।

মূলত সে ছিল অতি সাধারণ একজন ফিলিস্তিনি যুবক। তার শিশুকাল ও যৌবনকালে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, তার মধ্যে এতটা নেতৃত্বগুণ ও মেধার সমাহার রয়েছে। কিন্তু একটি ঘটনা তার জীবনের গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়। আর এতেই ফিলিস্তিনের অলিগলিতে খেলাধুলা করা এই যুবকটি অসাধারণ সুন্দর চরিত্রের অধিকারী মুজাহিদ ও আত্মঘাতী হামলাকারীদের শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়, যা দেখে বন্ধুরা ঈর্ষান্বিত এবং শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

এটি আজ থেকে ১৫ বছর পূর্বে রমজানুল মোবারকের একটি ঘটনা, যা তার জীবনে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। তখন রমজানের মাত্র অর্ধেক অতিবাহিত হয়েছিল। যখন ফিলিস্তিনের মসজিদসমূহে মুসল্লিদের উপস্থিতি অন্যান্য সময়ের তুলনায় বহুগুণে বেড়ে চলছিল। ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক মসজিদে ইবরাহিমে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। মুসলমানরা যেহেতু কখনো ইহুদিদের উপাসনালয়ে হামলা করেনি তাই তারা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি যে, এই অভিশপ্তরা রোজাদার মুসলমানদের উপর মসজিদে হামলা করতে পারে। বাস্তবিক অর্থে তখনও মুসলমানরা ইহুদিদের উপর উল্লেখযোগ্য কোনো হামলা করেনি।

Scanned by CamScanner

তাকদিরের লিখন ইয়াহিয়া আব্বাসকে হয়তো সৌভাগ্যবান করে রেখেছিল। যার ফলে সে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি যুবকদের দৈত্যাকৃতির ট্যাংকের সামনে দাঁড় করিয়ে যুদ্ধের এমন গুরুত্ত্ব শিখিয়েছিল যা যুদ্ধশাস্ত্রের কোনো পুস্তকে লেখা হয়নি, কোনো সমরবিদের কল্পনা বা সিনা থেকে সিনায় চলে আসা রহস্যের দাবিদারদের রহস্যেও যার সন্ধান মেলে না। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো—

সেদিন মুসল্লিভরা মসজিদের কাতারের ভিতর এক কট্টরপন্থী ইহুদি প্রবেশ করেছিল। আর সে ইহুদিদের এমন দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের গায়ে তিন দিনের পুরানো পচা মাছের গন্ধ থাকত। তারা জংলি গাধার চেয়েও মোটা বুদ্ধির অধিকারী হতো। যাদেরকে সাধারণ ইহুদিরাও ভয় পেত। ইহুদি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও মুসলমানদের অসহায়ত্ব যেন এদের উগ্রতাকে দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছিল। সে মসজিদে প্রবেশ করেই উল্টাপাল্টা ফায়ারিং শুরু করে। চোখের পলকে কয়েকজন নামাজি শাহাদাতবরণ করেন এবং অসংখ্য আহত-রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। মসজিদের মেঝে রক্তে ভেসে যায়। তারা বুঝে উঠতে পারেনি হঠাৎ এই বিপদ কোথা থেকে এল এবং হিংস্র ইহুদির মাথায় কী ভুত চাপল! মসজিদচত্বর পশু জবাই করা স্থানের মতো রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। সবার চোখেই দুঃখ ও শোকের ছায়া দৃশ্যমান ছিল; কিন্তু একজন যুবক এমন ছিল, যার চোখে শোকের পরিবর্তে গাম্ভীর্য ও ক্রোধের অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। আর এই যুবকটিই ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাস।

অসহায়ত্বের অগ্নিদহনে তাৎক্ষণিক তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই উম্মাহকে আর ইহুদিদের করুণার পাত্র করে রাখা যায় না; বরং এমন কিছু করে দেখানো উচিত, ভবিষ্যতে কোনো ইহুদি মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশ করার দুঃসাহস দেখাতে না পারে। নিজস্ব একক চিন্তা নিয়েই তিনি বের হয়ে পড়েন। মহান আল্লাহ তাঁর এই চেতনার মূল্য এভাবে রেখেছিলেন যে, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান পর্যন্ত তাঁর ভয়ে কম্পমান ছিল। তার আক্রমণগুলো এতটাই আকস্মিকভাবে ভয়ংকর গোপনীয়তায় সামনে আসত যে, ইহুদি সাহিত্যিকরা তাঁর ব্যাপারে উপন্যাস রচনা করে তাঁকে নিজেদের সাহিত্যের ভিলেনরূপে চিত্রায়িত করতো। তাঁর ব্যাপারে তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধি ছিল যে, তিনি হাজার রূপ ধারণ করে একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু কীভাবে এবং কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর কারও কাছে থাকত না। তাঁর আরেকটি বড় যোগ্যতা ছিল, নিজের এসব কৌশল সহজেই নিজের শিষ্যদের রপ্ত করিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর হাতেগড়া শিষ্যরা

Scanned by CamScanner

ইসরাইলের বিভিন্ন প্রান্তে এমন কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেছিল, যা ইসরাইল রাষ্ট্রের ভিত হেলিয়ে দেয়। তাদের ভীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, একসময় ইসরাইল এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে—যারা ইয়াহিয়াকে দেখেছে বা তাঁর ব্যাপারে শুনেছে অথবা তাঁর ব্যাপারে কোনো সংবাদ জানে।

ইসরাইলি বাহিনী তাকে গ্রেফতার করতে না-পারাটা নিজেদের কত বড় পরাজয় হিসেবে দেখত, তা তৎকালীন ইসরাইল গোয়েন্দা বাহিনী প্রধান ইয়াকুব বেবারসের এই বক্তব্যে ফুটে ওঠে, যা তার বিরুদ্ধে একবার ব্যর্থ গ্রেফতার অভিযান পরিচালনার পর দিয়েছিল। 'ব্রিজেট ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি' (Bridget Electric Engineering University) থেকে পড়াশোনার পর উচ্চশিক্ষার জন্য ইয়াহইয়া জর্দান যেতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন জয়নবাদীরা তার ভিসার আবেদন ফিরিয়ে দিয়েছিল। এখানেই ইঞ্জিনিয়ার ইয়াহইয়ার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সমাপ্তি ঘটে এবং তিনি নিজের কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পরবর্তী জীবনে এসে ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের হয়ে তিনি এমনসব সাহসী প্রদর্শনী করেন, যা দেখে ইসরাইলের গোয়েন্দা-বিভাগের প্রধান এ কথা বলতে বাধ্য হয়—'যদি আমরা আগে বুঝতে পারতাম, তাহলে তাঁকে বিদেশে চলে যাওয়ার জন্য শুধু ভিসা নয়; সাথে ১ লাখ ডলারও দিতাম।'

যুদ্ধের ময়দানে যখন ইয়াহিয়া আব্বাস পা রাখেন তখন ইসরাইল ও ফিলিস্তিন যুদ্ধে ইসরাইলের পাল্লা অস্বাভাবিকভাবে ভারি ছিল। শুধু বিশ্বময় তাদের সমর্থন ও নিজেদের অস্ত্রসম্ভারের কারণেই নয়; বরং বড় কারণ ছিল যে, তাদের নাগরিকরা ছিল সুরক্ষিত; অন্যদিকে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের কোনো আশ্রয়স্থল ছিল না। ইসরাইল সরকার আগ্রাসী ইহুদিদের বসতিগুলোকে এমনভাবে নির্মাণ করেছিল, ইহুদি গোয়েন্দাদের মতে তা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সেখানে বসবাসরত ইহুদিরাও নিজেদের পরিপূর্ণরূপে সুরক্ষিত মনে করতো এবং তাদের এই সুরক্ষিত হওয়ার দাবিতেই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদিরা সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ হতো। অন্যদিকে স্থানীয় মুসলমানগণ দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হতেন। এই অবস্থা যদি ধারাবাহিকভাবে আরও চলতে থাকত, তাহলে মুসলমানগণ হয়তো নিজেদের মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলতেন এবং শত্রুদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতেন।

Scanned by CamScanner

ঠিক তখনই ইয়াহইয়া আব্বাস আত্মপ্রকাশ করেন এবং ফিলিস্তিনের মুজাহিদদের মাধ্যমে আত্মঘাতী হামলার এমন নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন যা জিহাদের ময়দানে এক নতুন অধ্যায় রচনা করে। একদিকে যেমন তার এ ধরনের সাফল্য মুজাহিদদের মধ্যে জিহাদের চেতনাকে তীব্র করে অন্যদিকে শত্রুদের পরাজয়ের অনলে দগ্ধ করে।

জায়নবাদী নীতিনির্ধারকরা আজ পর্যন্ত নিজেদের পারস্পরিক আলোচনায় এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইয়াহইয়া আব্বাসের রণকৌশল তাদের অনেক পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল এবং তার কৌশলের সামনে তাদের ক্ষতির মাত্রা এত বেশি ছিল যার ক্ষতিপূরণ হয়তো দাজ্জাল আসার পূর্বে আর সম্ভব হবে না। ইয়াহইয়া আব্বাসের আক্রমণের চমৎকার দিক ছিল এটি যে, তিনি যুদ্ধকে ইহুদিদের দোরগোঁড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার এমন অনুভূতি জাগিয়েছিলে, যা অন্যান্য ইহুদিদের ইসরাইলে আসতে নিরুৎসাহিত করে। এর জন্য তার বিভিন্ন উদ্ভাবিত কৌশলের দৃষ্টান্ত যুদ্ধের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না। গেরিলা-যুদ্ধের একটি নতুন পদ্ধতি ফিদায়ি হামলাকে তিনি পৃথিবীবাসীর সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যার মাধ্যমে তাঁর অর্জনকৃত আশ্চর্যজনক সফলতাগুলোর সামনে প্রসিদ্ধ ইহুদি এজেন্ট কর্নেল লারনসের 'সফলতার মূলনীতি সপ্তক' অত্যন্ত মলিন মনে হয়।

তার আবিষ্কৃত এসব আত্মঘাতী হামলা-পদ্ধতি জিহাদি চেতনার এমন তীব্রতা দান করতে সক্ষম হয়েছিল যে, হজরত মাহদির আগমনের জন্য অসহায়ভাবে অপেক্ষমাণ ব্যক্তিরাও আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আসতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

ইয়াহইয়া আব্বাস ও তার সহযোদ্ধাদের জন্য আত্মঘাতী হামলা এমন এক সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বহাল থাকবে, যতদিন পর্যন্ত ইসলামি শক্তি দাজ্জালকে পরিপূর্ণ নিশ্চিহ্ন না করে দেবে। ইয়াহিয়া আব্বাস দুরন্ত সাহস এবং স্পষ্টভাষী হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত সতর্ক যোদ্ধা ছিলেন।

কৌশলী হওয়ার পাশাপাশি সর্তক হওয়া এমন একটি বিশেষ গুণ, বর্তমানে বিভিন্ন গোপনীয় মিশন বাস্তবায়নে অবস্থানরত মুজাহিদদের মধ্যেও যার চরম অভাব দেখা যায়। তিনি তার জিহাদি পরিকল্পনাগুলোকে অত্যন্ত গোপন রাখতেন; কিন্তু এসব ব্যাপারে কোনো ধরনের শিথিলতা বা ত্রুটি সহ্য করতেন না। গোপনীয়তা এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের গোপনীয়তা তার ব্যক্তিত্বের সাথে

Scanned by CamScanner

পরিপূর্ণভাবে মিশে ছিল। কৌশলের সাথে গোপনীয়তার এতটাই লক্ষ্য রাখতেন যে, তাঁর কাছের কেউও জানতে পারত না—কখন, কোথায়, কোন্‌রূপে তিনি উপস্থিত হবেন।

তাঁর বিভিন্ন রহস্যজনক ঘটনাবলি ধীরে ধীরে ইহুদি সাহিত্যিকদের লেখালেখির আকর্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়। এসব লেখকরা তার বীরত্বের উপাখ্যানকে ইসরাইলি সাহিত্যের রূপকথার পর্যায়ে নিয়ে ঘটনায় রঙ চড়িয়ে তাকে এক অলৌকিক সত্তার চরিত্রে উপস্থাপন করে। তার বীরত্ব ও গা ছমছমে বিভিন্ন কাহিনি লিখে ইহুদি সাহিত্যিকরা অনেক প্রসিদ্ধি ও অর্থ উপার্জন করে।

ইয়াহিয়া বিভিন্ন বেশ ধারণে পারদর্শী ছিল। তাঁর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, তাঁর একাধিক পরিচয়পত্র ও কয়েকটি পাসপোর্ট ছিল। তিনি একই সময়ে কয়েকটি জায়গায় উপস্থিত থাকতেন। জনশ্রুতির ভিত্তিতে এসব ছিল লেখকদের কল্পনা। অন্যথায় একজন মানুষ কীভাবে একসাথে একাধিক স্থানে থাকতে পারে? বাস্তবে তিনি যেসব আকৃতি ধারণ করতেন, হয়তো এসব আকৃতির একাধিক লোক বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করার কারণে গুপ্তচরদের এটা নির্ণয় করতে কষ্ট হতো—আসল ইয়াহইয়া কে!

দেখা যেত যখন কোনো গুপ্তচর এই সংবাদ দিত—ইয়াহইয়া নীলনদের পাড়ে অমুক রেস্টুরেন্টে কারও অপেক্ষা করছেন। ঠিক তখনই দেখা যেত অন্য কোনো গোয়েন্দার কাছ থেকে এ তথ্য আসত—তিনি অল্প কিছুক্ষণ পর ত্রিপোলি ইয়ারপোর্ট থেকে সুদানগামী বিমানের বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করছেন। এসব বিভ্রান্তিকর তথ্য ইসরাইলি গোয়েন্দা বাহিনীকে ধূম্রজালে রাখত।

সবচে মজার বিষয় হচ্ছে, তাঁর মধ্যে বহুরূপ ধারণের সক্ষমতা এতটাই বেশি ছিল যে, যখন তিনি ইহুদি বসতির পাশে ঘোরাফেরা করতেন, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারত না—পূর্ণাঙ্গ ইহুদি ধর্মীয় পণ্ডিতরূপি এই ব্যক্তিটি মূলত হামাসের এমন মুজাহিদ; যে কিনা তাদের শহরে হামলার উপযুক্ত স্থানের খুঁজে ঘোরাফেরা করছে। অন্যদিকে যখন তিনি ইহুদি বণিকের বেশে হাইফা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতেন তখন ঘুণাক্ষরেও কেউ ধারণা করতো না যে, ব্যবসায়ী বেশে এই মুজাহিদ কী উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে আসা-যাওয়া করছেন।

তার ব্যাপারে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী 'ইজাক রবিন' (Yitzhak Rabin) পর্যন্ত এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, 'আমার তো ভয় হয়, এই ইঞ্জিনিয়ার কখন

Scanned by CamScanner

আমাদের পার্লামেন্টে চলে আসে।' প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলতে বাধ্য হয় যখন একবার ইসরাইলি কূটনীতিকের বেশে ইয়াহইয়া আব্বাসকে রাজধানী তেলআবিবে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার জন্য তো এটা সম্ভব ছিল না যে, প্রত্যেক বিদেশি কূটনীতিককে ধরে এ কথা জিজ্ঞেস করবে—'আপনি তো ইয়াহইয়া আব্বাস নন?'

শহিদ ইয়াহইয়া আব্বাসকে মহান আলাহ তাআলা রহমতের সাগরে অবগাহিত করুন। মুজাহিদদের জন্য তিনি যেসব চমৎকার পন্থা আবিস্কার করে গিয়েছিলেন, তার মাধ্যমে আল্লাহ মুজাহিদদের আরও এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দিন এবং জিহাদের ময়দানে এসব কর্মকাণ্ডকে তাঁর জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন।

Scanned by CamScanner

# ফ্ল্যাশ পয়েন্ট

- আপনি সেই ব্যক্তি, যে *বোলতে নকশে*[১২২] (কথ্যচিত্র) লেখেন?

- ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে চিনতে পারছি না। আর এমনিতে মানচিত্র লেখা হয় না; বরং আঁকা হয়।

- আমার জানা আছে, আপনি এভাবে কথা ঘুরিয়ে দেন। আচ্ছা, আপনার লেখার জন্য কি শুধু একটা বিষয়ই; অর্থাৎ, ফিলিস্তিনের ব্যাপারটিই রয়েছে?

- হ্যাঁ, আমার জানামতে এখানের যুদ্ধের লেলিহান শিখাই ভবিষ্যতে 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে'র রূপ ধারণ করবে। ফিলিস্তিনই হবে সেই যুদ্ধের পটভূমি; যে যুদ্ধের প্রারম্ভিকা আজ ইহুদিরা করছে।

- কী অর্থ?

- এর অর্থ হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে একধরনের অস্থিরতা ও দখলদারিত্বের বাসনা তৈরি হবে, যার ফলে সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। সকল আরব রাষ্ট্র বিশেষ করে মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের উপর কর্তৃত্ব পাওয়ার জন্য ইসরাইল পাগলপারা হয়ে উঠবে। যেন 'জিওন' পাহাড়ে দাউদি পতাকা এবং সুলায়মানি কাঠামোতে নির্মিত সিংহাসনে দাজ্জালকে অধিষ্ঠিত করতে পারে। শুধু কিয়ামাতের পূর্বকার একটি বৈশ্বিক ঘটনার অপেক্ষা, যার পরে দাজ্জালের আগমন পরবর্তী 'প্রেস কনফারেন্স' সমগ্র পৃথিবীতে সম্প্রচারের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে; যা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে সম্প্রচারিত হবে। আর সেই ঘটনার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পৃথিবীব্যাপী ইসরাইলি একক কর্তৃত্বের সূচনা হবে। আর সেই কাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি হচ্ছে, প্রাচীন ভূমিতে দাজ্জালের উপাসনালয় তৈরি করা।

'মাউন্ট মরায়া' (Mount Moriah) নামক পাহাড়ে সেই উপাসনালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইহুদিদের দাবি অনুযায়ী, সেখানে এই উপাসনালয়টি পূর্বেও কয়েকবার নির্মাণ করা হয়েছিল। আর সেটি হুবহু সেই জায়গাটি, যেখানে আজ মসজিদে আকসা কম্পাউন্ড রয়েছে। যেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ

---

[১২২] পাকিস্তানের *জরবে মুমিন* পত্রিকার একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ।

Scanned by CamScanner

স্থাপনার মধ্যে মসজিদ ও তার আঙিনায় নির্মিত সুদর্শন গম্বুজবিশিষ্ট এমন স্থাপনা রয়েছে, যা স্থাপত্যশিল্পের সপ্তাশ্চর্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আজ পৃথিবীর ইতিহাসে এমনকি মুসলমানদের কাছেও স্থাপত্যশিল্পের অষ্টাশ্চর্য হিসেবে এটিকে গণনা করা হয় না; বরং মুসলমানদের অবস্থা এই যে, যদি আজ তাদের জিজ্ঞেস করা হয়—'মসজিদে আকসা বলতে কী বোঝায়?' এর উত্তরে তারা নামসর্বস্ব ইহুদি পণ্ডিতদের গবেষণালব্ধ এমন তথ্য প্রকাশ করতে থাকে, যা মূলত স্পষ্ট কোনো বার্তা বহন করে না।

- কিন্তু এর বাহিরেও তো এমন অনেক সমস্যা রয়েছে, যেগুলো সমাধানের অপেক্ষা রাখে।

- অবশ্যই, কেন নয়? কিন্তু এ বিষয়টি এমন একটি বিষয়, যাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের তাদের সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত কল্যাণের দিকে আহ্বান করা যায় এবং এমন সব অনিষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে থাকতে অনুরোধ করা, যার ব্যাপারে তারা অবহেলায় লিপ্ত। সবচে বড় সমস্যা হচ্ছে, মুসলমানদের একটি দল মসজিদে আকসার উপর ইহুদিদের অধিকার রয়েছে বলে ধারণা করে। তাদের মতে, 'আইনগতভাবে যদিও মসজিদে আকসা মুসলমানদের সম্পত্তি; কিন্তু মানবতার দিক বিবেচনা করে শান্তির স্বার্থে তা ইহুদিদেরকে দেওয়া যায়।[১২৩] মসজিদে আকসার জন্য ইহুদিদের লড়াই আল্লাহর পথে লড়াই করার শামিল। কেননা, মসজিদে আকসা তাদের পৈতৃক আধিকার।' এহেন পরিস্থিতিতেও কি এ ব্যাপারে চুপ থাকা যায়?

- আচ্ছা এটা বলুন যে, ফিলিস্তিনের মুসলমানরা যে আত্মঘাতী বোমা হামলা করছে—তা কি বৈধ?

- আত্মঘাতী হামলার শরয়ি বিধানের ব্যাপারে আপনার সন্দেহ নাকি কার্যকারী উপকারিতার ব্যাপারে সন্দেহ?

- এত জটিল কথা আমি বলতে পারব না; তবে আমি যতটা জানি ইসলামে আত্মহত্যা করা হারাম।

- এটি আত্মহত্যা নয়; বরং হিংস্র কাফির শত্রুদের বিনাশ। ফিলিস্তিনের প্রতিটি শিশু এ কথা জানে যে, এই হামলার উদ্দেশ্য নিজেদের হত্যা করা নয়; বরং শত্রুদের বিনাশ করা।

Scanned by CamScanner

- আমার এক বন্ধু; যিনি আরব রাষ্ট্র থেকে এসেছেন, তিনি বলেছেন—'আত্মহত্যা করা অবৈধ, এটা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান।'

- তিনি এই বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে ভুল করেছেন, তাই বিধানগত ভুল তথ্য দিয়েছেন। এটি আত্মহত্যা নয়; বরং আত্মত্যাগ। একে আত্মহত্যা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা একদিকে আত্মঘাতী হামলাকারী শহিদদের সাথে অন্যায় করা; অন্যদিকে ইহুদি ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগকৃত সর্বোচ্চ শেষ অস্ত্র থেকে তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার শামিল—যার বিরুদ্ধে তাদের কোনো কার্যকারী সক্ষমতা নেই।

- আমার ওই বন্ধু বলেছেন, 'জিহাদের জন্য যেমন ধর্ষণ ও মদপান বৈধ নয়; তেমনিভাবে আত্মহত্যাও বৈধ নয়।'

- তিনি এই দলিল বিশ্লেষণে দুটি ভুল করেছেন। প্রথমত তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মত্যাগকে আত্মহত্যা বলে ব্যক্ত করেছেন। অথচ এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য দুর্গন্ধযুক্ত পচে যাওয়া লাশ এবং শহিদদের পবিত্র লাশের মধ্যকার পার্থক্যের মতো। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি তার জীবন থেকে নিরাশ, তার প্রভুর দয়া থেকে নিরাশ হয়ে নিজের জীবন ধ্বংস করে। অন্যদিকে কাফির বিনাশে আত্মঘাতী হামলাকারী শাহাদাতে আগ্রহী, প্রভুর সাক্ষাতে উদগ্রীব এবং তাঁর দয়ার আশাবাদী।

তিনি দ্বিতীয় ভুল করছেন ধর্ষণকে হত্যার সাথে সাদৃশ্যতা দিতে গিয়ে। কারণ, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। হত্যার দুটি প্রকার রয়েছে; যার মধ্যে একটি বৈধ অন্যটি অবৈধ। যেমন আত্মহত্যা অবৈধ, কিন্তু শত্রুকে হত্যা করা শুধু বৈধ নয়; বরং সাওয়াবের কাজ। অথচ ধর্ষণ ও মদপান সর্বাবস্থায় অবৈধ। কোনো পরিস্থিতিতেই শত্রুদের মহিলাদের ধর্ষণ করা বা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা মদ পান করা বৈধ হয় না।

- আরবের বিভিন্ন আলিমগণ একে অবৈধ বলেছেন।

- ও, এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বগণ এই ব্যাপারে মুখ খুলেছেন? সমগ্র আরববিশ্ব আজ কাফিরদের থাবার মুখে। সে ব্যাপারে একটি বাক্য যাদের মুখ থেকে নির্গত হয় না, তারা আজ জোরেশোরে এ ব্যাপারে ফাতওয়া দিচ্ছেন। এসবের পিছনে তো নিশ্চয়ই কোনো কারিগর আছে।

- এ ধরনের হামলায় ক্ষতিতো মুসলমানদেরই হয়?

Scanned by CamScanner

- এটি ইহুদিদের একটি দাজ্জালি প্রপাগান্ডা। যদি আপনি উভয় দলের ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনা করেন, তাহলে কখনো এমনটা ভাববেন না। আত্মঘাতী হামলা শুরু করার পূর্বে মুসলমান এবং শত্রুদের নিহত হওয়ার অনুপাত ছিল ১ অনুপাত ১০। আত্মঘাতী হামলা আরম্ভ হওয়ার পর যা কমে ১ অনুপাত ৩-এ এসেছে। যদি এই হামলাকে আরও উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তিতে নেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে একদিন হয়তো মুসলমানদের একজন হত্যার বিপরীতে তাদের তিনজন এমনকি ১০ জন পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। অন্যদিকে এ ধরনের হামলায় কৃপণ ইহুদিদের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ অস্বাভাবিক। হয়তো দেখা যায়, মুসলমানদের একটি ঘর ধ্বংস হয়; কিন্তু এর বিপরীতে সমগ্র ইহুদি বসতির বিদেশ থেকে আসা সাহায্য ধ্বংস হয়ে যায়। আবার অতীতে ডেরা ইয়াসিনের মতো মুসলিম পল্লিতে গণহত্যা চালিয়েও ইহুদিরা তা প্রকাশ করতো না; কিন্তু বর্তমানে আত্মঘাতী হামলাকারীদের ভয়ে ইহুদিরা যখন কোনো মুসলিম পল্লিতে আক্রমণ করে, আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতিকে তারা কয়েক গুণ বাড়িয়ে সংবাদ প্রচার করে; যেন নামধারী মুসলিম গবেষকগণ মুসলমান যুবকদের এ কথা বোঝাতে পারেন যে, 'তোমরা ইহুদিদের সাথে টক্কর দিয়ে নিজেদের মুসিবত ডেকে এনো না।'[১২৪]

- আপনি অযথা ওদের পক্ষাবলম্বন করছেন। আপনি কি দেখেন না, এতে অনেক নিরাপরাধ ব্যক্তি নিহত হয়?

- দেখুন, আপনি জিহাদের অত্যন্ত কার্যকারী এ পদ্ধতিকে অহেতুক ভাববেন না। এটি এমন এক প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে যদি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৬৫ সালে প্রতিরক্ষা করতে না পারত, তাহলে আজ হয়তো যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে শুধু মেড়মেড়ে ধুতি ও নেড়ে মাথার হিন্দুদের দেখতে পেতেন। এখনো প্রায় খবর আসে যে, ভারতের অমুক জায়গায় পাকিস্তানের গোয়েন্দা গ্রেফতার হয়েছে। এমন একজন মানুষ জীবন্ত গ্রেফতার হলে রাষ্ট্রের কত ক্ষতি হয়; কিন্তু আত্মঘাতী হামলার ক্ষেত্রে সে ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। অন্যদিকে আপনি কাদের নিষ্পাপ বলছেন? দাজ্জালকে স্বাগত জানাতে যারা প্রতিশ্রুত ভূমিতে একটি একটি করে ইট সাজিয়ে যাচ্ছে—ওদেরকে? শুধু তাই নয়, জাতিগতভাবে তারা এতটাই পাপিষ্ঠ—তাদের কাউকে নিষ্পাপ বলা যায় না। কেউ সরাসরি দোষী আর কেউ অন্যায়ের সহযোগী।

---

[১২৪] যা মূলত ইয়াহুদিদের জন্য মৃত্যু।

Scanned by CamScanner

এখানে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা উচিত, কাজের মৌলিক উদ্দেশ্যের বিবেচনায় বিধান পরিবর্তিত হয়; অন্তর্গত বিষয়ের বিবেচনায় নয়। এ ধরনের হামলার আসল উদ্দেশ্য শত্রুদের নিধন। যদি এর অন্তর্গতভাবে কোনো নির্দোষ এর আওতায় পড়ে যায়, তাহলে মুজাহিদগণ এ জন্য দায়ী হবেন না।

- আমাদের নিজেদের জাতিগত অনেক সমস্যা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে লিখুন। ফিলিস্তিন তো অনেক দূরে।

- নিজের জাতি ও গোষ্ঠীর সেবা করতে কারও অনীহা নেই। রাষ্ট্রের সাথে আমরাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু মনে রাখা উচিত, সমগ্র ইসলামি বিশ্ব মুসলমানদের দেশ। পৃথিবীর সকল মুসলমান এক জাতি। হারামাইন শরিফাইনের মতো বায়তুল মাকদিসও আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন। সর্বোপরি যখন ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে দেশপ্রেম ও জাতি গঠনের বিপ্লব সাধিত হয়, তখন ফিলিস্তিনের ব্যাপারে লেখা আর নিজের দেশের ব্যাপারে লেখা একই গুরুত্ব বহন করে। যদি কোনো ব্যক্তি বায়তুল মাকদিসে ইহুদিদের হানায় ব্যথিত না হয়, তাহলে তার হৃদয় নিজের দেশের ব্যথায় কীভাবে ব্যথিত হবে? আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী[১২৫] যাবৎ বায়তুল মাকদিসে কোনো ধরনের সংস্কারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। মুসলমানদের পূর্বপুরুষদের এই ঐতিহ্য আজ তাদের সব চোখের সামনে বিলুপ্তপ্রায়।

চোখের সামনে এই কথাটি আমি শুধুমাত্র প্রবচন হিসেবে বলছি। অন্যথায় মুসলমানদের প্রায় দু-প্রজন্ম হতে চলেছে, যারা নিজেদের চোখে বায়তুল মাকদিসকে দেখার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেনি।[১২৬] শুধু বাইরের মুসলমান নয়, যদি ফিলিস্তিনের মুসলমানকে আপনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি নিজে বায়তুল মাকদিস গিয়েছেন? আপনি সেখানে কতবার জুমুআর নামাজ আদায় করেছেন?'—এসব প্রশ্নের উত্তরে তারা আপনাকে ইতিবাচক উত্তর দিতে সক্ষম হবে না।

জর্দান এবং ফিলিস্তিনের শরণার্থী ক্যাম্পে প্রতিপালিত যুবক কীভাবে বায়তুল মাকদিসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানবে? আল্লাহ না করুন; আর

---

[১২৫] ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত।

[১২৬] ২৫ বছরে এক প্রজন্ম অতিবাহিত হতে পারে। ইমাম আজমের মতে বালেগ হওয়ার সময়সীমা ১২ বছর। সন্তান পেটে থাকার সর্বনিম্ন সময় ছয় মাস। এই হিসাবমতে ২৫ বছরেই একজন মানুষ দাদা হতে পারে।

Scanned by CamScanner

যদি অভিশপ্ত ইহুদিরা বায়তুল মাকদিসকে ধ্বংস করে দেয়, তাহলে মুসলমান যুবকদের এই অনুভূতিও হবে না যে, তারা কী হারিয়েছে। তাই পৃথিবীর সকল মুসলমান যুবকদের কাছে আমাদের বায়তুল মাকদিসের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ আবশ্যক। এই ঐতিহ্যের মহত্ত্ব ও এর সৌন্দর্য হয়তো তাদের হৃদয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াবে।

একজন কুর্দি যুবক যদি সালাহুদ্দিন আইয়ুবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, তাহলে মুসলমান মায়েরা এখনো বন্ধ্যা হয়ে যায়নি যে, বায়তুল মাকদিসের জন্য একজন বিজয়ী না-হোক; কমপক্ষে একজন রক্ষাকারীও কি জন্ম দিতে পারবে না?

- আচ্ছা বায়তুল মাকদিসের এই ছবিগুলো আপনারা কোথায় পান?

- এসব *জরবে মুমিন*-ওয়ালাদের তাকওয়ার বরকত। অনেকের ধারণা, প্রাণীর ছবি ব্যতীত পত্রিকা চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাণীর ছবি ব্যবহার না করেও *জরবে মুমিন* নিজেদের সংগৃহীত বিভিন্ন ছবির জন্য প্রসিদ্ধ।

- তারপরও বলুন এসব ছবি কোথা থেকে সংগ্রহ করেন?

এটা কোনো কঠিন কাজ নয়। ওই দেখুন, সামনে মসজিদে আকসা। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের আত্মমর্যাদার পরীক্ষা! আমাদের সমুন্নত হওয়া ও শত্রুদের ধূলিসাৎ হওয়ার উজ্জ্বল প্রতীক। আপনি নিজের অন্তরে আমাদের পূর্বসূরিদের ন্যায় চেতনা, মুসলমান মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার চেতনা লালন করুন। সবকিছুই সম্ভব।

Scanned by CamScanner

# দাউদি পাথরের আঘাত

কথিত রয়েছে, একদা একটি সিংহ, একটি নেকড়ে ও একটি শৃগাল শিকারের উদ্দেশ্যে বের হয়। সারাদিনের শিকারকৃত প্রাণীগুলোকে একত্রিত করে বিকেলে সিংহ তাদের উভয়কে বলে—'তোমরা এগুলো বণ্টন করো।'

তারা উভয়েই বলল, 'বাদশাহ নামদার, আপনিই এগুলো বণ্টন করুন।'

সিংহ বলে, 'আচ্ছা আমি বণ্টন করছি।'

তারপর সে শিকারকৃত প্রাণীগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে। এবার তিনভাগের একভাগ সে নিজের দিকে নিয়ে বলে, 'যেহেতু আমি শিকারের একজন অংশীদার, তাই এ অংশটি আমার। অতঃপর দ্বিতীয় অংশটিও এর সাথে মিলিয়ে বলে, 'যেহেতু আমি এ অঞ্চলের রাজা, তাই এ অংশটিও আমার।' এবার অবশিষ্ট অংশের উপর থাবা রেখে বলে, 'যদি তোমাদের সাহস থাকে, তাহলে এ অংশটি নিয়ে নাও।'

নেকড়ে আর শৃগালের সিংহের থাবার নিচ থেকে শিকারকৃত অংশ নেওয়ার সাহস হওয়ার কথা না। কিন্তু লজ্জাহীন এই প্রাণীদ্বয় দুঃখ করা দূরের কথা নিজেদের অঞ্চলে গিয়ে আনন্দচিত্তে এ কথা প্রচার করতে শুরু করে—'বাদশাহ নামদারের সাথে তাদের শিকারে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।'

টিভি পর্দায় ইয়াসির আরাফাতকে দেখলে বা তার বক্তব্য কানে আসলে আমাদের এই কাহিনি স্মরণ হয়। ইয়াসির আরাফাতের জীবদ্দশায় যখন ইসরাইলিরা তার স্থলাভিষিক্ত নেতৃত্বকে খুঁজতে সচেষ্ট হয়, তখন আমাদের নেকড়ের পর শৃগালের পূর্ণাঙ্গ জুটির কথা মনে পড়ে। এমনিতেই ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিনি শাসনের এমন এক মিনার, যাকে গত পাঁচ দশক ধরে ফিলিস্তিনের যেকোনো অঙ্গনেই মোসাহেবানা মুচকি হাসির সাথে বিদ্যমান দেখা যায়। গত ৫০ বছর ধরে ফিলিস্তিনে ইহুদি হিংস্র হানাদার বাহিনী অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করার পাশাপাশি অসংখ্য জিহাদি নেতাকে হত্যা করেছে;

Scanned by CamScanner

কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই বীরপুরুষের একটি পশমও স্পর্শ করেনি। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে বুলেটপ্রুফ চাদরমুড়ি দিয়ে যেন তিনি এমন সফল রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন, যা অত্যন্ত সফলতার সাথে বাতাসে ঝুলন্ত(!) রয়েছে। ইহুদিদের সাথে যেকোনো মূল্যে সমঝোতা করে মৃতপ্রায় ফিলিস্তিন সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হিসেবে যথাসম্ভব কালক্ষেপণ করাই ছিল তার জীবনের পরম লক্ষ্য। আর আল কুদুসের বিনিময়ে ইহুদিদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করাই ছিল তার একমাত্র সফলতা। এখানে আমরা এ ধরনের একটি ঘটনা উল্লেখ করব, যা উপরোক্ত দৃষ্টান্তের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে।

আজ থেকে প্রায় দুই দশক পূর্বে ইহুদি প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক ফিলিস্তিনের ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন সরকারের সাথে দীর্ঘ আলোচনা ও সমঝোতা-মিশনের আওতায় একটি প্রস্তাবনার উপর একাত্ম হয়, যে প্রস্তাবনায় মসজিদে আকসা কমপ্লেক্সকে তিন ভাগে[১২৭] ভাগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়—

১. দৃশ্যমান মসজিদে আকসা তার আঙিনাসহ চার দেয়ালের মধ্যকার সকল স্থাপনা।
২. মসজিদের ভূমিসহ ভূগর্ভস্থ অঞ্চল।
৩. মসজিদের উপরস্থ শূন্যস্থান।

এর মধ্যে প্রথম অংশটি ইয়াসির আরাফাতকে দান করা হয়। এহুদ বারাক এবং তার ইসরাইলি টিম সানন্দে মসজিদে আকসার ভূমি ও ভূগর্ভস্থ অংশকে নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে। কেননা, তাদের ধারণামতে দাজ্জালের উপাসনালয় মসজিদে আকসার ভূগর্ভস্থ অংশে প্রোথিত রয়েছে। ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক এই বণ্টনের আওতায় তৃতীয় অংশকে উভয়পক্ষের কারও হাতে না দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিও পৃথিবীবাসী এই স্বাধীনতার অর্থ পরিপূর্ণভাবে জানে। কেননা, প্রত্যেকের এ কথা জানা রয়েছে যে, ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে সামরিক, বেসামরিক বিমান রাখার অধিকার শুধু ইসরাইলের রয়েছে।

যে চুক্তিকে নিজের বিজয় ভেবে ইয়াসির আরাফাত অত্যন্ত আনন্দিত ছিল, মূলত সে চুক্তি অনুযায়ী তার কর্তৃত্ব উপর ও নিচের ইসরাইলের কর্তৃত্বের মাঝে

Scanned by CamScanner

আটকে ছিল। মধ্যবর্তী অংশে নিজের স্বায়ত্তশাসনের চিহ্ন হিসেবে তাকে মসজিদে আকসায় নিজের পতাকা ওড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রশস্ত মনের অধিকারীদের কাছ থেকে সামান্য এই নজরানা পেয়েছিলেন এই মহান বীরপুরুষ। কিন্তু তার এই ক্ষুদ্র বিজয়েও ইসরাইলের বিভিন্ন ইহুদি সংগঠন তাদের প্রধানমন্ত্রীর অনেক সমালোচনা করেছিল। এমনকি তাকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। একজন ইহুদি রাব্বি[১২৮] এই বক্তব্যও দিয়েছিল যে, 'আজ আমরা ২ হাজার বছর পূর্বে আমাদের উপাসনালয় ধ্বংসের শোক অনুভব করছি না; বরং আজকের পরাজয়ের শোক অনুভব করছি।'

রোম সম্রাট টাইটিসের ইহুদি উপাসনালয় ধ্বংসের ২ হাজার বছর পরে শোকদিবস পালন অনুষ্ঠানে সে এই বক্তব্য দিয়েছিল। ৪০ খ্রিষ্টাব্দে এই রোমান বাদশাহ জেরুসালেমে হামলা করে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। এই শোক দিবসকে কেন্দ্র করে শোকসভার আয়োজন করে এহুদ বারাক ভেবেছিল যে, মুসলমানদের সাথে প্রতারণামূলক চুক্তিতে ইহুদিরা হয়তো খুশি হবে; কিন্তু এই উগ্রপন্থী দলটি এই সামান্য বিষয়টিকেও রোমান সম্রাট কতৃক নিজেদের উপাসনালয় ধ্বংসের সাথে তুলনা করতে শুরু করে। এর কারণ এই যে, ইসরাইলে এ জাতীয় বহু উগ্র সংগঠন কাজ করে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মসজিদে আকসা ধ্বংস করে সেখানে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ করা।[১২৯]

এই গ্রুপগুলো ইউরোপ ও আমেরিকায় এমন বহু সংগঠন তৈরি রেখেছে, যারা মুসলমানদের এই মসজিদকে ধ্বংস করার জন্য কোটি কোটি টাকা চাঁদা পাঠাচ্ছে। এই চাঁদার টাকা ট্যাক্সমুক্ত রাখা হয়েছে, যা শুধু ইহুদিদের কাছ থেকে নয়; বরং খ্রিষ্টানদের কাছ থেকেও নেওয়া হয়। খ্রিষ্টানদের নিজেদের দলভুক্ত করার জন্য তারা 'জুয়িশ খ্রিশ্চিয়ান কো-অপোরেশন'[১৩০] এর মতো ফোরাম ও 'ইন্টারন্যাশনাল খ্রিশ্চিয়ান এমব্যাসি'র[১৩১] মতো সংগঠন তৈরি করে রেখেছে। এ সংগঠনগুলো কৌশলে খ্রিষ্টানদের ইহুদিদের প্রতি এতটাই নমনীয়

---

[১২৮] ধর্মবেত্তা।

[১২৯] এখানে স্মরণ রাখা উচিত, মাসজিদে আকসা বলতে মাসজিদ কম্পাউন্ডের চার দেয়ালের ভেতরে অবস্থিত সকল স্থাপনাকেই বোঝায়। যেখানে মাসজিদ, মাসজিদের আঙিনা অবস্থিত। বিভিন্ন স্থাপনার পাশাপাশি সোনালি গম্বুজবিশিষ্ট স্থাপনাও রয়েছে। তাই এখানে এ অস্পষ্টতা শেষ করা উচিত যে, মাসজিদে আকসা বলতে সবুজ গম্বুজবিশিষ্ট মাসজিদের কাঠামো উদ্দেশ্য নাকি সোনালি গম্বুজবিশিষ্ট কুব্বাতুস সাখরা উদ্দেশ্য।

[১৩০] Jewish christen co-operation.

[১৩১] International christen Embassy.

Scanned by CamScanner

করছে যে, একসময় যে পশ্চিমারা অত্যন্ত ইহুদি বিদ্বেষী ছিল আজ তারা ইহুদিদের পরিবর্তে মুসলমানদের নিজেদের শত্রু হিসেবে দেখছে। একসময় যে ইহুদি শব্দটি তাদের কাছে ঘৃণার বস্তু ছিল, আজ সেই ইহুদিরাই খ্রিষ্টানদের ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হচ্ছে। একসময় এমন ছিল যে, ইহুদিদের প্রতি ঘৃণাবসত জগতের সকল মন্দ বস্তুকে তাদের প্রতি সম্পর্কিত করা হতো, এমনকি তাদের থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করার জন্য বিভিন্ন খ্রিষ্টান সংগঠন অস্তিত্বে এসেছিল। রোমের পোপদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটেন ও জার্মান থেকে এদের নির্বাসিত করা হতো। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ১৩ শতক থেকে ১৫ শতক পর্যন্ত এদের নির্বাসিত করা হতো।

খ্রিষ্টানরা তখন ইহুদিদেরকে পৃথিবীর সবচে নিকৃষ্ট ও জঘন্য প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করতো; কিন্তু বর্তমানে খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইহুদিদের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করছে। এমনকি তাদের ধারণামতে ঈশ্বর তাদের ওপর এ জন্য সন্তুষ্ট যে, তারা ইহুদিদের উপর সন্তুষ্ট। সবচে দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে—মুসলমানদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুসলমানরা নিজেদের চিরস্থায়ী শত্রুকে চিনতে ভুল করেছে; যেখানে আহলে কিতাবরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বত্র একতাবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বদ্ধপরিকর। আর এটা হচ্ছে মুসলমানদের শত্রুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় যে, মুসলমানরা এই বিষধর শত্রুর প্রতিকারের পরিবর্তে তাদের সাথে সমঝোতার কথা ভাবছে।

মুসলমানরা আজ আল কুদুসের ওপর ইহুদিদের অধিকার ও কর্তৃত্ব নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছে। অনেক মুসলমান গবেষক ফিলিস্তিনের দ্বন্দ্বকে জাতিগত বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেন। যার ফলে মুসলমান জনসাধারণের মনে প্রথম কিবলার সমস্যার পরিবর্তে ফিলিস্তিনের সমস্যা হিসেবেই বিষয়টি আবর্তিত হয়। আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবীরাও একে আরবের রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেন; কিন্তু আল্লাহর শপথ, এটি আমাদের রাজনৈতিক ব্যাপার নয়; বরং আমাদের ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। ওই সত্তার শপথ, যিনি হারামাইন শরিফাইন ও বায়তুল মাকদিসকে সম্মানিত করেছেন। এটি শুধু প্রথম কিবলার বিষয় নয়; বরং উভয় কিবলার সম্মান সংশ্লিষ্ট বিষয়। এটা শুধু বায়তুল মাকদিসের পবিত্র ভূমি দখলের বিষয় নয়; বরং ইসলামের সকল পবিত্র স্থানের মর্যাদা-সংক্রান্ত যুদ্ধ। এটি আলোচনার সময় নয়; আল্লাহমুখী হওয়ার, তাঁর দরবারে তাওবা করা এবং ইমানি চেতনা জাগ্রত করার সময়।

Scanned by CamScanner

আজকের টিভি, ডিশ-এন্টেনা ও ক্যাবলের মাধ্যমে দাজ্জালের ফেতনা ঘরে ঘরে প্রবেশ করছে। প্রকাশ্যে এসব নির্লজ্জতা থেকে পবিত্র হয়ে মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহমুখী হওয়া এই সময়ের চাহিদা। ফিলিস্তিনের শিশুরা আজ নিজেদের হাতে এভাবে পাথর মুষ্টিবদ্ধ রেখেছে, যেভাবে তালুতের দলের তরুণ যুবক হজরত দাউদ আ. জালুতের কপালে পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। ইরাকের মুজাহিদরা শত্রুর ট্যাংকের মোকাবিলা গাধার গাড়িতে বসে করে যাচ্ছেন। আর এই গাধার গাড়ি এবং পাথরগুলো জালুতের বাহিনীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। বাস্তবতা এ কথার সাক্ষ্য বহন করে—একদা যেখানে ১০ জন মুসলমানের বিপরীতে একজন ইহুদিকে হত্যা করা সম্ভব হতো, সেখানে আজ তিনজন মুসলমানের বিপরীতে একজন ইহুদি নিহত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইসরাইল থেকে অন্য রাষ্ট্রে গমনের সংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে ইসরাইলে আগমনের হার ৭০ শতাংশ কমে গিয়েছে। আর এভাবেই নিরীহ ফিলিস্তিনিরা এমন সফলতা দেখিয়েছে, যা ধনী আরব রাষ্ট্রগুলো করতে সক্ষম হয়নি। তাই উদভ্রান্ত হয়ে ইহুদিরা আজ ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুনকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে ইসলামি ঐতিহ্য ও চেতনাকে ধ্বংস করতে তৎপর। তাই ইমানদারদের এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে যে, তারা কাদের সাথে কাদের দলে যোগ দেবে।

Scanned by CamScanner

# সুলায়মানি কাঠামো
# রূপকথা না বাস্তবতা

কিছু দিন আগে ইহুদিদের একটি উগ্রপন্থী দল, মুসলমানদের প্রথম কিবলা, তৃতীয় সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান মসজিদে আকসার পাশে সুলায়মানি কাঠামোর স্মারকচিহ্ন হিসেবে পাঁচ টন ওজনের একটি পাথর রাখতে চায়। তাদের এই অপচেষ্টার বাস্তবায়ন এতদিন ধরে লোকমুখে শোনা জায়নবাদী অপশক্তির তৎপরতার গল্পকে বাস্তব বলে মনে করিয়ে দেয়। সচেতন মুসলমান গবেষক ও ফিলিস্তিনের মুজাহিদগণ পৃথিবীব্যাপী অবহেলার চাদরে আবৃত মুসলমানদের এ কথা জানাতে চেয়েছিল যে, ইহুদিরা তাদের পরিকল্পিত সুলায়মানি কাঠামোর মডেল তৈরি করে বসে আছে। তাদের ধর্মীয় পুস্তকের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী[১৩২] এই কাঠামো নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করার পাশাপাশি এর জন্য অত্যাধুনিক মডেল তৈরি করে রেখেছে। হাজার বছর ধরে তৃতীয় বারের মতো সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ স্বজাতিকে এটি নির্মাণের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য তারা এখন শুধু একটি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে।

সুলায়মানি কাঠামো নির্মাতা একটি সংগঠনের সদস্যরা তৃতীয়বারের মতো সেই কাঠামো নির্মাণের ঐতিহাসিক সৌভাগ্যের দাবিদার হওয়ার জন্য একত্রিত হয়। অত্যন্ত উগ্র ও উন্মাদ প্রকৃতির এই সংগঠনের একটি দল মসজিদে আকসার বাবুল মাগারিবাহের পাশের বোরাক দেয়ালের[১৩৩] উল্টোদিকে এই পাথরটি রাখতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনের মুসলমানরা নিজেদের অসহায়ত্ব সত্ত্বেও মুহূর্তের মধ্যে ধাওয়া দিয়ে ওদের সেখান থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। সূত্রানুসারে ওদের উপর হামলা করার জন্য মুসলমানদের কাছে কিছু না থাকায় ছোট ছোট পাথরখণ্ড এবং তাঁদের পায়ের জুতা দিয়ে ইহুদিদের ধোলাই

---

[১৩২] যার মধ্যে অধিকাংশই এমন আশ্চর্যজনক রীতিনীতি ও গল্প, যার ব্যাপারে বলা যায় যে, এসব নিশ্চয়ই ইয়াহুদি পণ্ডিতদের মনগড়া।

[১৩৩] যাকে ইহুদিরা Wailing wall বলে অভিহিত করে।

Scanned by CamScanner

করে; যা মুহূর্তেই তাদের সকল উগ্রতাকে বাস্তবতার স্বাদ বুঝিয়ে দেয়। আশেপাশে অবস্থানরত ইহুদি সৈন্যরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তাদের অনেককে জখম করে। কিন্তু এসব জখম হাসিমুখে সহ্য করে মুসলমানরা জানিয়ে দেয়—তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় অভিশপ্ত ইহুদিদের কোনো কূটকৌশল সফল হতে দেবে না।

স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সুলায়মানি কাঠামো কী? এ ব্যাপারে ইহুদিরা কী মতবাদ পোষণ করে? মসজিদে আকসার কর্তৃত্বের ব্যাপারে তাদের দাবিগুলো কতটা শক্তিশালী? আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্য, নবিদের সাথে বেআদবি করা এ সম্প্রদায় ভবিষ্যতের ব্যাপারে কী ধরনের ইচ্ছা পোষণ করে? এ ধরনের নোংরা চিন্তাভাবনা তাদের মাথা থেকে কীভাবে বের করা যায়? তাদের এসব বুদ্ধি-বৈকল্যের সমাধান কী? সামনে কয়েকটি অনুচ্ছেদে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

## হাইকাল তথা সুলায়মানি কাঠামো বলতে কী বোঝায়?

'হাইকাল' শব্দের অর্থ উপাসনালয়। ইহুদিদের বিশ্বাস ও দাবিমতে,[১৩৪] বর্তমানে যে চার দেয়ালের ভেতরে মসজিদে আকসা কম্পাউন্ড অবস্থিত, সেখানে কোনো কালে হজরত সুলায়মান আ.-এর উপাসনালয় ছিল; যা আজ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। মিরাজের রজনীতে যখন হজরত মুহাম্মাদ ﷺ এখানে সকল নবিদের নামাজের ইমামতি করেছিলেন এবং তৎপরবর্তী সময়ে বায়তুল মাকদিস বিজয় করে হজরত উমর রা. এখানে মসজিদে আকসা নির্মাণ করেছিলেন। তখন অভিশপ্ত ইহুদিরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিতাড়িত হয়ে যাযাবরের ন্যায় জীবনযাপন করছিল।

দীর্ঘদিন পর তারা বায়তুল মাকদিসকে হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছে। তাই তারা সেখানে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ করে নিজেদের ধর্মীয় স্মৃতিকে জাগ্রত করে রাখতে চাচ্ছে, যা আল্লাহর অভিশাপে তাদের হাতছাড়া হয়ে কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কি ইহুদিদের এই দাবি সঠিক? মুসলমান, খ্রিষ্টান এমনকি ইহুদিদের নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় গ্রন্থসমূহও তাদের এই দাবিকে ঠুকরে দেয়।

---

[১৩৪] মানব ইতিহাসের নোংরা দাবিগুলোর অন্যতম।

Scanned by CamScanner

আসমানি কিতাব, ধর্মীয় পুস্তিকা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, বর্তমান মসজিদে আকসা হজরত সুলায়মান আ.-এর হাজার বছর পূর্ব থেকেই ইবাদাতের স্থান হিসেবে নির্ধারিত ছিল। ইহুদিদের অস্তিত্ব লাভের হাজার বছর পূর্ব থেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এই স্থানে ইবাদাত করতেন।

মুসলমানদের কেউ কেউ ধারণা করেন, মসজিদে আকসার নির্মাণ সর্বপ্রথম হজরত দাউদ ও সুলায়মান আ. করেন এবং এর নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁরা জিনদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাস্তবে এই স্থানটি হজরত আদম আ.-এর ইবাদাতের স্থান হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিল। *সহিহ বুখারি শরিফের* বর্ণনায় স্পষ্ট, বায়তুল্লাহ ও মসজিদে আকসার নির্মাণের মধ্যকার ব্যবধান ছিল ৪০ বছর। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, মানব-ইতিহাসে বায়তুল্লাহ সর্বপ্রথম নির্মাণ হজরত আদম আ. করেছিলেন। আর সেই হিসেবে বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ হজরত সুলায়মান আ.-এর জন্মের বহু বছর পূর্বে সম্পাদিত হয়েছিল। খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ এই বক্তব্যকে সমর্থন করে এবং তারা কেউ একে অস্বীকার করে না।

তাহলে তাদের কর্তৃত্বের দাবি কীভাবে?

হজরত সুলায়মান আ.-এর নির্মাণের পরেও বায়তুল মাকদিস কয়েকবার নির্মাণ করা হয়েছিল। কয়েকবার ভূমিকম্পজনিত কারণে, কয়েকবার বহিঃশত্রুর আক্রমণে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হওয়ায় বায়তুল মাকদিসকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শুরুতে ব্যাবিলনের[১৩৫] তৎকালীন শাসনকর্তা বুখতেনাসার ইহুদিদের ওপর চড়াও হয়ে জেরুসালেমকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে এবং ইহুদিদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অল্পসংখ্যক যারা বেঁচে ছিল, তাদের দাসদাসীতে পরিণত করে নিয়ে যায়। তখন প্রায় ১৫০ বছর পর্যন্ত ওই স্থান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে জনমানবহীন শূন্যতায় ছেয়ে যায়। অতঃপর যুগের পালাক্রমে এ অঞ্চলে মিসরি, পারসিক ও রোমানদের শাসনামল অতিবাহিত হয় এবং সব যুগেই এখানে বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা নির্মিত হয় এবং পালাক্রমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ইতিহাসের ন্যূনতম জ্ঞান রাখা একজন ব্যক্তিও এই বিষয়গুলো জানে এবং ইহুদিদের এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, মুসলমানদের মসজিদে আকসা নির্মাণের

---

[১৩৫] প্রাচীন ইরাকের একটি ঐতিহ্যবাহী শহর ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু।

Scanned by CamScanner

পূর্বেও বহুবার এ অঞ্চলকে ভাঙাগড়া হয়েছিল। সর্বোপরি যেহেতু হজরত সুলায়মান আ.-এর নির্মাণের বহু বছর পূর্বেও বিভিন্ন জাতি এই স্থানে উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল তাহলে শুধু তারা কীভাবে মসজিদে আকিসাকে নিজেদের একমাত্র পৈতৃক সম্পত্তি বলে দাবি করে?

শুধু বনি ইসরাইলের একজন উল্লেখযোগ্য নবি হজরত সুলায়মান আ. এই স্থানে উপাসনালয় নির্মাণ করেছিলেন—এ কথাটিই তাদের দাবির স্বীকৃতির জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা, ইহুদিদের পূর্বে রোমান ও পারসিকসহ বহু জাতি এই স্থানে উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল এবং তাদের চেয়ে বেশিকাল এখানে ইবাদাত করতো। সুতরাং, ইহুদিরাই কেবল এর দাবীদার কীভাবে হতে পারে?

## আল কুদুসের সত্যিকার উত্তরসূরি কে?

যদি আলোচনার খাতিরে এ কথা মেনে নেওয়া হয় যে, এই স্থানে সর্বপ্রথম হজরত সুলায়মান আ. মসজিদে আকসা নির্মাণ করেছিলেন এবং তার পর হজরত উমার রা. কর্তৃক মসজিদে আকসার নির্মাণ পর্যন্ত আর কেউ নির্মাণ করেনি; তবুও এই ভিত্তিতে ইহুদিরা এর উত্তরসূরি সাব্যস্ত হবে না এবং এই স্থানে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের অধিকার রাখে না। তা এ জন্য যে, তারা কোনোভাবেই হজরত সুলায়মান আ.-এর উত্তরসূরি নয়। এই হতভাগারা অন্যান্য নবিদের সাথে বেআদবি করার পাশাপাশি হজরত সুলায়মান আ. ও তাঁর পিতা হজরত দাউদ আ.-এর সাথেও চরম বেআদবি করেছিল। তাদের বর্তমানের বিকৃত তাওরাতে এই দুইজন নবির শানে এমন এমন মনগড়া কাহিনি সংযুক্ত করা হয়েছে, যা বর্ণনা করার উপযুক্ত না।

উলামায়ে কিরামের চোখে অবশ্যই ওসব ইসরাইলি রিওয়ায়াত পড়েছে যেগুলোর বিরোধ বা খণ্ডন মুফাসসিরিনে কিরাম সুরা সোয়াদে হজরত দাউদ আ.-এর কাহিনি-সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে করেছেন। বিরোধিতাকরতে গিয়েও উলামায়ে কিরাম এসব মনগড়া কাহিনি ওদের বর্ণনার হুবহু বর্ণনা না করে মোটামুটিভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় ইহুদিদের বর্ণনার মূল শব্দে পড়লে প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তিই শিউরে উঠবে যে, এই হতভাগারা কীভাবে এসব সম্মানিত নবিদের ব্যাপারে প্রকাশ্যে এমন নোংরা ধারণা পোষণ করে।

ইদানীং সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে ইহুদিদের পক্ষ থেকে ইন্টারনেটে এ সংক্রান্ত যেসব তথ্য ও মনগড়া কাহিনি প্রচার করা হয়, না

Scanned by CamScanner

দেখলেও এদের চিরস্থায়ী অভিশপ্ততার অনেক কারণ জানা যায়। সারকথা, ইহুদিরা যেহেতু হজরত দাউদ ও সুলায়মান আ.-এর শানে চূড়ান্ত বেআদবি করেছে এবং কুরআনে কারিমের বর্ণনামতে হজরত দাউদ আ. তাদের জন্য বদদুআ করেছিলেন।[১৩৬] তাহলে এই অভিশপ্তরা কীভাবে তাঁদের উত্তরসূরি হতে পারে? তাঁদের সত্যিকারের উত্তরসূরি তো মুসলমানরা যারা তাঁদের যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত ভালোবাসা ও বিশ্বাস পোষণ করে।

## বোঝার জিনিস, বোঝানোর নয়

সুলায়মানি কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর রাখার ইদানীংয়ের প্রচেষ্টাও এমন এক আশ্চর্যজনক গল্প, যা না বোঝার না বোঝানোর। ইহুদিদের ধর্মীয় বর্ণনামতে, এ কাঠামোর তৃতীয় নির্মাণ তাদের হাজার বছরের লাঞ্ছনা থেকে নেতৃত্বের শিখরে আনার ত্রাণকর্তা দাজ্জালের আগমনের সময় হবে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তা নির্মাণ করবেন। উগ্রপন্থী ইহুদিদের মতে, বর্তমান মসজিদে আকসায় প্রবেশ করাও জায়েয নেই; যেহেতু এর নিচে সুলায়মানি কাঠামোর প্রথম ও দ্বিতীয় নির্মাণ প্রোথিত রয়েছে, যার উপর আরোহণ করা বেআদবি। আর এ জন্যই অনেক ইহুদি নতুন কাঠামো নির্মাণের জন্য অলৌকিক কোনো শক্তির অপেক্ষা করছে। কিন্তু নিজেদের মনগড়া মতবাদে বিশ্বাসী কিছুসংখ্যক উগ্র ইহুদি ফেরেশতাদের নির্মাণের অপেক্ষা না করে নিজেরাই এই নির্মাণকার্য সমাধা করতে তৎপর। মসজিদে প্রবেশের বৈধতা দেওয়ার জন্য তারা এ কথা বলে—'আমরা মসজিদে নামাজ ও দুআর উদ্দেশ্যে যাব, আর এই সুযোগে সুলায়মানি কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করব।[১৩৭]

ইহুদিদের এ দলটি দীর্ঘদিন যাবৎ মসজিদে আকসা ধ্বংস করার কৌশল খুঁজছে। কখনো মসজিদের নিচে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলি খোঁজার বাহানায়, আবার কখনো তারা বায়তুল মাকদিসে প্রবেশ করে এমন রাসায়নিক পদার্থ মসজিদের দেয়ালে ছড়িয়ে দেয় যা দ্বারা মসজিদের স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর তাদের মনস্কামনার বাস্তবায়নে তারা এগিয়ে যাবে।

---

[১৩৬] সুরা মায়েদা : ৭৮।

[১৩৭] তাদের এই ছলচাতুরি কুরআনে কারিমে বর্ণিত বিভিন্ন ঐশী বিধানের সাথে তাদের পূর্বপুরুষদের করা ছলচাতুরি সাথে সাদৃশ্যতাপূর্ণ।

Scanned by CamScanner

# ব্যথিত আর্তনাদ

ফিলিস্তিনের মুসলমানরা যদিও ইহুদিদের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে অসহায়ত্বের জীবনযাপন করছেন, তবুও তারা নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতার এমন প্রদর্শনী করে চলছেন, যার অনুমান ইহুদিরা ও তাদের পষ্ঠপোষকরা কখনো করেনি। বর্তমানে কথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার চর্চার এই উৎকর্ষতার যুগে যেখানে যেকোনো সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ওপর ইহুদিদের এমন নির্মম অত্যাচারের ইতিহাস আধুনিক সভ্যতার কপালে কলঙ্কের তিলক লাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এমন অসহায়ত্ব ও আশ্রয়হীন হওয়া সত্ত্বেও সেখানে মুসলমানদের সাহস না হারানো সত্যিই বাহবা পাওয়ার উপযুক্ত। হয়তো এমন সাহসিকতার প্রদর্শনী বর্তমানে অবহেলায় লিপ্ত মুসলমানদের কাছে অস্পষ্ট; কিন্তু ভবিষ্যৎ মুসলমান প্রজন্ম অবশ্যই এসব কর্মকাণ্ডে গর্ববোধ করবে।

আজ মসজিদে আকসার শোকার্ত পরিবেশ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ফরিয়াদ করছে না। কেননা, তারা তাদের সর্বস্ব দিয়ে তার পক্ষে লড়াই করে যাচ্ছে। মসজিদে আকসার ফরিয়াদ পৃথিবীর এমন সম্পদশালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে, যাদের অন্তর মসজিদে আকসার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যথিত হচ্ছে না। এমন যুবকদের বিরুদ্ধে, যারা মসজিদে আকসাকে ভুলে পৃথিবীর সৌন্দর্যের পেছনে ছুটে চলছে। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির এমন উত্তরসূরিদের বিরুদ্ধে, যারা তাঁর প্রতি সম্পর্কিত হওয়াকে আনন্দের বিষয় মনে করলেও তার উত্তরসূরি হওয়ার অধিকার আদায় করছে না। মসজিদে আকসা চিৎকার করে বলছে, আজ আমার ব্যথায় যেসব মুসলমান ব্যথিত হচ্ছে না, পরকালে কীভাবে তারা আমার মুখোমুখি হবে?

Scanned by CamScanner

# সামেরির গো-বৎস

আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন, মসজিদে আকসা বলতে ওই মসজিদ কম্পাউন্ডকে বোঝানো হয়, যার অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে। যদিও সাধারণ কথাবার্তায় অনেক সময় মসজিদে আকসা বলতে নামাজের জন্য নির্ধারিত মসজিদটিকেই বোঝানো হয়। এই কম্পাউন্ডের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা রক্ষা করা মুসলমানদের দায়িত্ব এবং তার একবিন্দু জায়গাকে অবহেলা করা তাদের আত্মমর্যাদাহীনতা বলে বিবেচিত হবে। ইহুদিরা নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে কূটকৌশল, প্রতারণা ও প্রয়োজনে চরমপন্থা প্রদর্শনের যে পথ বেছে নিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পৃথিবীবাসী একদিকে এই উগ্র চরমপন্থীদের অসহায় নিষ্পাপ মনে করে অন্যদিকে বাস্তবিকভাবে অসহায় মুসলমানদের সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী হিসেবে গণ্য করে। এর একটি বড় কারণ হলো, ইহুদিদের প্রতিটি সদস্য তাদের নিজস্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করে। তাদের সাংবাদিকরা মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে অগ্রগামী, তাদের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা জায়নবাদের জন্য টাকা বিলাতে দ্বিধাবোধ করে না, তাদের নারী ও বৃদ্ধরা নিজেদের সম্ভাব্য সকল কাজ সম্পাদন করে, তাদের বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থকে নিয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকে, তাদের গবেষকরা ইহুদিবাদ নিয়ে গবেষণা করে এবং তাদের সামর্থ্যবান প্রতিটি পুরুষ ইহুদিবাদের জয়গান রচনা করতে সদা তৎপর। ধর্মীয় নেতা হতে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত প্রত্যেকেই যেকোনো মূল্যে প্রয়োজনে যেকোনো ধরনের অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে জায়নবাদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় উদগ্রীব। আর এ জন্যই আজ তারা সাময়িকভাবে বিজয়ী।

... কিন্তু যেদিন মুসলমানরা দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে, জীবনের পরিবর্তে আত্মত্যাগকে, ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে, সেদিন ইহুদিয়াতের কান্ডারিরা মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। অপেক্ষা শুধু মুসলমানদের মধ্যে সেই চেতনার জাগরণের। ইহুদিদের এই তেলেসমাতি শক্তি ধূলিসাৎ হতে ততটা সময়ও লাগবে না, যতটা সময় সামেরির তৈরিকৃত গো-বৎসকে পুড়িয়ে তার ছাই সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে লেগেছিল।

Scanned by CamScanner

# বৃহত্তর ইসরাইল বলতে কী বোঝায়

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলাম—বিভিন্ন হজরতগণ আরব শাসকদের বাস্তবসম্মত সমালোচনাকেও বেআদবি বলে মনে করেন এবং ইসলামি পবিত্র নিদর্শনাবলির রক্ষণাবেক্ষণে তাদের অজস্র খেদমতের দোহাই দিয়ে এসব ব্যাপারে চুপ থাকার পরামর্শ দেন। এসব কথা শুনে আমার ওই কর্নেল সাহেবের কথা মনে হয়, যার সুন্দর আচরণের উপাখ্যান ছাত্র জীবনের শেষে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। যিনি সামরিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও সবসময় তার কর্নেল পদের দাপট দেখানোর জন্য মুখিয়ে থাকতেন।

তিনি সবসময় এ কথা বুঝিয়ে দিতে চাইতেন যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশীল একজন মানুষ। তাই তাকে সবার 'স্যার' বলে সম্বোধন করে 'ইয়েস স্যার' বলে উত্তর দেওয়া উচিত। পাশাপাশি তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া, রাস্তা ছেড়ে দেওয়া এবং তাঁর হাতের লাঠি পড়ে গেলে সশ্রদ্ধভাবে তা উঠিয়ে দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, যখন তিনি কোনো বৈঠকে আসবেন, সবার তার পদমর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা, যতক্ষণ অবস্থান করবেন, তাঁর ভয়ে ভীত থাকা উচিত। কিন্তু একজন রিটায়ার্ড কর্নেলের সাথে এ ধরনের আত্মঅহমিকা ও হাঁকডাক কে সহ্য করতে চায়? আর তাই কর্নেল সাহেব নিজের দাম্ভিক সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে মসজিদ কমিটির সভাপতি হওয়ার পন্থা খুঁজে বের করলেন। ব্যস! মসজিদে পরিপূর্ণ 'মার্শাল ল' জারি হয়ে যায়। কর্নেল সাহেব সর্বপ্রথম মসজিদের দরজা-জানালায় নেট লাগানোর ব্যবস্থা করেন। আঙিনার মেঝে ওয়াশিং পাউডার দিয়ে ধুয়ে আয়নার মতো পরিষ্কার করা হয়। পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের ব্যাপারে রূপার মতো স্বচ্ছ রাখার আদেশ জারি করেন। বাথরুমের জন্য আলাদা জুতার ব্যবস্থা করেন। বাগানে গাছের গোড়ায় পানি দেওয়ার সময় নির্ধারণ করে দেন। কার্পেটে নাক লাগিয়ে দেখতেন অনেক দিনের পুরাতন ধোয়া নয়তো?

Scanned by CamScanner

সারকথা, কর্নেল সাহেব নিজের অবসর সময়ের এত চমৎকার ব্যবহার করছিলেন—বোঝার উপায় ছিল না, এটা কোনো মসজিদে নাকি কোনো সামরিক কার্যালয়। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে এসবকিছু কর্নেল সাহেবের মসজিদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। কিন্তু কর্নেল সাহেবের ভাবভঙ্গি দেখলে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, এসব মূলত নিজের নেতৃত্বগুণের বহিঃপ্রকাশ, অর্ডার দেওয়ার অভ্যাস এবং দাম্ভিক আত্মাকে শান্তি দেওয়ার মাধ্যম। ধীরে ধীরে মসজিদ কমিটির অন্যান্য সদস্য ও মসজিদের খাদেমদের সাথে তার আচরণ এবং সময়-অসময়ে তার বিভিন্ন অসংলগ্ন ফরমান এ কথা স্পষ্ট করে দিত যে, এই ব্যক্তির মূলত আল্লাহর ঘরের সেবা বা তা থেকে বরকত লাভ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং নিজের অস্বাভাবিক দাম্ভিক আত্মাকে শান্তি দেওয়ার লক্ষ্যে এই সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছেন। যে ব্যক্তি শিষ্টাচারী নয়; বরং দাম্ভিক, যার আচরণে নম্রতার পরিবর্তে অহংকারের ঝলক থাকে সে যদি আল্লাহর ঘরের খেদমতকে ইখলাস ও সেবার নাম দেয়, তাকে বিশ্বাস করা দাড়িহীন লম্বা গোঁফের অধিকারী ভণ্ড পীরের অসংলগ্ন কথাবার্তাকে ঐশী বরকতময় বাণী মনে করার শামিল।

হারামাইন শরিফাইনের বর্তমান সংস্কার ও খেদমত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু তাদের আচরণে উল্লেখিত কর্নেল সাহেবের আচরণের ঝলক স্পষ্ট দেখা যায়। সেই সম্মানিত শাসকগণ নিজেদের দেশে খেলাধুলা ও বিভিন্ন ধরনের এন্টারটেইনমেন্টের বড় ধরনের ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন। ইউরোপ-আমেরিকার এমন কোনো বিনোদন নেই যা এই আরব শাসকরা তাদের জনগণকে ঘরে বসে উপলব্ধ করাচ্ছে না। কিন্তু তাদের রাষ্ট্রের সীমানায় কোনো মুসলমানের কি জিহাদি চেতনা নিয়ে কোনো কথা বলার অধিকার রয়েছে? তাদের প্রতিবেশী ইসরাইল তাদের প্রতিটি নওজওয়ানকে সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করছে; কিন্তু এই হারামাইন শরিফাইনের খাদেমরা তাদের যুবকদের জন্য জিহাদি প্রশিক্ষণকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে রেখেছেন। জনগণের ওপর তাদের কঠোর শাসনব্যবস্থা এ অবস্থায় পৌঁছেছে, যেখানে কোথাও একত্রিত হওয়া তিনজন মানুষের চতুর্থজন হয় সরকারি গোয়েন্দা। এই ভয়ে যে, তাদের শ্রদ্ধাভাজন আমেরিকার বিরুদ্ধে শায়খ উসামা বিন লাদেনের অনুসারীরা কোনো অপতৎপরতা চালাচ্ছে না তো?

এই মহামান্য শাসকগণের মুসলিম উম্মাহের ব্যথায় ব্যথিত হওয়ার প্রমাণ হলো, ইউরোপ-আমেরিকার এমন কোনো বিনোদনকেন্দ্র নেই, যেখানে তাদের

Scanned by CamScanner

পদচারণা হয় না। তাদের পরিবারের কোনো যুবক যদি ইউরোপ-আমেরিকার কোনো বিনোদনকেন্দ্রে যেতে চায়, তাহলে তারা তাদের উৎসাহিত করেন, যেন তারা এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যদি কারও ব্যাপারে ঘুণাক্ষরে জেনে ফেলেন যে, এই ব্যক্তিটি কোনো জিহাদের ময়দানে যেতে চায় বা জিহাদ চলতেছে এমন কোনো স্থান থেকে ফেরত এসেছে, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা বোধ করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওকে কারাগারে প্রেরণ না করেন। এমনিতে মুসলমানদের দুর্দশার হতাশ চিত্র তুলে ধরতে তাদের কোনো অলসতা থাকে না। কিন্তু তাদের জেলখানায় আবদ্ধ করে মুজাহিদগণ বা আমেরিকার শত্রুদের এত জঘন্য অত্যাচার করেন যা শুনে কেউ এ কথা ভাবতে পারবে না যে, এদের মনে মুসলমানদের প্রতি ন্যূনতম অনুভূতি রয়েছে।

এ সংক্রান্ত আলোচনা নিঃসন্দেহে প্রতিটি মুমিনের মন ব্যথিত করে তুলবে। কিন্তু এই আলোচনা ব্যতীত ফিলিস্তিনের মুসলমানদের আঘাতের তীব্রতা বুঝে আসবে না, যা সেই পবিত্র ভূমিতে হিংস্র ইহুদিদের মাধ্যমে পৌঁছেছে। আর সেসব আঘাতের ক্ষতিপূরণে এই শাসকেরা অতটাও করেনি, যতটা তাদের পোষা প্রাণীর জন্য করে থাকে। আরবের অর্থশালী স্বাধীন শাসকদের উম্মাতে মুসলিমার সাথে করা বেইমানি স্পষ্ট হতো না, যদি লর্ড রিচার্ড-এর 'বৃহত্তর ইসরাইলের' গোপন রূপরেখা প্রকাশ্যে না আসত।

রিচার্ড একজন কট্টরপন্থী ইহুদি ছিল। অত্যন্ত উগ্র এই ধনকুবের কী পরিমাণ সম্পদের মালিক তা হয়তো নিজেও জানত না। সে তার সমুদয় সম্পত্তি জায়নবাদের স্বার্থে উজাড় করে দিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে 'বালফোর ডেক্লারেইশন'-এর মাধ্যমে ইসরাইল রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পেশ করা হলে ফিলিস্তিনে আনুপাতিক হারে ইহুদিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ইহুদি নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইহুদিদের এনে ফিলিস্তিনে জড়ো করার জন্য এই ধনকুবের তার ধনভান্ডার খুলে দেয়। ফিলিস্তিনি জনগণের কাছ থেকে তাদের দাবিকৃত যেকোনো মূল্যে সে তাদের জায়গা ক্রয় করতে শুরু করে এবং সেখানে ইহুদিদের জন্য অগণিত অর্থ ব্যয় করে। তখন উলামায়ে কিরাম ফিলিস্তিনের জনগণকে বুঝিয়েছিলেন—তারা এভাবে জমি বিক্রি করে নিজেদের পায়ে কুড়াল না মারে। সচেতন মুসলমানরা পৃথিবীব্যাপী আলিমদের ফাতওয়া এনে জনগণকে এ কথা বোঝাতে থাকেন—তারা এভাবে জমি বিক্রি

Scanned by CamScanner

না করে। কিন্তু রিচার্ডের মতো ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের ধনভান্ডার সাধারণ মুসলমানদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল। তাই তারা বেশি মূল্যের লোভে একের পর এক নিজেদের জমি বিক্রি করতে থাকে। পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলেও এই খেলার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর চেষ্টা চলছে।

সর্বনাশের বিষয় হচ্ছে, মুসলমান জনসাধারণের মাথার উপরে পানি আসা পর্যন্ত হুশ ফেরে না। উলামায়ে কিরাম ও ইসলামি গবেষকদের নিষেধাজ্ঞা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি; উল্টো রিচার্ডের মতো ব্যবসায়ীদের অর্থের ঝনঝনানিতে তাদের মালিকানাধীন জায়গাগুলো ইহুদিদের হস্তগত হতে থাকে। আর এভাবেই ইহুদিরা ধীরে ধীরে সংখ্যালঘু অবস্থান কাটিয়ে উঠতে থাকে। আনুপাতিক হারে তাদের সংখ্যা যখন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে, তখন তারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের বাস্তুচ্যুত করে তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে শরণার্থী হতে বাধ্য করে। আর এভাবেই তাদের হাত থেকে জায়গার বিনিময়ে প্রাপ্ত সম্পত্তিও মুসলমানদের কোনো কাজে আসেনি।

লর্ড রিচার্ড যখন মৃত্যুবরণ করে, তার দস্তাবেজসমূহের মধ্যে বৃহত্তর ইসরাইলের পরিকল্পনা সামনে আসে। আর তাতেই প্রকাশ হয় যে বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সেই কুলক্ষণের সূচনামাত্র; যা ভবিষ্যতে আরও জঘন্য ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে। যদি এই মানচিত্রটি[১৩৮] আপনি দেখেন, তাহলে বুকে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করবেন—'হায়! এখন এসব স্থানের কোনটি তাদের আয়ত্তের বাইরে আছে?' শুধু আমি-আপনি নই; বরং পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহর মুখোমুখি হয়ে বিচারের আওতায় আসবে। তাদের প্রত্যেককেই এই উত্তর দিতে হবে যে, ইহুদিদের কাধে বসে চেপে আসা জায়নবাদী তুফানের বিরুদ্ধে সে কী ভূমিকা রেখেছিল? আমরা সবাই কি আরব শাসকদের মতো ইহুদি ও তাদের ক্রীড়নকদের জন্য পথ ছেড়ে দেবো? এটি মুসলমানদের চেতনার সামনে এমন চ্যালেঞ্জ, যা তাদের ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করে দেবে।

---

[১৩৮] নীলনদ থেকে টাইগ্রিস নদী পর্যন্ত, লেবানন থেকে মদিনা পর্যন্ত।

Scanned by CamScanner

# আল কুদুসের আত্মত্যাগীদের স্মরণ

১৯৮৭ সালের ৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেলের কথা। তখন ফিলিস্তিনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বিকাল হতেই ফিলিস্তিনের রাস্তাগুলো সুনসান নীরব হয়ে যায়। ফায়ারপ্লেইসের উষ্ণতার লোভে সবাই দ্রুত ঘরমুখী হয়। ফিলিস্তিনে ইহুদি আধিপত্যের প্রায় ৪০ বছর পূর্ণ হয়েছে।[১৩৯] ফিলিস্তিনি মুসলমানরা বিশ্বশক্তি ও তাদের পরিচালক ধূর্ত ইহুদিদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছিল। তারা সাধারণ চোখে ইহুদিদের এসব প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে বাস্তবিক অর্থে কোনো প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলেনি। জাতিগত বা সামগ্রিকভাবে ফিলিস্তিনের হানাদার বাহিনীদের প্রতি সাংগঠনিকভাবে কোনো তৎপরতা তখনো গড়ে ওঠেনি। মুসলমানদের মধ্যে একধরনের নীরবতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। অবশ্য এমন নীরবতা যা সমুদ্রের বুকে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে বিরাজ করে। উপনিবেশবাদী বৈশ্বিক শক্তি ও জায়নবাদী প্রতারকদের বিরুদ্ধে তাদের মনে যে লাভা ৪০ বছর ধরে জন্ম নিয়েছিল, তা যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। শুধুমাত্র একটি চালিকাশক্তি বা বিস্ফোরণের প্রয়োজন ছিল, যা সে মঙ্গলবারে একজন ইহুদি ড্রাইভার কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল।

বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ফিলিস্তিনিরা অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও বাসায় ফিরছিল। অসহায়-দরিদ্র এসব কর্মচারী গাদাগাদি করে পাবলিক পরিবহনে কর্মব্যস্ত দিন শেষে নিজের পরিবারের সাথে সামান্য সুন্দর সময় ব্যয় করতে ফিরে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে দৈত্যাকার একটি ট্রাক আসছিল, যার ড্রাইভিং সিটে ছিল এক কুচক্রী ইহুদি। ততদিনে ইহুদিরা নিজেদের হিংস্র কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ না হতে দেখে অত্যন্ত সাহসী হয়ে উঠছিল। নীচু প্রকৃতির লোকদের স্বভাব এই যে, তারা নিরীহদের সামনে সিংহ এবং শক্তিশালীর সামনে ভেজা বিড়ালে পরিণত হয়। এর বিপরীতে সম্ভ্রান্ত মানুষেরা শক্তিশালী

---

[১৩৯] পবিত্র ফিলিস্তিনভূমিকে ১৪ মে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহুদিরা দখলে নেয়।

Scanned by CamScanner

ব্যক্তির অযথা শক্তি প্রদর্শনে প্রতিবাদে দাঁড়িয়ে যায়। অন্যায় শক্তিকে কুচলে দেওয়া পর্যন্ত তারা পিছপা হয় না। অন্যদিকে নীচু লোকদের অযথা মন্দ কথার উত্তর দেওয়ার অযোগ্য ভেবে এড়িয়ে যায়। লক্কর ঝক্কর পরিবহনে দরিদ্র শ্রমিকদের ফিরে যেতে দেখে ড্রাইভিং সিটে বসা ইহুদির মাথায় শয়তান সাওয়ার হয়। এই হতভাগা ইচ্ছাকৃতভাবে উল্টো দিকে এগিয়ে শ্রমিক পরিবহনের গাড়িগুলোর ওপর ট্রাক উঠিয়ে দেয়। বৃহদাকার ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেয়ে সাধারণ গাড়িগুলো চুরমার হয়ে যায়। চারজন মুসলমান তাৎক্ষণিক শাহাদাতবরণ করেন এবং অসংখ্য আহত হন। ঘটনা ভয়াবহ হলেও হয়তো এতটা দীর্ঘসূত্র হতো না, যদি ইহুদি নেতৃবৃন্দ হঠকারিতা না করতো। তারা অবস্থানস্থলে পৌঁছে এবং সেইভাবে ড্রাইভারকে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার গাড়িতে বসিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তারা ভেবেছিল এ কাজে তারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে; কিন্তু এটি পরবর্তীতে তাদের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। স্পষ্ট পক্ষপাতমূলক এ অন্যায় আচরণ মুসলমানদের অন্তরের সুপ্ত বারুদে অগ্নিসংযোগ করে।

ইহুদি নেতৃবৃন্দের কারও মধ্যে মানবতার লেশমাত্র আছে বলে যারা কল্পনা করতো, তাদের এই অমূলক কল্পনাও দূরীভূত হয়ে যায়। আর তাই তারা শত্রুর হাতে একচেটিয়াভাবে মারা যাওয়ার পরিবর্তে 'মরো কিংবা মারো' ফর্মুলা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে। এই ইহুদি ড্রাইভার সেদিন নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারলেও সে তার পেছনে এমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়, যা ইহুদিদের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সে ওই দিন মুসলমানদের রক্তে এমন আগুন জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়, যা হানাদার বাহিনীর কূটকৌশলের প্রতিউত্তরে পরিণত হয়। যা হিংস্র ইসরাইলিদের ফিলিস্তিন হজমের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই আগুনের নাম ছিল ইনতিফাদা;[১৪০] যাকে পৃথিবীবাসী ফিলিস্তিনিদের জিহাদি তৎপরতা হিসেবে জানে।

আলোচনা, আন্দোলন ও রাজনীতি নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য সম্পূর্ণ অনর্থক—ফিলিস্তিনের সন্তানরা এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝে গেছে। তাই তারা নিজেদের লক্ষ্য আদায়ে ওই পন্থাকেই বেছে নিয়েছে, যা ইহুদিদের গলায় রশি লাগিয়ে এমন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে, যার ভয়ে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ফিলিস্তিনে এসে একত্রিত হয়েছিল।

---

[১৪০] বিপ্লব।

Scanned by CamScanner

ইনতিফাদা আন্দোলনের প্রথম শহিদ ছিলেন হাতেম আসসিসি। এরপর ফিলিস্তিনের আত্মোৎসর্গকারীরা বিপ্লবের এই মশালকে নিজেদের রক্ত দ্বারা সর্বদা প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন। আর এভাবেই ত্যাগ ও উৎসর্গের ইতিহাসে তারা এমন আলো জ্বালিয়েছেন, যা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীনতাকামীদেরও পথ দেখাতে সাহায্য করবে।

ইনতিফাদা আন্দোলন যদিও অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে; কিন্তু তা সর্বদিক থেকে কাজ করতে শুরু করে। এতে শুধু হানাদারদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানই নয়; বরং মুসলমান যুবকদের আত্মশুদ্ধিমূলক ধর্মীয় কাজে অভ্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান ছিল। এ দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ফিলিস্তিনের যে যুবকরা নিজেদের ইনতিফাদার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি এত চমৎকারভাবে পুরো করেছেন যে, আজ পৃথিবীতে কোনো বড় লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করা আর হামাসের মুজাহিদ হওয়া সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। অনেক মুসলমানের মনে এই প্রশ্ন জাগে—এ ধরনের আত্মঘাতী হামলা করে মুসলমানদের কী লাভ হয়; বরং উল্টো তাদের ওপর ইহুদিদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু এখানে এ কথা মনে রাখা উচিত, এ ধরনের হামলা শুরুর পূর্বে মুসলমানদের ওপর ইহুদিদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বেশি ছিল; বরং এখন প্রতিশোধের ভয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অত্যাচার থেকে বিরত থাকে। মুসলমান বসতিতে হামলা চালাতে আসা ইহুদি সৈন্যটিও এখন গোপন হামলার ভয়ে ভীত থাকে। ইদানীং এমন সংবাদও এসেছে যে, ইহুদি সৈন্যদের বিভিন্ন দল ফিলিস্তিনের মুসলমান বসতিতে ডিউটি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলমান বসতিতে হামলার আশঙ্কা নিয়ে ডিউটিরত অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের সৈন্যদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। অথচ ইতোপূর্বে তারা এককভাবে হামলা চালিয়ে যেত এবং নিঃসংকোচে নিরীহ মুসলমান নাগরিকদের রক্তে পবিত্র শহর রঞ্জিত করতো।

ডেরা ইয়াসিনের হত্যাযজ্ঞ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যা ৯ এপ্রিল ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র এক মাস পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। তখন ইহুদি গোয়েন্দা বাহিনী বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মুসলমানদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে ইহুদিদের সেখানে বসতি স্থাপন করার ব্যাপারে উদগ্রীব ছিল। ইংরেজদের নাকের নিচে থেকে ইহুদিদের কাছে সব

Scanned by CamScanner

ধরনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে যেত আর তার মাধ্যমে তারা নিরীহ মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে নিজেদের বীরত্বের ইতিহাস রচনা করতো।[১৪১]

ব্রিটিশ আইন শুধু মুসলমানদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র রাখা থেকে বাধা দিত। অবশ্য যেসব মুসলমান ফিলিস্তিন ত্যাগ করে অন্য কোনো দেশে পাড়ি জমাতে চাইত, ইংরেজরা অত্যন্ত উদার মনে তাদের সহযোগিতা করতো। ফিলিস্তিনি মুসলমানরা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে গিয়ে শরণার্থীর দুর্বিসহ জীবনযাপন করতেন। তাদের সেই জীবনযাপনের বিষাদময় চিত্র পরবর্তীতে *হে বনি ইসরাইল* নামক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে; যা পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব কুদরত উল্লাহ খানের আত্মজীবনী থেকে নেওয়া হয়েছে।

তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের ওপর কী ধরনের নির্যাতন করা হয়েছে তা একজন বিশিষ্ট পশ্চিমা লেখক 'আরনল্ড জে টইনবি' (Arnold J. Toynbee) তার বই *এ স্টাডি অব হিস্টোরি (A Study of History)*-তে বর্ণনা করেছেন। এসব অত্যাচারের উপাখ্যানে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'মুসলমানদের ওপর তাদের এই অত্যাচার কিছুসময় পূর্বে তাদের ওপর জার্মানির নাজিরা যে অত্যাচার করেছিল; তার চেয়েও জঘন্য। জার্মানিতে অত্যাচারের নির্মমতা তারা আস্বাদন করা সত্ত্বেও এরচে জঘন্য অত্যাচার করতে তারা দ্বিধাবোধ করেনি।

৯ এপ্রিল ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ, রাত। ডেরা ইয়াসিনের অধিবাসীরা এ রাতের কথা কখনো ভুলবে না। নিরীহ মুসলমানদের এই বসতিতে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইহুদি সৈন্যরা মানবতার ইতিহাসের এমন নোংরা অধ্যায় রচনা করেছিল, যা হয়তো মানবতার ন্যূনতম অধিকারী কারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। হিংস্র বাহিনীর সদস্যরা মুসলমান পুরুষ ও যুবকদের নির্বিচারে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে হত্যা করে।[১৪২] শিশু ও নারীদের সাথে যে জঘন্য আচরণ সেদিন করা হয়েছিল, হয়তো তাদের চিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়েছিল;

---

[১৪১] জি হ্যাঁ, ইংরেজদের নাকের নিচে। যে ইংরেজদের দেশে যেতে পারা আজকাল নতুন প্রজন্মের মুসলমান যুবকদের জন্য মিরাজ সমতুল্য এবং আজ তারা তাদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড ভুলে যেতে বসেছে।

[১৪২] এখানে স্পষ্ট করা উচিত, এই গ্রামের বাসিন্দারা ইয়াহুদিদের উপর কখনো কোনো ধরনের হামলা করেনি। তবুও তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের 'মানবতাকে থমকে দেওয়া' হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। আর আত্মঘাতী হামলাকারীদের সাফল্য এটাই যে, বর্তমানে ইয়াহুদিরা সেই সময়ের তুলনায় বেশি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের নির্মম অত্যাচারের চিন্তাও করে না।

Scanned by CamScanner

কিন্তু কঠোর হৃদয়ের এসব হিংস্র ইহুদিদের মনে তখন শয়তানি নৃত্য চলছিল। সেদিন তারা শিশু ও নারীদের জোর-জবরদস্তি করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের হাঁটতে বাধ্য করছিল। অত্যাচারে ক্লান্ত এসব নারী ও শিশুদের চতুর্পার্শে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ঠাট্টায় মেতে উঠেছিল। সেই বসতির মানুষদের জন্য সেই রাতটি কিয়ামাতের চেয়ে কম ছিল না। সম্পূর্ণ বিনা দোষে তাদের এমন নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিল, যা মানবাত্মাকে কাঁপিয়ে তোলে।

আফসোস আজ পর্যন্ত সেদিনের সেই নির্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হয়নি। সেদিনের ঋণ পরিশোধ করার আজও পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমান যুবকের দায়িত্বে রয়েছে। ইহুদিরা চাইলে নারী-শিশুসহ সবাইকে পুরুষদের মতো নির্বিচারে হত্যা করতে পারত; কিন্তু এতে তাদের নোংরা আত্মা পরিতৃপ্ত হতো না। তারা এসব নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মধ্যে আমেরিকার দেওয়া ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্রের ভয় বদ্ধমূল করে দিতে চেয়েছিল। রাতের সেই শয়তানি তাণ্ডব অবসানের পরবর্তী দিন ইহুদিরা সাজোয়া যানে করে ঘোষণা করতে থাকে—'ডেরা ইয়াসিনের বাসিন্দাদের সাথে আমরা এমন (নির্মম) আচরণ করেছি। তোমরা যদি এ ধরনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি চাও, তাহলে স্বেচ্ছায় এ অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যাও।'

পাঠক, কল্পনা করতে পেরেছেন সেদিনের এই হত্যাযজ্ঞের নেতৃত্বে কে ছিল? সে ছিল ওই অত্যাচারী হিংস্র পশু; যাকে বিশ্ববাসী এরিয়েল শ্যারন নামে চিনে এবং তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করতে ফিলিস্তিনিদের উপদেশ দেয়। কুখ্যাত সেই কসাই এ হত্যাযজ্ঞের খবর শুনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশংসা করে বলে, 'আজ তোমরা ইতিহাস রচনা করেছো। ইহুদি জাতি চিরদিন তোমাদের স্মরণ রাখবে।'

এসবের বিপরীতে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের কিছু করার ছিল না। অন্যদিকে অভিশপ্ত ইহুদিরা এভাবে ইতিহাস রচনা করে যেতে থাকত, যদি ডিসেম্বরের এই ঘটনা না ঘটতো; যার আলোচনা এই অধ্যায়ের শুরুতে করা হয়েছে এবং যার মাধ্যমে মুসলমানরা কিছু একটা করার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছে।

সমরাস্ত্র ও সৈন্য-স্বল্পতায় পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত গেরিলাযুদ্ধ ফিলিস্তিনের ভৌগলিক অবস্থার কারণে সেখানের মুজাহিদদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর তাই তারা সমরবিদ্যার ইতিহাসে এমন এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করে, যা আত্মঘাতী হামলা নামে পরিচিত। এটি একদিকে যেমন নিঃস্ব অসহায়

Scanned by CamScanner

মুসলমানদের জন্য সর্বশেষ অস্ত্র, অন্যদিকে শত্রুদের জন্য এমন দোধারি তলোয়ার; যার সামনে তারা দ্বিধাগ্রস্ত যে, এই হামলা তাদের সামনের দিক থেকে হবে না পিছন দিক থেকে হবে।

প্রথমদিকে মুজাহিদরা আত্মঘাতী হামলাকারীদের পরিচয় প্রকাশ করতো; কিন্তু এর ক্ষতিকর দিক ছিল—ইহুদি সৈন্যরা আত্মোৎসর্গকারীদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিত। পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এ ধরনের বীরদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে না।

বর্তমানে আত্মত্যাগের এমন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে যে, বিদেশ থেকে আগত মুজাহিদরাও এ ধরনের আত্মঘাতী বোমা হামলায় অংশগ্রহণ করে ভ্রাতৃত্ববোধের অধ্যায়ে এক নতুন যুগের সূচনা করে যাচ্ছেন। আত্মত্যাগ এবং জান্নাতি সফরে এই কাফেলার অগ্রগতি বেড়েই চলছে। পবিত্র ভূমির জন্য শহিদদের পবিত্র আত্মা উৎসর্গিত হয়েই যাচ্ছে, যার সমাপ্তি হজরত ইসা আ.-এর বিজয়ের মাধ্যমে হবে।

ফিলিস্তিনের আত্মত্যাগীরা! তোমাদের এই আত্মত্যাগ বরকতময় হোক।

Scanned by CamScanner

# হে বনি ইসরাইল

বৈরুতকে পৃথিবীর এমন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়, যেখানে দারিদ্রতা অপরাধ নয়; কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ। এয়ারপোর্টের বাইরে এক পুলিশ কনস্টেবল পর্যটকদের আশেপাশে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত লোকদের হাতের লাঠি দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। ফিলিস্তিনের একটি শরণার্থী পরিবার পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে ভীতসন্ত্রস্তভাবে দাঁড়িয়েছিল। বাহ্যদৃষ্টিতে তারা ভিক্ষা করছিল না; কিন্তু তাদের চেহারা যেন নিজেদের অসহায়ত্ব ও অভাবের দাস্তান বর্ণনা করেছিল। সেই পরিবারে ছয়-সাত বছরের একটি ছেলে ও আট-নয় বছর বয়সী একটি মেয়ে ছিল। সময়ের পূর্বে সমাপ্তিঘটা বসন্তকালের স্পষ্ট ছাপ ছিল তাদের মায়ের চেহারায়। সে একবার নিজের সন্তানদের দিকে তাকাচ্ছিল আরেকবার পথচারীদের দিকে, আরেকবার পুলিশের দিকে; যে লাঠি দিয়ে ভিক্ষুকদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে ছেলেটি বলল, 'আপনি কি আমাদের ছবি তুলতে চান?' আমাদের দেশে যেমন চকলেট বা জুতা পালিশের বাহানায় ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করে, ঠিক তেমনিভাবে এখানে ফিলিস্তিনিরা ছবি উঠানোর বিনিময়ে সাহায্যের আশা করে। তাদের চমৎকার শারীরিক গঠন, কাটা কাটা চেহারা এবং টানা টানা চোখ চিত্রকরদের আকর্ষণ করে এবং ক্যামেরাধারী বিদেশি পর্যটকরা তাদের ছবি তোলে উদারমনে বখশিস দিয়ে থাকে।

ফটো তোলার কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, শিশুটিকে গলায় জড়িয়ে ধরি এবং বলি, 'হে নিষ্পাপ ফেরেশতা! আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন চিত্রকর তৈরি হয়নি, যে তোমার সৌন্দর্য ক্যামেরায় বন্দি করতে পারে। তোমার পোশাক ছিন্নবিচ্ছিন্ন এবং তপ্ত রোদে তুমি খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করছ। তোমার চোখের পানিও হয়তো শুকিয়ে গেছে। ওই তোমার মা, যাকে সৃষ্টিকর্তার সময়ের পূর্বে বৃদ্ধা বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কম্পিত ঠোঁটে হয়তো কোনো ফরিয়াদ বের হতে চাচ্ছে; কিন্তু পুলিশের ভয়ে সে মুখ খুলতে পারছে না। অথবা তার রাগান্বিত ঠোঁটে এমন কোনো অভিশাপ আসতে চাচ্ছে, যা শুধু সে এই ভয়ে থামিয়ে রেখেছে; যেন পৃথিবী আদ এবং সামুদ গোত্রের ন্যায় ধ্বংস না হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

আর ওই যে তোমার ছোট বোন, যে এক হাতে তোমার মাকে ধরে রেখেছে আরেক হাতে তোমাকে হাতের ইশারায় ডাকছে। সে ভয় পাচ্ছে, যেন পথচারীরা তোমাকে তাদের সাথে অপহরণ করে নিয়ে না যায়। তার নিষ্পাপ তুলতুলে পা যুগলও জুতাহীন। তার পোশাক ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তার কোঁকড়ানো সোনালি রেশমি চুলগুলো বার বার মুখের উপর চলে আসছে। সেই সোনালি চুলে বালুকণাগুলো মুক্তোর ন্যায় ঝলমল করছে। শিশুটির চোখের পলক টানা টানা এবং তীক্ষ্ণ। তারা উদাস চাহনিতে নীল সমুদ্রের গভীরতা দৃশ্যমান। যদি এই সুন্দর শিশুটি আকাশে জন্মগ্রহণ করতো, তাহলে হয়তো সে হুর হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু এই নিষ্পাপ পৃথিবীতে মানুষরূপী ইহুদিদের অত্যাচারে স্রষ্টার এই অপূর্ব সৃষ্টি ক্ষুধায় কাতর, ভীতসন্ত্রস্ত ও অসহায়-আশ্রয়হীন।

শিশুটির ত্বক ছিল জাইতুন ফলের মতো মসৃণ এবং উজ্জ্বল। তার রক্তে দেড় হাজার বছর পূর্বের ফিলিস্তিনের স্বচ্ছ পানি এবং ফুলের ঔজ্জ্বল্য ও ফিলিস্তিনের আঙুরের রসের সমাহার রয়েছে। এই শিশুটির অস্তিত্বে হাজার বছরের আল কুদুসভূমির পবিত্রতার আমানত সমাহিত রয়েছে। যার লালন-পালন বড় বড় বুজুর্গদের দেখাশোনায় হয়েছিল। যার দীক্ষায় আসমানি কিতাবসমূহের হাত রয়েছে, যা এই পবিত্র ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই শিশুটির পূর্বপুরুষরা আড়াই হাজার বছর ধরে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে সমাহিত রয়েছেন; অথচ আজ সে এক টুকরো রুটির আশায়, সামান্য একটি আশ্রয়ের আশায় খালি পায়ে, ময়লা পোশাকে বৈরুতের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেননা, বনি ইসরাইলদের তাদের আড়াই হাজার বছর পূর্বকার সেই নিবাসের স্মরণ এসেছে, যেখানে থেকে প্রভু তাদের অভিশপ্ত করে বহিষ্কৃত করেছিলেন।

বর্তমান ইহুদিদের মাকদিস গ্রন্থ 'বেলফোর ঘোষণা' ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নাজিল করা হয়েছিল। যেখানে এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে, 'ব্রিটেন সরকার ফিলিস্তিনে ইসরাইলের একটি জাতীয় নিবাস তৈরির অধিকারকে সমর্থন করে এবং ইহুদিদের যথাসম্ভব সহযোগিতা করবে।'

যতটা শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের সাথে ইহুদিরা এই ঘোষণাকে অনুসরণ করে, যদি এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সাথে সত্যিকার আসমানি কিতাবের অনুসরণ করতো, তাহলে দীর্ঘদিন যাবৎ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে অভিশপ্ত হয়ে তাদের ঘুরতে হতো না।

হে বনি ইসরাইল, ওই যুগকে স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদের পৃথিবীবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। যখন আল্লাহ তোমাদের

Scanned by CamScanner

ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন; যে তোমাদের ভয়াবহ শাস্তি আস্বাদন করাতো। তোমাদের ছেলে-সন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের কন্যা-সন্তানদের নিজেদের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য জীবিত রাখত। এবং যখন মহান আল্লাহ তোমাদের জন্যে নদীকে বিদীর্ণ করেছিলেন এবং তোমাদের নিরাপদে পার করেছিলেন আর দেখতে দেখতেই ফেরাউনের গোষ্ঠীকে নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের মেঘমালার ছায়া দিয়েছিলেন এবং তোমাদের জন্য মান্না ও সালওয়া নাজিল করেছিলেন। যখন মুসা আ. নিজের লাঠি দিয়ে পাথরকে আঘাত করেছিলেন এবং তোমাদের জন্য ১২টি পানির প্রসবন বের হয়েছিল।

হে বনি ইসরাইল, ওই দিনকে স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রভু তোমাদের কাছ থেকে শপথ নিয়েছেন যে, তোমরা অন্যায়কে ন্যায়ের সাথে মিশ্রিত করবে না। এবং আল্লাহর বাণীকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করবে না। কিন্তু তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করোনি এবং গোঁয়ার্তুমি করে গো-বৎসকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছ। তোমরা 'মান্না-সালওয়া'র নিআমাতের বিনিময়ে শাক, কাকড়ি[১৪৩], রসুন-পেঁয়াজ ও মসুর ডালের নিবেদন করেছিলে। গোঁয়ার্তুমি করে তোমরা বিভিন্ন নবিদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে এবং অনেক নবিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলে। তোমাদের সেসব পাপের শাস্তি হিসেবে কখনো আল্লাহ তোমাদের একে অপরকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। কখনো তোমাদের বিদ্যুৎ-বর্ষণে হত্যা করা হয়েছিল, কখনো অভিশাপে তোমাদের বানরে পরিণত করা হয়েছিল এবং কখনো তোমাদের মাথার উপর তুর পাহাড় লটকে দেওয়া হয়েছিল।

হে বনি ইসরাইল, নিঃসন্দেহে তোমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে পাথরের ন্যায় বা আরও কঠোর। পাথরের মধ্যে তো কিছু পাথর এমন রয়েছে, যা থেকে পানি নির্গত হয়; আবার কিছু পাথর এমন রয়েছে, যা ভাঙা হলে ভিতর থেকে পানি বের হয়।

হে বনি ইসরাইল, আজ তোমাদের এতটাই মানসিক বিকৃতি ঘটেছে, যেমন তোমাদের পূর্বপুরুষরা তাওরাতকে বিকৃত করেছিল। তোমাদের শরীরে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে ইসরাইলি রক্ত নিতান্তই কম। শত শত বছর ধরে তোমরা লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হয়ে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ঘুরেছো, বিভিন্ন জাতির

---

[১৪৩] শসার মত একধরণের সবজী।

Scanned by CamScanner

সাথে তোমাদের রক্ত এতটাই মিলে মিশে গিয়েছে যে, বংশগত আলাদা কোনো স্বাতন্ত্র তোমাদের মধ্যে বাকি নেই। এমনিতেও মহান আল্লাহ প্রেরিত রাসুলদের পরিবর্তে আমেরিকা এবং ব্রিটেনকে তোমরা নিজেদের নবি হিসেবে গ্রহণ করেছ আর 'বেলফোর ঘোষণা'কে তাওরাতরূপে। কিন্তু মনে রেখো, ওই আরব শিশুর ভীতসন্ত্রস্ত অন্তর এবং তাঁর মায়ের শোকার্ত ফরিয়াদ তোমাদের মাথার উপর তুর পাহাড়ের চেয়েও ভয়ংকররূপে লটকে আছে। সেই শিশুর নিষ্পাপ চাহনিতে ক্ষোভ ও ক্রোধের বিষাক্ত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যদিও বর্তমানে বানরে রূপান্তরিত করার প্রচলন নেই; তবু মনে রেখো, স্রষ্টা তার প্রতিশ্রুতি ভুলে যাননি। আমেরিকা আর ব্রিটেনের বানানো সোনার গো-বৎসকে যতটা সম্ভব পূজা করে নাও; কিন্তু মনে রেখো, শাস্তির যে শেকল তোমাদের গলায় লেগে আছে, তা থেকে কোথাও পলায়ন করতে পারবে না।[১৪৪]

## দুটি কবর একটি শিক্ষা

নব্বু চাচা আর তুরি মামা দুটি চমৎকার চরিত্র ছিল। আমরা আজ পর্যন্ত এ সমাধানে পৌছতে পারিনি যে, তাঁদের ব্যক্তিত্ব বেশি চমৎকার ছিল, না তাদের কর্মকাণ্ড। উভয় চরিত্রের আলাদা রঙ-বিশেষ পোশাক ও স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাঁদের উভয়ের মাঝে গভীর অনুরাগ ও ভালো বন্ধুত্ব ছিল। তুরি মামা ও কম ছিলেন না; কিন্তু আমরা আজ এখানে নব্বু চাচাকে নিয়ে আলোচনা করব। তুরি মামার আলোচনা সামনে করা হবে। নব্বু চাচার বয়স পঞ্চাশের কোঠায় এলেও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং উচ্চ আওয়াজের অধিকারী ছিলেন। একবার তার কর্মচারী জখমি হয় এবং তাকে ব্যান্ডেজ লাগানো হয়। তুরি মামা নব্বু চাচাকে পরামর্শ দিলেন, যেন তাকে জোরে ডাকা না হয়; কারণ, এতে (আওয়াজের তীব্রতায়) তার ব্যান্ডেজ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

নব্বু চাচা পেশায় কসাই হলেও নিজের চমৎকার চারিত্রিক গুণাবলি ও উন্নত মানসিকতায় আমাদের যুগে এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন, যা আজ 'চিজ বার্গার' ও 'এন্টিনা-ইন্টারনেট'-এর সভ্যতায় হারিয়ে গেছে। আমরা এখানে তাঁর এবং তাঁর গৃহপালিত কয়েকটি বিড়ালের এমন শিক্ষার কথা আলোচনা করব, যেখানে কয়েকটি চমৎকার শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

এমনিতেই প্রতিটি কসাই দোকানের পাশে কিছু বিড়াল ঘোরাঘুরি করে থাকে; কিন্তু নব্বু চাচার দোকানের আশেপাশের বিড়ালগুলো ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম।

---

[১৪৪] শিহাবনামা : ৫৯০-৫৮৩।

Scanned by CamScanner

এই বিড়ালগুলো শারীরিক কাঠামো এবং ওজনের দিক থেকে বিভিন্ন কোয়ালিটির থাকলেও তাদের সবার মাঝে একটা অসাধারণ গুণ বিদ্যমান ছিল। একদিকে তারা শুধু ওই মাংসে মুখ দিত, যা নব্বু চাচা তাদের খেতে দিত। এর বাইরে অন্য কেউ যদি ভালো কোনো মাংসও তাদের দিকে নিক্ষেপ করতো, তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতো না। অন্যদিকে নব্বু চাচা কোনো মাংসের টুকরো নিক্ষেপ করলে সবগুলো বিড়াল একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তো না। কোনো বিড়াল যখন সেদিকে যেত, অন্যগুলো চুপচাপ নিজেদের সিরিয়ালের অপেক্ষা করতো।

বিড়াল, চিল এবং কবুতরকে মাংস ও শস্য খাওয়াতে অনেককে দেখা গেছে; কিন্তু নব্বু চাচার বিড়ালদের ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। কেননা, তিনি তার বিড়ালগুলোকে অমুখাপেক্ষিতা এবং অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা ছিল অনন্য। বর্তমানে তো এ ধরনের শিক্ষা কোনো শিক্ষকের ছাত্র, কোনো পীরের মুরিদ বা কোনো সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। মাংস খাওয়ার এই নিয়ম-শৃঙ্খলা ব্যতীত আরও একটি চমৎকার বিষয় এদের মধ্যে পরিলক্ষিত হতো; আর সেটি দেখা যেত যখন নব্বু চাচা তুরি মামার বৈঠকখানায় গিয়ে আড্ডা জমাতেন।

নব্বু চাচা অল্পেতুষ্ট একজন নির্লোভ মানুষ ছিলেন। তার দোকান এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সেখানে এত উত্তম মানের মাংস পাওয়া যেত, যেখানে অন্যান্য দোকানগুলো দুপুর হতেই বন্ধ হয়ে যেত। তিনি ইচ্ছে করলে তার দোকান রাত পর্যন্ত চালাতে পারতেন। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে মাংস বিক্রি হয়ে গেলে স্বেচ্ছায় তিনি দোকান বন্ধ করে দিতেন। তার একটি কারণ তো এটা ছিল যে, তার মধ্যে অধিক লাভের লোভ ছিল না। অন্যদিকে তিনি ভাবতেন— তাঁর আশেপাশের অন্যান্য দোকানিদেরওতো বিক্রির হক আছে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা আমার প্রয়োজনীয় পরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক রিজিক দিয়েছেন, তাহলে আমার এমন কিছু করা উচিত নয়; যার দ্বারা প্রতিবেশী কসাইদের স্ত্রী-সন্তানদের খাদ্যের জন্য সংগ্রাম করতে হয়।

কখনো এমন হতো, যখন নব্বু চাচা দেখতেন—তাঁর সামনের দোকানি গ্রাহকের অভাবে শুধু ছুরিতে ধার দিয়ে যাচ্ছে বা মাছি মারছে। তখন অযথাই তাঁর কাছে আসা গ্রাহকের কাছে মাংস বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানাতেন; যেন সে ওসব দোকান থেকে মাংস ক্রয় করে।

Scanned by CamScanner

একটু ভেবে দেখুন, বর্তমানে এ ধরনের অল্পেতুষ্টি, অন্যের সহযোগিতা শুধু কসাইদের মধ্যেই নয়; বরং বহু জ্ঞানের অধিকারী শিষ্টাচারী ব্যক্তিদের মধ্যেও কি এসবের বিবেচনা রয়েছে?

যাইহোক, বলছিলাম নব্বু চাচার দোকান বন্ধ করে ফেরার দৃশ্যটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। প্রতিদিন বিকেলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মাংস বিক্রি হলে তিনি দোকান বন্ধ করে দিতেন। যতক্ষণে কর্মচারী ছোট দোকানটি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতো ততক্ষণে নব্বু চাচা নিজে হাত-পা ধুয়ে পরিপাটি হয়ে তুরি মামার বৈঠকখানার দিকে রওনা হতেন। সেখানে দিনের বাকি সময়টি দুজনে মিলে গল্পগুজব করে কাটাতেন। যখন প্রস্তুত হয়ে চাচা বের হতেন, তখন প্রায় একডজন বিড়াল তাঁর সাথে সাথে রওনা হতো। কোনোটি তার পায়ে শুয়ে পড়তো, কোনোটি ঘাড়ে উঠে যেত, কোনোটি ডানে-বামে চলতো আবার কোনোটি তাঁর কোলে উঠতে চাইত। চাচার স্পেশাল চলার ধরন এবং তার পেছনে বিড়ালদের র‍্যালি যথেষ্ট উপভোগ্য ছিল। তিনি যেমন বিড়ালদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তেমনি বিড়ালও তাঁর জন্য উৎসর্গিত ছিল। বিড়ালদের এই র‍্যালি ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকত, যতক্ষণ পর্যন্ত তুরি মামার কণ্ঠে 'ওয়া লাইকুমুস সালাম' না-শোনা যেত। যখন নব্বু চাচা বৈঠকে বসে যেতেন, ঠিক তখনই বিড়ালগুলো পরবর্তী দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যেত; যেন তাদের উপস্থিতি এদের বৈঠকের বিঘ্ন না ঘটায়।

শিষ্টাচারের দৈন্যতার এ যুগে নিজের মুরব্বি ও উপকারী ব্যক্তির প্রতি এতটা আনুগত্য ও শিষ্টাচারের বহিঃপ্রকাশ কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। অশিক্ষিত নব্বু চাচা ও তাঁর এই বিড়ালদের কাহিনির মধ্যে শিষ্টাচারের এমন সবক রয়েছে; যা বর্তমানের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির মজলিসেও শিখতে পাওয়া যায় না।

পাঠক হয়তো আশ্চর্য হবেন; কিন্তু নব্বু চাচার বিড়ালদের মধ্যে যে দুটি গুণ ছিল; তা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়। মানুষ যদি শিখতে চায়, তাহলে প্রাণীকুলের মধ্যেও অনেক কিছু শেখার রয়েছে।

ফুকাহায়ে কিরাম ফাহাদ[১৪৫] নামের একটি প্রাণীর ব্যাপারে যে পর্যবেক্ষণ পেশ করেছেন, তা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে।[১৪৬] ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন,

---

[১৪৫] একধরনের চিতাবাঘ।

Scanned by CamScanner

'এই প্রাণীটি এত চমৎকার গুণাবলির অধিকারী, যা যেকোনো মানুষ গ্রহণ করলে অত্যন্ত উত্তম চরিত্রের ধারক হতে পারে।' ফিকহে হানাফির প্রসিদ্ধ কিতাব *ফাতওয়ায়ে শামির* কিতাবুস সাইদের[১৪৭] একটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ দেওয়া হলো—

> শামসুল আইম্মা সারাখসি তাঁর উস্তাদ শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ি থেকে বর্ণনা করেন—এই ধরনের চিতাবাঘের মধ্যে বিশেষ কিছু গুণ পাওয়া যায়, যা প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের গ্রহণ করা উচিত। তার মধ্যে একটি হলো, সে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রথমে লুকিয়ে থাকে এবং সুযোগের অপেক্ষা করে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত, শত্রুর ব্যাপারে বিচলিত না হয়ে প্রতিশোধের জন্য মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষা করা; যেন ধীরেসুস্থে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।
>
> এর মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি গুণ লক্ষ্য করা যায়—প্রশিক্ষণকালীন কোনো ভুলের জন্য শাস্তি দিলে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সেক্ষেত্রে তাকে শেখানোর উপায় হচ্ছে, একই ভুলের জন্য তার সামনে কোনো কুকুরকে শাস্তি দেওয়া; যা দেখেই সে শিখে নেয়। বুদ্ধিমান লোকও এমনই হয়, যে অন্যের মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করে। যেমন, আরবি ভাষার প্রসিদ্ধ বাণী রয়েছে—'সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যিনি অন্যের মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, অন্য কাউকে বিপদে নিপতিত হতে দেখলে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে সংযত করে ফেলেন।'
>
> এই প্রাণীটির আরেকটি গুণ হচ্ছে, সে কখনো পচা মাংস খায় না; বরং নিজের মালিকের কাছ থেকে সর্বদা টাটকা মাংসের প্রত্যাশা করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও এমন হওয়া উচিত, যে সর্বদা নিজের প্রভুর পক্ষ থেকে হারামকৃত কোনো খাদ্যে মুখ দেবে না।
>
> তার মধ্যে আরেকটি গুণ হচ্ছে, কোনো শিকারি প্রাণীর ওপর তিনবার বা পাঁচবার আক্রমণ করে ব্যর্থ হলে বারংবার আক্রমণ করে না। এর পরেও

---

[১৪৬] অনেকে ফাহাদ শব্দের অর্থ চিতাবাঘ মনে করেন। কিন্তু চিতা মানুষের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে না। মূলত এটি বিড়াল ও চিতাবাঘের মাঝামাঝি একটি প্রাণী। প্রাণীদের মধ্যে একে শিকারের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে সে এতটাই ভালো শিকারি, যেমন পাখিদের মধ্যে বাজপাখি।

[১৪৭] শিকারের অধ্যায়।

Scanned by CamScanner

যদি শিকার তার হস্তগত না হয়, সে অযথা তার পিছনে ঘোরাঘুরি করে না।[১৪৮]

বাস্তবতা এই যে, আত্মমর্যাদাবোধ, দায়িত্বশীলতা, ত্যাগ, উৎসর্গ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি গুণাবলি যদি কোনো প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তা তাকে এক বিশেষ অনন্যতা দান করে। কিন্তু যদি কোনো মানুষ এসব গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সে পশুর চেয়েও অধম বলে বিবেচিত হয়। যদিও বর্তমানে বস্তুবাদী জগতে উন্নত চরিত্রের এসব মানবিক গুণাবলির বিশেষ মূল্য নেই; কিন্তু তবুও এসব এমন বাস্তবতা, যা অস্বীকারের সুযোগ নেই।

কারও যদি বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, তাহলে বায়তুল মাকদিসের পশ্চিম দেয়াল সংশ্লিষ্ট দুটি কবর দেখে নিতে পারেন। তাহলে এ বাস্তবতা অনেকটাই বুঝে আসবে। এ দুটি কবর পাশাপাশি দুটি রুমে অবস্থিত। তন্মধ্যে একটি এমন একজন প্রবাসী ব্যক্তির, যিনি উসমানি খিলাফাতের সহযোগিতা এবং উপমহাদেশের মুক্তির লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। সব ধরনের ত্যাগের পাশাপাশি উচ্চমানের বক্তা হিসেবে নিজের যাবতীয় সামর্থ্য মুসলমানদের সফলতার পেছনে ঢেলে দিয়েছিলেন। যদিও তিনি মুসাফির অবস্থায় পরদেশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর নামের মতো তাঁর কবরের যে মর্যাদা অর্জিত হচ্ছে, তা কখনো মুছে যাবে না। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের স্বাধীনতার বীরসেনানী খিলাফাত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আলি জাওহার।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলি জাওহার লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতে থাকাবস্থায় তিনি ডায়বেটিসে আক্রান্ত ছিলেন।

হিন্দুস্তানের সর্বত্র ১ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রজা-আন্দোলন জোরেশোরে চলছিল। প্রায় ১ লাখ মানুষকে জেলে বন্দি করা হয়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের ৮৬ জন প্রতিনিধিকে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের জন্য ভাইসর-এর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তন্মধ্যে ৫৭ জন ব্রিটেন-প্রবাসী ইন্ডিয়ান, ১৭ জন ভারতের জমিদার এবং ১৩ জন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ; যাদের মধ্যে আগা খান, মাওলানা মুহাম্মাদ আলি জাওহার, মাওলানা শওকত আলি প্রমুখ ছিলেন।

১২ নভেম্বর ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী সেন্ট জন প্রাসাদে এ গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করেন। আশানুরূপভাবেই এ গোলটেবিল

---

[১৪৮] রাদ্দুল মুহতার; কিতাবুস সাইদ : ৬/৪৬৭)

Scanned by CamScanner

বৈঠকে কোনো ফলাফল আসেনি। তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধি-দলের সদস্যদের এ কথা বলে সময়ক্ষেপণ করতে চাইলেন যে, 'আপনারা দেশে ফিরে যান এবং নিজ নিজ দলের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে এমন সমাধান বের করুন, যা সবার জন্য উপকারী হবে।'

ঠিক তখনই মাওলানা মুহাম্মাদ আলি জাওহার তার সেই বিখ্যাত বক্তব্য দিয়েছিলেন, যেখানে ভারতের সকল রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারকেও তুলোধুনা করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য সকল বক্তব্যের মতো এই বক্তব্যও ভারতের ইতিহাসে সর্বদা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরপরেই ভারতের এই হিতাকাঙ্ক্ষী চিরদিনের জন্য হারিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে শুধু ব্রিটেন ও ভারতে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যেই নয়; বরং পৃথিবীব্যাপী তাঁর অনুসারীদের মধ্যে শোক ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটেনে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের অনেকে চেয়েছিল যেন ব্রিটেনে তাঁকে দাফন করা হয়। ভারত থেকে তাঁর বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরা এ মর্মে টেলিগ্রাম করেছিলেন—'যেন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর পৈতৃক ভূমি রামপুরে পূর্বসূরিদের কবরের পাশে দাফন করা হয়।' কিন্তু বায়তুল মাকদিসের পবিত্র ভূমিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়া ছিল তাঁর ভাগ্যের লিখন।

ইসলামি ইতিহাসের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ফিলিস্তিনের প্রসিদ্ধ নেতা মুফতি আমিন আল হুসাইনি মরহুমের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের এ পরামর্শ দেন, যেন তাঁর লাশ বায়তুল মাকদিসে আনা হয় এবং সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। মুফতি সাহেব এ মর্মে মাওলানা শওকত আলিকে টেলিগ্রাম করেন এবং তাঁকে অবগত করেন যে, মসজিদে আকসা কম্পাউন্ডের ভেতরে একটি কক্ষে মাওলানা জাওহারের এক অজ্ঞাত হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁর কবরের জন্য জায়গা দিতে চায়। এই টেলিগ্রাম মাওলানার দাফন নিয়ে চলা সকল বিতর্কের অবসান ঘটায়। মাওলানার আত্মীয়রাও এতে সন্তুষ্ট হয় এবং ব্রিটেনবাসীকেও থেমে যেতে হয়।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর দেহকে ফিলিস্তিনে পৌঁছানোর জন্য সামুদ্রিক জাহাজে করে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়। মিসরের পোর্ট সাইদ বন্দরে মাওলানার লাশকে শেষবারের মতো দেখা এবং দুআ করার জন্য হাজার হাজার মিসরবাসী উপস্থিত ছিল। যখন মাওলানার লাশ সেখানে পৌঁছে, সবাই লাশের সাথে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওনা করে। ফিলিস্তিনে তাঁর জানাজায়

Scanned by CamScanner

ভক্তদের বিশাল সমাবেশ ঘটে। যার সংখ্যা প্রায় ১ লাখের উপর পৌঁছেছিল বলে জানা যায়।

যে কক্ষে মাওলানাকে দাফন করা হয়েছিল তা ছিল একজন দরিদ্র ফিলিস্তিনির। যিনি মসজিদে আকসার একজন সেবক ছিলেন। পূর্বপুরুষদের থেকে পৈতৃকসূত্রে এই সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ জাওহারের জাতির জন্য বিভিন্ন ত্যাগের উপাখ্যানে তিনি তাঁকে এতটাই ভালোবেসে ফেলেছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর মুফতি সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে এই জায়গা মাওলানার কবর হিসেবে নির্ধারণ করার অনুরোধ জানান। তাঁর এই ভালোবাসার নজরানাকে ফিলিস্তিনি মুলমানদের ভাতৃত্ববোধ ও অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতার জ্বলন্ত উদাহরণ। যেখানে এসব জায়গায় চড়ামূল্য। সাধারণত অল্প একটু জায়গাও পাওয়া যায় না, সেখানে এই মহান মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই জায়গাটি ছেড়ে দেন। আর এভাবেই কোনো ধরনের মূল্য না নিয়ে ভ্রাতৃত্বের চাবিকাঠি নিজের হস্তগত করে নেন। সেই সময়ের বিভিন্ন ভারতীয় পর্যটক জানিয়েছেন, যখন ওই ব্যক্তি তাঁদের মাওলানার কবরস্থান দেখান, তারা খুশি হয়ে তাঁকে কিছু হাদিয়া দিতে চান; কিন্তু তিনি কোনোকিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

দ্বিতীয় কবরটি ওই হতভাগা ব্যক্তির, যে কিনা মুসলমানদের ইউরোপ ও আমেরিকার দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে সহযোগিতা করে। হিজাজের পবিত্র ভূমিকে উসমানি খিলাফাত থেকে বিচ্ছিন্ন করার দায় নিয়ে একসময় নিজের মনিবদের কাছেও অবহেলিত হয়ে নিগ্রহের মৃত্যুবরণ করে। শরিফ হুসাইন নামে সে পৃথিবীবাসীর কাছে পরিচিত। তার কবরও মাওলানার কবরের একদম পাশে অবস্থিত। যদিও ফিলিস্তিনবাসী তার কবরের পাশে যাওয়াকেও নিজেদের জন্য অপমানের কারণ বলে মনে করে। অথচ মাওলানার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সুবিদিত। যদিও শরিফ হুসাইন তাঁদের স্বজাতি এবং একই ভাষাভাষী; অন্যদিকে মাওলানা ভারতের এক অপরিচিত মুসাফির; যাঁর সাথে তাঁদের কোনো বন্ধন নেই।

বাস্তবতা এটাই যে, মহান আল্লাহ কখনও মানুষের বিশেষ মানবিক গুণাবলিকে এতটাই কবুল করেন, যদিও বাহ্যত সে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না; তবুও অনেক সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে এসব গুণাবলির অভাবে অনেক মানুষ পৃথিবীতে সামান্য অর্থ-মুদ্রা অর্জন করতে পারলেও অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার গ্লানি নিয়ে বেড়ায়।

Scanned by CamScanner

ক্ষমতার লোভে শরিফ হুসাইন শুধু আরবদের সাথে নয়; বরং ভারতের মুসলমানদের সাথেও প্রতারণা করে ছিল। সে শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রাহ.; যিনি তুরস্কের উসমানি খিলাফাত থেকে ভারতের মুসলমানদের জন্য সহযোগিতার পয়গাম নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ইংরেজদের হাতে বন্দি করিয়ে দেয়। যদি সে এ ধরনের জঘন্য প্রতারণা না করতো আর শায়খুল হিন্দ তুরস্কের অর্থ ও সমরবিদদের সহায়তায় আফগানিস্তান থেকে ভারতের ওপর হামলা করতে সক্ষম হতেন, তাহলে হয়তো ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার পাশাপাশি তুরস্কের উসমানি খিলাফাতকেও রক্ষা করা সম্ভব হতো।

ইংরেজদের প্ররোচনায় সে এসব ঘৃণ্য কাজ সম্পাদন করে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ব্রিটিশদের চোখে 'আলে সৌদ'-এর মর্যাদা বেড়ে যায়, তখন তারা তাকে জর্দানে নির্বাসিত হতে বাধ্য করে। জর্দানে পৌঁছে সে ইসরাইলের পাশে নিজের অবর্তমানে একদল গাদ্দার শাসক তৈরি করে মৃত্যুবরণ করে। আর তখন ব্রিটিশ সরকার তাকে নিজেদের করতলগত বায়তুল মাকদিসে দাফন করে।

তারা হয়তো ভাবেনি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার অধিকারীদের যে সম্মান প্রাপ্য, ব্রিটিশরা কি কখনো তাকে তা দিতে পারবে? বায়তুল মাকদিসের পশ্চিম দেয়াল-সংশ্লিষ্ট এ দুটি কবর।[১৪৯]

নোংরা বস্তুবাদের পূজারি মানবসভ্যতাকে এ কথা জানান দিচ্ছে যে, সত্যের ধ্বংস নেই এবং মিথ্যার স্থায়িত্ব নেই। বিশ্বাসের ক্ষয় নেই এবং প্রতারণার জয় নেই। আদর্শের লালনে যে ব্যক্তি জীবনধারণ করে, মৃত্যুতে তার ক্ষয় নেই। আর তুচ্ছ মানবিক প্রবৃত্তির লালসায় যে জীবনযাপন করে, তাঁর সম্মানে যত বড় স্মৃতিসৌধই নির্মাণ করা হোক—তা সম্মান বয়ে আনে না।

হজরত শায়খুল হিন্দ রাহ. থেকে মোল্লা উমর পর্যন্ত; অন্যদিকে শরিফ হুসাইন থেকে মিরজাফর পর্যন্ত সকল উপাখ্যান মানবজাতিকে সত্য ও একনিষ্ঠতার বড়ত্ব ও তুচ্ছ স্বার্থের জন্য কারও কাছে বিক্রিত হওয়ার লাঞ্ছনার কথা জানিয়ে দেয়। সাময়িক স্বার্থের জন্য আদর্শ ও ব্যক্তিত্বকে বিকিয়ে যারা সওদা করে তারা এসবের পরিণাম সম্পর্কে জানে; কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত উপদেশ গ্রহণ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেরা আক্রান্ত না হয়।

---

[১৪৯] অনেক চেষ্টা করার পরেও এ দুটি কবরের সঠিক জায়গা আমি শনাক্ত করতে পারছি না। যদি কেউ এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন কৃতজ্ঞ থাকব।

Scanned by CamScanner

# তুরি মামা

নব্বু চাচার প্রাণপ্রিয় বন্ধু তুরি মামাও কম ছিলেন না। তুরি মামা ছিলেন বিশুদ্ধ আফ্রিদি পাঠান। লাল-সাদা মিশ্রিত ফর্সা, শক্তিশালী সুঠাম দেহের অধিকারী। ডিউটি শেষে তার প্রিয় কাজ ছিল তিনটি : নিজের কবুতরের সাথে খেলাধুলা করা, রেডিও শোনা এবং নব্বু চাচার সাথে গল্পগুজব করা। দুজনের কেউই বেশি কথা বলতেন না। কিন্তু যেহেতু দুজনের রুচি প্রায় কাছাকাছি ছিল তাই চুপ করে বসে থেকেও বৈঠকের আনন্দ উপভোগ করতেন। তুরি মামার বৈঠকখানা উভয়ের বৈঠকে এতটাই জমে উঠত যে, আসবাবপত্র থেকে খালি থাকা সত্ত্বেও তাকে জাঁকজমকপূর্ণ মনে হতো। পানি রাখার একটি পাত্র, জায়নামাজ এবং থুকদানি ব্যতীত সেখানে অন্য কোনো আসবাবপত্র ছিল না। শারীরিক গঠনের মতো মন-মেজাজের দিক থেকেও মামা একজন পূর্ণাঙ্গ পাঠান ছিলেন। নিয়মানুবর্তিতা, সম্ভ্রান্ত রুচি, অতিথিপরায়ণ ও অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন। বন্ধুদের জন্য ছিলেন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং কারও জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েও এ কথা ভাবতেন যে, কিছুই করতে পারেননি। বৈঠকখানার ছোট টুলে যখন তিনি গরম ফেনাযুক্ত চা নিয়ে বসতেন সুরমা-মিশ্রিত চোখের পাশাপাশি বক্ষ-বিস্তীর্ণ দাড়িতে মানুষটিকে দারুণ লাগত। পৌঢ় বয়সে এসেও তাঁর শারীরিক কাঠামো যেকোনো যুবকের মনে ঈর্ষা জাগাত। যে শারীরিক কাঠামো কিছুটা হলেও তার যুবক বয়সের ছাপ বহন করতো। ভারী শরীরে বৃদ্ধ বয়সের ছাপ এলেও মামার শারীরিক শক্তি এবং হাতের জোর এতটাই বেশি ছিল যে, কখনো যদি ভর দেওয়ার জন্য কোনো যুবকের হাত ধরতেন তাহলে তার হাতে ব্যথা অনুভূত হতো।

মামার পরিচয় কী? কোথা থেকে এসেছেন? বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সময়টুকু কেন একাকী কাটাচ্ছেন? এসব প্রশ্নের উত্তর কারও জানা ছিল না এবং মামাও এসব ব্যাপারে কথা বলতেন না। নব্বু চাচা হয়তো এ ব্যাপারে জানতে পারেন; কিন্তু অন্য কারও এ ব্যাপারে কিছু জানা ছিল না এবং মামাকে প্রশ্ন করারও সাহস ছিল না। অবশ্য নব্বু চাচার মেজো ছেলে; যে তুরি মামার জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল, সে বলত—

'তুরি মামা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যৌবনের শুরুলগ্ন থেকেই তুরি মামা জিহাদি তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর এই নির্বাসিত জীবনযাপন স্বেচ্ছায় নয়; বরং তা ওই দুঃখ-কষ্টের অন্তর্ভুক্ত, যা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুজাহিদদের ভাগ্যে এসেছিল।'

Scanned by CamScanner

- তুমি কীভাবে জানো?

- তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

- একদিন মহল্লার সড়কে সামিয়ানা টানিয়ে এক জাঁকজমকপূর্ণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে এক বক্তা উপমহাদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উলামায়ে কিরামের ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিল। তখনই আমি মামাকে খাবার দিতে গিয়েছিলাম। সভা-সমিতিতে মামার তেমন একটা আগ্রহ ছিল না; তবে সেদিন বড় বড় সাউন্ডবক্সের মাধ্যমে মহল্লার প্রতিটি ঘরে জোরপূর্বক বক্তব্য শোনানো হচ্ছিল। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে করা বক্তব্য শুনে মামা সেদিন অগ্নিশর্মা হয়ে মুখ খুলেছিলেন। আর তাতেই আমাদের তার একাকীত্বের রহস্য বুঝে আসে। তার কথা থেকে বুঝে আসে যে, তিনি সীমান্তের কাবায়েলি এলাকাগুলোর সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাদের নিজস্ব জায়গা-জমি, বাগান ও ঘরবাড়ি ছিল। তাদের এলাকার খান সাহেবরা ইংরেজদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে বেধড়ক অর্থ রোজগার করছিল, যা মামার পছন্দ ছিল না। তাই তিনি এমন পথ নির্বাচিত করেছিলেন, যা নীতিশীল, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বুদ্ধিমান লোকেরা পছন্দ করে। আর সে পথেই তিনি নিজের সর্বস্ব, সম্পদ, বাবা-মা, ঘরবাড়ি সবকিছু ত্যাগ করেছেন এবং এ ব্যাপারে কখনো কোনো অভিযোগ করেননি। বস্তুত তিনি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা বন্ধুদের জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে দুঃখ নয়; বরং গর্ববোধ করেন। পার্থিব জগতের বন্ধুত্ব নিয়ে যদি তাদের মানসিকতা এমন হয়, তাহলে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের বিনিময় তারা কী না করতে পারেন? নব্বু চাচার ছেলের ভাষ্যমতে, ভাগ্য ভালো সেদিন বক্তা এক নিঃশ্বাসে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কয়েকটি কথা বলে দ্রুত মঞ্চ ত্যাগ করেছিল; না-হলে সেদিন হয়তো অন্যরকম কিছু হয়ে যেত।

তুরি মামার জীবনের এই অধ্যায়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ আরও বেড়ে যায়। নিঃসন্দেহে তিনি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। আফসোস, আমাদের জাতি এ ধরনের স্বাধীনচেতা লোকদের যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারেনি। আর তাই তুরি মামার মতো হাজারও মানুষ স্বাধীনতার পর যাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদকে ভূষিত করা উচিত ছিল তারা অসহায়ভাবে একাকিত্বের জীবনযাপন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অথচ নীচু বংশের গবেটদেরই দেখা যায়,

Scanned by CamScanner

যারা হয়তো একদা ধোপা-মুচি হিসেবে কাজ করতো, তারা আজ জাতির ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনেকেই ইংরেজদের হয়ে কাজ করেছিল, যে ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশের লাখ লাখ মুসলমানকে নিধন করেছিল। যারা বিশের অধিক ইসলামি সাম্রাজ্যকে লুটতরাজ করে নিয়েছিল এবং যাওয়ার সময় তাদের এমন পা চাটা প্রেতাত্মাদের শাসক হিসেবে বসিয়েছিল; যারা আজও জোকের মতো উম্মাতে মুসলিমার রক্ত চোষে চলছে। ইংরেজরা এতটাই নিকৃষ্ট ও দুষ্কৃতকারী ছিল, যারা ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসন, এশিয়া ও ইউরোপের মিলনস্থলে তুরস্কের উসমানি খিলাফাত এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে 'ইসরাইল' নামক বিষফোড়া জন্ম দিয়ে আরব দেশসমূহে চিরস্থায়ী অস্থিরতা তৈরির বীজ বপন করেছিল। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে ইসরাইলের পক্ষাবলম্বন করে গেছে। যখনই ইসরাইলের উপর কোনো বিপদের ঘনঘটা এসেছে, ইসরাইলের স্বার্থ রক্ষার্থে তারা এতটাই উদগ্রীব হয়ে পড়তো, যেমনটি মুরগি তার ছানাকে রক্ষা করতে হয়ে থাকে।

১৯৬৮ সালে যখন আরব রাষ্ট্রসমূহের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ চলছিল তখন পৃথিবীবাসী অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করছিল, কীভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইহুদি এত বড় দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছে। পরবর্তীতে জানা যায় যে, ইসরাইলের পক্ষে ব্রিটেনের দুটি বিমানবাহী রণতরী দুদিক থেকে ফিলিস্তিনকে ঘিরে রেখেছিল। দুটি রণতরীর একটি ছিল মাল্টায় আরেকটি ছিল আদন বন্দরে। কোনোভাবে ইহুদিরা আক্রান্ত হলে যেন এক মিনিটের নোটিশেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—সে প্রস্তুতি নিয়ে তারা অপেক্ষমাণ ছিল। অবশ্য তখন এমন সময় ছিল, যখন ইহুদি সাম্রাজ্যের চৌকিদারির দায়িত্ব আমেরিকার হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। ইহুদিদের বিষাক্ত বোঝা বয়ে ক্লান্ত ব্রিটেন স্বেচ্ছায় তা আমেরিকাকে অর্পণ করে। অন্যদিকে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর মিসরের উপকূলীয় অঞ্চলে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল, যেন পরিস্থিতি ইহুদিদের আওতার বাইরে চলে যাওয়ামাত্রই মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইহুদি প্রীতির প্রমাণ দেওয়া যায়।

স্মরণ রাখা উচিত, এই সেই নৌবহর—তিন বছর পর ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ যার অপেক্ষা করছিল; কিন্তু সেখানে তারা উপস্থিত হয়নি। এখানে চিন্তার বিষয় হচ্ছে ব্রিটেন ও আমেরিকার ইহুদি

Scanned by CamScanner

তোষণে কী লাভ হচ্ছে? ইহুদিদের ধন-সম্পদের কি এতটাই আকর্ষণ যে, পৃথিবীর এসব উন্নত রাষ্ট্রগুলোও মৌমাছির মতো ইহুদিদের দিকেই ধাবিত হয়? নাকি উন্নতির দাবিদার এসব রাষ্ট্রসমূহের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর ইহুদিদের এতটাই প্রভাব রয়েছে, যার কারণে তারা ইহুদিদের সেবা করতে বাধ্য? নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণে উভয় কারণই স্ব স্ব স্থানে যথার্থ। কিন্তু এখানে তৃতীয় আরেকটি ব্যাপারও রয়েছে।

আমেরিকা এবং ব্রিটেন ক্রুশের প্রতিনিধি। ক্রুসেডাররা কয়েক শতক ধরেও যুদ্ধ করে যখন দেখল, এই পবিত্র ভূমি তাদের হস্তগত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তারা ইহুদিদের সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়; যেন ইহুদিদের কূটবুদ্ধি এবং খ্রিষ্টানদের নোংরা জাতীয়তাবাদ মিলে মুসলমানদের থেকে পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিতে পারে। এটি শুধু অনুমান নয়; বরং এর স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর বায়তুল মাকদিসের ওপর ইহুদি কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর *সানডে টাইমস লন্ডন* একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছিল; যার নাম ছিল 'দ্য হলি ওয়ার জোন ৬৭'। সেখানে এ যুদ্ধ-সংক্রান্ত আলোচনার শিরোনাম দেওয়া হয় '৮৯৬ বছর পর প্রত্যাবর্তন' (Back After 896 Years)। স্পষ্টত তখন থেকে ৮৯৬ বছর পূর্বে বায়তুল মাকদিস খ্রিষ্টানদের হাতছাড়া হয়েছিল। তখন ইহুদিদের নিজেদের চোখের পানি মোছার মতো সামর্থ্যও ছিল না। যেখানে স্পষ্ট এ কথা বুঝে আসে—ব্রিটেন, আমেরিকার ইহুদিদের সহযোগিতা মূলত মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা এবং তাদের সাথে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ। তারা একেও ক্রুসেড-যুদ্ধের অংশ মনে করে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শত্রুতা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোনো ধরনের ভাবনা নেই। তারা তো ওই ওষুধের মধ্যেই সমাধান খুঁজে চলছে, যা নিজেই রোগের মূল। তারা ওইসব দেশকে নিজেদের সহযোগী-সহমর্মী এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ভেবে তাদের রাজধানীগুলোতে আসা-যাওয়া করাকে নিজেদের সৌভাগ্য ভাবছে। এদের কাছে তুরি মামার মতো স্বাধীনতা-সংগ্রামী যারা নিজেদের যৌবন, সহায়-সম্পত্তি সবকিছু দেশের জন্য কুরবানি করেছেন; তাদের কোনো মূল্য নেই। বরং তাদের কাছে ওই তেলবাজরা বেশি মর্যাদাশীল, যাদের শরীরে আজও ইংরেজদের শরীরে তেল মর্দনের গন্ধ বিরাজমান।

Scanned by CamScanner

আমাদের প্রিয় জন্মভূমির জাতীয় সংসদে হাজারও বিল পেশ করা হয়েছে এবং তা পাস হয়েছে। এমন কিছু বিলও রয়েছে, যেগুলো সংসদে উত্থাপন করা ব্যতীতই পাস হয়েছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর চোখে যে বিলটি আটকে গিয়েছে তা হচ্ছে, 'শরয়ি আইনব্যবস্থা' বিল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যে স্লোগান, ঘোষণা এবং দাবি নিয়ে রাষ্ট্রটি গঠন হয়েছিল, স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরও রাষ্ট্র গঠনের মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, তা পূর্ণ করা হবে কি না? তার উত্তর নেতিবাচক দেওয়া হয়। এতে অনেক সমস্যা, অসুবিধা ও বিপদ-আপদ রয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেকোনো ব্যক্তি অনেক কষ্ট করে পানির ফোয়ারা নির্মাণ করে। যখন এই ফোয়ারা ব্যবহারের সময় এসেছে তখন যেন কেউ এ প্রশ্ন করল—'এতে পরিচ্ছন্ন পানি দেওয়া হবে নাকি ময়লাযুক্ত পানির সংযোগ দেওয়া হবে?'

পৃথিবীতে যেসব রাষ্ট্র কোনো আদর্শিক মতবাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে সেই আদর্শ ব্যতীত অন্য কোনো আদর্শের কল্পনাও করা যায় না। পূর্ব তিমুরে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদের সরকার প্রতিষ্ঠা করার কল্পনাও কি কেউ করতে পারে? ভারতে হিন্দুত্ববাদ ও ইসরাইলের জায়নবাদ ব্যতীত অন্য কারও কথা শোনার চিন্তাও কি করা যায়? কক্ষনো না।

কিন্তু এই বোকামিপূর্ণ দৃশ্য শুধু আমাদের এখানেই কল্পনা করা যায় যে, আমরা নিজেদের জন্য নিজেদের ধর্ম ব্যতীত অন্য যেকোনো মতবাদকে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করতে চিন্তামগ্ন থাকি। নিজেদের প্রিয় পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার ধর্মকে এখনো আমরা নিজেদের চিন্তার আওতায়ও গ্রহণ করতে রাজি নই। আমাদের এই আশ্চর্যজনক আচরণের ভিত্তিতে জাতির ইজ্জত বিক্রিকারীদের খেলাধুলা, নাটক, বিনোদন ইত্যাদির নামে এওয়ার্ড সার্টিফিকেট এবং পুরস্কারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। অন্যদিকে ড. আবদুল কাদির খানের মতো ব্যক্তিত্বদের তামাশার বস্তুতে পরিণত করে অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দেশভাগের দিনকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে উদযাপন করা হয়; কিন্তু পরমাণু দিবসকে 'দ্য ডে অব গ্রেইটনেস' (The day of Greatness) এমনভাবে পালন করা হয়, যেন সেদিন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। যে জাতির চলাফেরা, আচার-আচরণ এ ধরনের, তারা কীভাবে চিরস্থায়ী সফলতার প্রত্যাশা করতে পারে?

Scanned by CamScanner

# লুদ-এর দরজায়

## গবেষণার নামে...

'বার্নার্ড লুইস' (Bernard Lewis) বর্তমান যুগের একজন মুসতাশরিক।[১৫০] পশ্চিমা সভ্যতায় তাকে ইসলামি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পারদর্শী মনে করা হয়। ইসলামি বিশ্বের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে তার মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। প্রাচ্যবিদ বলতে এমন গবেষকদের বোঝানো হয়, যারা মুসলমান না হয়েও ইসলামি সভ্যতা ও প্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। ইহুদিরা রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায়ও এই কৌশল অবলম্বন করেছিল। তারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দিত, ইসলামি লেবাস-পোশাক পরিধান করতো, নিজেদের নামও ইসলামি পদ্ধতিতে নির্বাচন করতো। আর কিছুদিন পর এ কথা বলে প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করতো যে, এই ধর্মে সত্যতার নিদর্শনাবলির প্রমাণ মিলছে না। যেন আরবের মূর্খরা তাদের গবেষক ব্যক্তিত্ব মনে করে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের এই কৌশল সেই যুগে ততটা কাজ করে নাই। কেননা, তাদের সামনে যারা ছিল, তারা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর এমন সহচর; যাদের ভেতর হিদায়াতের নুর পরিপূর্ণ ছিল। এসব শয়তানি কূটকৌশল সত্যিকারের আল্লাহপ্রেমিক বান্দাদের সত্যধর্ম থেকে বিন্দুপরিমাণ বিচ্যুত করতে পারত না। তাই যেভাবে সাহাবায়ে কিরাম কাফিরদের পক্ষ থেকে শারীরিক-মানসিক বিভিন্ন নির্যাতন, নির্বাসন ও হত্যাসহ নানা প্রকারের কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও পাহাড়ের মতো অটল ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে এসব ইহুদিদের গবেষণামূলক বক্তব্য[১৫১] রাসুল ﷺ-এর ভালোবাসা ও বিশ্বাস থেকে তাদের বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত করতে পারেনি।

---

[১৫০] প্রাচ্যবিদ।

[১৫১] বর্তমান যুগের ইয়াহুদি প্রভাবিত গবেষকদের ভাষায় সায়েন্টিফিক ইসলামিক রিসার্চ।

Scanned by CamScanner

# শয়তানি বাহিনীর কর্মকাণ্ড

খাইরুল কুরুন তথা শ্রেষ্ঠ যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর ইহুদিদের এই চক্রান্তটি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপধারণ করেছে। প্রাচ্যবিদদের একের পর এক বিভিন্ন দল গঠন করা হয়েছে। তারা ইসলামের বিনাশ সাধনে এবং মুসলমানদের কুরআন-হাদিসের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার লক্ষ্যে হক ও বাতিলকে মিশ্রিত করার পন্থা অবলম্বন করেছে। ইসলামি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে এমন অহেতুক অযথা তর্কের অবতারণা করেছে, যে বিষয়ে গবেষণাকারী ব্যক্তি আজ পর্যন্ত কোনো সঠিক সমাধান বের করে আনতে পারেনি। এই শয়তানি পদ্ধতি তারা খ্রিষ্টানদের ওপরও প্রয়োগ করেছিল এবং খ্রিষ্টানরা সেই বিভ্রান্তির জালে আবদ্ধ হয়ে আজও উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে। কিন্তু ইসলাম যেহেতু সর্বশেষ ধর্ম এবং কুরআনে কারিম সর্বশেষ কিতাব, তাই তারা মুসলমানদের মাঝে কয়েকটি ভ্রান্ত বাতিনি ফিরকা তৈরি করা ব্যতীত তেমন কোনো সুবিধা করতে পারেনি। উম্মাতে মুসলিমার বড় অংশটি তাদের ফিতনায় নিপতিত হওয়া থেকে নিরাপদ রয়েছে। কিন্তু শয়তান যেমনিভাবে বার বার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বারংবার চেষ্টা করে যায়, তেমনিভাবে শয়তানের বাহিনীও এই অস্ত্র মুসলমানদের ওপর বার বার প্রয়োগ করছে। মুসলমানদের মধ্যে এমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও প্রফেসরের সংখ্যা কম নয়, যারা ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে ইহুদি ইসলামি গবেষকদের কাছ থেকে ইসলামি জ্ঞান অর্জন করেন। ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেটের সাথে সাথে হক-বাতিল মিশ্রিত এমন এক ইসলাম নিয়ে দেশে ফেরেন, যাকে তারা মডার্ন ইসলামের নামে উপস্থাপন করেন; যার জন্য মূলত ইহুদি ইসলাম বা ইসলামি ইহুদিয়াত নামটি যথোপযুক্ত। এরা মুসলমানদের সাথে এমন আচরণ করতে চায়, যেমনটি তারা খ্রিষ্টানদের সাথে ইহুদি-খ্রিষ্টান বা খ্রিষ্টান-ইহুদিজমের মাধ্যমে করেছিল। স্যার সাইয়েদ, ডেপুটি নজির আহমদ, গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, গোলাম আহমদ পারভেজ, মুহাম্মাদ আবদুহু, তোয়াহা ইয়াসিন, আবদুল্লাহ চকড়ালবি, নিয়াজ ফাতেহপুরি, গাওহার শাহি, বাবর চৌধুরী, ফরহাত হাশিমি এবং মুহাম্মাদ শায়খ সেই প্রচেষ্টারই ফসল। বর্তমানে তো সেই দলে ইহুদি উস্তাদদের ছাত্রীরাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাদের কাছে ইসলামের সবচে বড় খেদমত—পাকিস্তানে আলাদা মহিলা মসজিদ তৈরি করা, যা ইসলামের ইতিহাসে হবে এক নতুন দুর্ঘটনা।

Scanned by CamScanner

# একটি ভয়ংকর রোগ

ইহুদিদের একটি কর্মপদ্ধতি হচ্ছে, তারা তাদের শত্রুদের সকল বিষয় এমনকি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়কেও বিবেচনার আওতায় আনে। অতঃপর সর্বশক্তি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর সেক্ষেত্রে বার্নার্ড লুইস-এর মতো ইসলাম ও প্রাচ্যবিদদের লক্ষ্য থাকে ইসলাম ও ইসলামি বিশ্বকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের পরিকল্পনাবিদদের সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা। যেমনটি তারা ইতোপূর্বে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ানদের মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েও গবেষণা করে তাদের তছনছ করে দিয়েছিল। আর তাই বর্তমানের খ্রিষ্টানরা পৃথিবীব্যাপী খ্রিষ্টান মিশনারিসমূহ পরিচালনা করে; কিন্তু নিজেদের সমাজ, রাজনীতি ও জীবনব্যবস্থা থেকে খ্রিষ্টবাদকে বিদায় দিয়েছে।

আমাদের এখানে বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানীদের আচরণ এর ব্যতিক্রম। তারা পশ্চিমা মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে মুসলমানদের কাছে তা বর্ণনা করার পরিবর্তে যে বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তা হচ্ছে, ইসলামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে পশ্চিমা ভাষায় রূপান্তরিত করে তাদের কাজ সহজ করে দেওয়া। যার ফলে তারা মাঠে নামার পূর্বেই সকল ভালো-মন্দ বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকে। এই অভ্যাস মূলত ওই অসুস্থতার অংশ, যা প্রায় সকল মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে, নিজের জীবন পরিবর্তনের পরিবর্তে অন্যের সংশোধনের চিন্তাভাবনা।

আমাদের প্রত্যেকেই পূর্ণাঙ্গ ইখলাসের সাথে অন্য মুসলমানকে সঠিক পথে দেখতে চায়। অন্যের পড়ার জন্য জিকির ও মুনাজাতের বই ছাপিয়ে দেয়, অমুসলিমদের মুসলিম বানানোর চিন্তা-ভাবনা করে এবং তাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে। অথচ যতটা সম্ভব নিজের অর্থ, অবসর ও যৌবনকে বিনোদনের কাজে ব্যয় করতেই বেশি আগ্রহী থাকে। নিজের সময়ের মূল্যায়ন, ভালোভাবে নিজের দোষ-ত্রুটির বিশ্লেষণ এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করা এবং যে ব্যক্তি নিজের দোষকে ধরিয়ে দেয়, তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা ছিল আমাদের পূর্বসূরিদের এমন স্বভাব, যা তাদের সাফল্যের শিখরে পৌঁছিয়ে ছিল। আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা-চেতনা এর ব্যতিক্রম। আমাদের প্রত্যেকেই কামনা করে, অন্য মুসলমানরা যেন সঠিক পথে চলে আসে এবং ইসলামকে বিজয়ী করে। অথচ নিজে মনমতো বিভিন্ন বিনোদনে লিপ্ত থাকতে আগ্রহী। কেমন যেন যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধাদের এ কথা ভাবা যে, পার্শ্ববর্তী যোদ্ধা যেন যুদ্ধ বিজয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে, আমার তো

Scanned by CamScanner

এখানে উপস্থিত থাকাই যথেষ্ট। এই ধরণের চিন্তাভাবনার ফলাফল কী হবে? ঠিক তেমনটাই যেমনটা প্রত্যক্ষ করছেন। অর্থাৎ, চিৎকার-চেঁচামেচি বহাল থাকবে; কিন্তু জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না।

## পঞ্চমাংশের ভীতি

বার্নার্ড লুইস-এর কথা চলছিল। সে গত শতাব্দীর শেষভাগে[১৫২] ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ২ মে 'ইনবার ইনস্টিটিউট ফিলাডেলফিয়া' (Inbar Iinstitute Philadelphia)-য় বক্তব্য দিতে গিয়ে পশ্চিমাদের একটি সতর্কবাণী দিয়েছিল। সে তার বক্তব্যে বলেছিল, 'পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ ইউরোপ বিশেষ করে আমেরিকা ও পশ্চিমা সভ্যতার শত্রু।' এটি ছিল তার বক্তব্য ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের সারমর্ম। পঞ্চমাংশ দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানগণ। এবং পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এ শত্রুতা প্রমাণে ইহুদি আলিমদের উদ্দেশ্য ছিল, যেন খ্রিষ্টানরা নিজেদের স্বার্থে হলেও মুসলমানদের পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের শক্তির কেন্দ্রবিন্দুগুলোকে নিজেদের অধীনস্থ করে নেয়। গণমাধ্যম, কৃষিক্ষেত্র, ব্যবসা, নৌপথ, আকাশপথ ও যোগাযোগমাধ্যম বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ যেন নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। ঠিক একই ধরনের বিষাক্ত উসকানি সে কয়েক মাসের মাথায় 'স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি পালো আলটো' (Stanford University Palo Alto)-এর এক সেমিনারে দ্বিতীয়বারের মতো দেয়। এই প্রসিদ্ধ গবেষকের পক্ষ থেকে পশ্চিমাদের সামনে এভাবে মুসলমানদের শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করার একমাত্র কারণ ছিল, ইহুদিরা তখন মুসলমানদেরই একমাত্র শত্রু ভাবত। তারা পৃথিবীর সকল বিশ্বাস-দর্শন ও চারিত্রিক নিয়মাবলিকে ধ্বংস করে ' ইউনিপোলার সিস্টেম' (Unipolar System)[১৫৩]-এর জন্ম দেয়। যা দাজ্জালের ঈশ্বর দাবির পটভূমি তৈরির সমর্থক।

মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির কাছেই পেট এবং লজ্জাস্থানের চাহিদা পূরণ ব্যতীত জীবনের উন্নত কোনো লক্ষ্য নেই। ইউরোপের অধিকাংশ নাগরিক সপ্তাহের পাঁচ দিন বেশি করে উপার্জন করা এবং দুইদিন উদ্দাম বিনোদনের বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করে না। এটা শুধু উম্মাতে মুহাম্মাদির বৈশিষ্ট্য যে, তারা নিজেদের পাশাপাশি সকল পৃথিবীবাসীকে মহান আল্লাহর

---

[১৫২] যাকে বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবহুল দশক বলা হয়।

[১৫৩] একটি কিবতি মতবাদ।

Scanned by CamScanner

রহমতে অবগাহিত করাতে ও ইবলিশের চক্রান্ত ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চায়। আর তাই পৃথিবীব্যাপী দাজ্জালের শাসন প্রত্যাশীরা মুসলমানদেরকেই একমাত্র নিজেদের শত্রু বিবেচনা করে।

## দুটি সংবাদ এবং ভয়ংকর বাস্তবতা

মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর সকল শক্তির নিয়তিতেই জায়নবাদীদের দাসত্ব করে চলা নির্ধারিত। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি এবং যাবতীয় শর্তাবলির সমারোহ মুসলমানদের; বিশেষ করে বাহ্যিক শক্তি ও দুই দশক ধরে বাস্তবিক জিহাদের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাকিস্তানিদের ব্যতীত অন্য কারও মধ্যে নেই। এ জন্য পৃথিবীর বুকে শয়তানিশক্তির কেন্দ্রবিন্দু ইসরাইলকে অন্য কেউ সমর্থন দিক বা না দিক, তাদের জন্য মুসলমানদের; বিশেষ করে পাকিস্তানের সমর্থন আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধূর্ত ইহুদি নীতিনির্ধারকরা স্পষ্টভাবে এ কথা অনুভব করছে যে, ইসলামি বিশ্বের উপর রাজনৈতিক, সামরিক ও চারিত্রিক ময়দানে সর্বশক্তি দিয়ে হামলা করলেও মুসলমানদের সাথে তাদের চেতনার কেন্দ্রের[১৫৪] সম্পর্কের অবনতি ঘটে নাই; বরং দিন দিন তাঁদের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নত জীবনের সন্ধানের মানসিকতা বেড়ে চলছে; আর এদিকে ইহুদিদের অপেক্ষার সময় বেড়ে চলছে। তাদের মধ্যে এ আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে যে, নতুন বিশ্বের কুফুরি অপশক্তির ফর্মুলা যা মূলত দাজ্জালি শাসনের পটভূমি হবে। যদি অতি দ্রুত বাস্তবায়িত না করা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যাবে।

হতে পারে পাঠক এসব কথাকে মনগড়া বা অতিরঞ্জিত ভাববেন। কিন্তু যদি তারা মনোযোগ দিয়ে নিচের দুটি সংবাদ পড়েন তাহলে অবস্থার ভয়াবহতা টের পাবেন।

> ১. আরব সাগরের পারে বেলুচিস্তানের 'জিওয়ানি' এলাকায় দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার সর্ববৃহৎ নৌবন্দর ও বিমানঘাঁটি তৈরি করা হবে। যার মাধ্যমে ওই এলাকায় নৌ-চলাচল, তেল ব্যবসা ও আমদানি-রপ্তানির ওপর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। অতঃপর মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছার এই সহজ রাস্তাটিকে কার্যত বেলুচিস্তান থেকে আলাদা করে ফেলা হবে।[১৫৫]

---

[১৫৪] আল্লাহ রাসুল কুরআন ও সুন্নাহ।

[১৫৫] সংবাদে এ কথা স্পষ্ট করা হয়নি যে, সুয়েজ খালের পর পৃথিবীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ নৌবন্দরকে বেলুচিস্তান থেকে কার্যত পৃথক করার পর তা কার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

Scanned by CamScanner

২. অর্থ মন্ত্রণালয় ও স্টেট ব্যাংক স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে, ভবিষ্যতে পাকিস্তানের স্বর্ণ লেনদেনের যাবতীয় স্বর্ণ আমেরিকার ব্যাংকগুলোতে রাখা হবে।

একটু ভাবুন। মুসলিম উম্মাহের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, সর্বোচ্চ শক্তির ধারক ও বাহক ইসলামি শক্তি ও অবিস্মরণীয় জিহাদি চেতনার অধিকারী রাষ্ট্রটি; যার ওপর সমগ্র ইসলামি বিশ্বের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব রয়েছে, তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিজেদেরকে আল্লাহ ও মানবতার শত্রুদের হাতে অল্প সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। তাদের যে শয়তানি শক্তিকে প্রতিহত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারা তাদের সমর্থন করার চিন্তাভাবনা করছে। বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের চোখের অশ্রু মুছে দেওয়া, তাদের আশ্বাস দেওয়া ও তাদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ইরাকে দাজ্জালের শাসনের সীমারেখা বৃদ্ধির জন্য আজ তারা সেখানে মার্কিনীদের লজ্জাজনক পরাজয় থেকে বাঁচানোর জন্য মাঠে নামছে। এই অবস্থায় তাদের মহান আল্লাহ, ফেরেশতাগণের অভিশাপ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের বদদুআ থেকে কে বাচাতে পারবে?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমরা প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি যে, আমরা কখনো আত্মসমালোচনায় বা নিজেদের কাজের পর্যালোচনায় যাব না। নিজেদের মুক্তি ও উন্নতির পথে আনার পরিবর্তে বিভিন্ন কৌশল ও যুক্তির মাধ্যমে নিজেদের পথভ্রষ্টতা ও চুপচাপ বসে থাকাকেই বৈধতা দিয়ে যাব।

## কিয়ামের সময় সিজদা করা

উসমানি খিলাফাত এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মুসলমানদের দুর্ভাগ্য ছিল যে, তারা তখন কিয়ামের সময় সিজদায় পতিত হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় যদি মুসলমানরা সাহস করে শ্রীনগর এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে যেত, তাহলে ভূস্বর্গ কাশ্মিরকে বেনিয়ারা নিজেদের অটুট অঙ্গ বলে দাবি করতে পারত না। তারপর ১৯৪৮, ১৯৬৫ ও ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আখনোর এবং কারগিলে শত্রুদের হাতের মুঠোয় নেওয়ার সুযোগ এলেও ঠিক সে মুহূর্তে আমাদের হাতে ব্যথা শুরু হয়। আজ আবারও মহান আল্লাহ পাকিস্তানকে ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা দান করেছেন। যদি তারা ইমানি চেতনা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সাহসিকতার সাথে নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে বিশ্বের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় স্থান দখল করে নিতে

Scanned by CamScanner

পারবে। কিন্তু তারা উম্মাতে মুহাম্মাদির চিরস্থায়ী শত্রু, যাদের সাথে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তাদের প্রতিরোধের বিপরীতে তাদের সাথে গলা মেলাতে আগ্রহী।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় যে শত্রুরা কাশ্মির ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের শক্তিকে খর্ব করছে, আজ তারাই ইসরাইলকে সমর্থন দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এ জন্যই দেখা যায়, কাশ্মিরে ভারতীয় সৈন্যদের আসা পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ করার লক্ষ্যে কাদিয়ানি বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি কাশ্মির দখল-অভিযানের উদ্দেশ্যে যাওয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখে। আজও দেখা যায় কাদিয়ানি নতুন নেতা মির্জা মাসরুর সেই ইসরাইলিদের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য মাঠে নেমেছে। যারা কিনা ফিলিস্তিনে অসংখ্য মুসলমানের হত্যাকারী, মুসলমানদের মূলোৎপাটনে উদগ্রীব এবং পাকিস্তানের চিরস্থায়ী শত্রু।

ইহুদিদের বৈশ্বিক নেতা দাজ্জালকে হজরত ইসা আ. লুদ শহরের দরজায়[১৫৬] হত্যা করবেন।[১৫৭] হজরত ইসা আ.-এর জীবিত হওয়াকে অস্বীকারকারী, সবক্ষেত্রে ইহুদিদের দালালি করে পাকিস্তান ও উম্মাতে মুসলিমার ক্ষতিকারী এই মুরতাদ দলটির পরিণামও তাদের চেয়ে কম দুর্গতির হবে না। তারাও ওই দুটি নামসর্বস্ব মুসলিম দলের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে জায়নবাদীরা বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজেদের অঞ্চলে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছে।

হে চিনাব নগরে সরকারের অন্তর্গত আরেক সরকারের প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের ইহুদি মনিবদের সন্তুষ্টি কামনাকারীরা! জেনে রেখো, যাদের সাথে জীবন যাপন করবে হাশরও তাদের সাথেই হবে। প্রথমে ইহুদিরা সমগ্র পৃথিবী থেকে ফিলিস্তিনে জড়ো হয়েছিল। অতঃপর ইহুদিদের দোসর দুটি দল—বাহায়ি ও কাদিয়ানিদের দাজ্জালি রাষ্ট্রের রাজধানীতে হেডকোয়ার্টার বানিয়ে দেয়। যা এ কথারই ইঙ্গিত করে যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠে অভিশপ্তদের ধ্বংসের উল্টো গণনা শুরু হয়েছে। দেখতে থাকুন, নিয়তি কীভাবে এসব অভিশপ্তদের ধ্বংস করে।

---

[১৫৬] কোনো শহরের এয়ারপোর্টই তাদের দরজা

[১৫৭] লুদ ইসরাইলের রাজধানীর অন্তর্গত। সেখানে ইসরাইলের আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট বিন গোরিয়ান ইন্টারন্যশনাল ইয়ারপোর্ট অবস্থিত।

Scanned by CamScanner

# কাসাব্লাংকা থেকে ইসরাইলের রাজধানী

## প্রিয় সহকর্মী

লক্ষ্যের একতা কখনো চিরস্থায়ী শত্রুকেও বন্ধুতে পরিণত করে। যার প্রকাশ্য উদাহরণ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিজেদের চিরস্থায়ী শত্রুতা ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হওয়া। গত ২ হাজার বছর ধরে খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের পৃথিবীর সবচে অভিশপ্ত জাতি ভাবলেও আজ তাদের প্রিয় সহকর্মী 'ফিলো সেমিটিজম' (Philo-Semitism) নামে অভিহিত করে। এই ঘৃণা কীভাবে ভালোবাসায় এবং শত্রু কীভাবে সহকর্মীতে পরিণত হয়—যার বিস্তারিত আলোচনা অত্যন্ত চমকপ্রদ। এ পরিবর্তন এ জন্য নয় যে, ইহুদিদের প্রতি করা অন্যায়গুলো আজ খ্রিষ্টানরা অনুধাবন করতে পারছে, যা তারা বার বার ইহুদিদের গণহত্যার মাধ্যমে করেছিল; বরং এই পরিবর্তনের বিশেষ এক কারণ রয়েছে, যা অনুধাবন করা আজকের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই কারণ বোঝা ব্যতীত বর্তমানে পশ্চিমাদের ইসলামবিরোধী তৎপরতার স্বরূপ বুঝে আসবে না।

## ভোগবাদী ধর্মীয় নেতৃত্ব

জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যালঘু হওয়া সবসময়ই ইহুদিদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তার একটি বড় কারণ ছিল ওদের ছেলে-সন্তানের স্বল্পতা।[১৫৮] দ্বিতীয় কারণ ছিল বিভিন্ন সময় তাদের ওপর বিপদ-আপদ ও গণহত্যার ধারাবাহিকতা। যেসব সময়ে তাদের সুস্থ সামর্থ্য দেহ-মনের অধিকারীরা অধিকাংশই নিহত হতো। তৃতীয় সবচে বড় কারণটি হচ্ছে, তারা অন্য কোনো ধর্মের মানুষদের ইহুদি ধর্মে প্রবেশ করাকে সমর্থন করে না।

---

[১৫৮] বর্তমানেও পৃথিবীর সবচে কম ছেলে-শিশুর জন্ম হয় ইসরাইলে। অন্যদিকে সবচে বেশি ছেলে-শিশুর জন্ম ফিলিস্তিনে। যা আল্লাহ তাআলার এক অপার রহস্যময় সিদ্ধান্ত।

Scanned by CamScanner

ইহুদিবাদ পৃথিবীর ওই দুটি ধর্মের একটি, যাদের ধর্মের ভিত্তি আত্মার সাধনা ও পবিত্রতার ওপর নয়; বরং বংশীয় গোঁয়ার্তুমির ওপর নির্ভরশীল। এই দুটি ধর্মের লোকেরা নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষাকে মুক্তির উপায় বলে অভিহিত করলেও বিশেষ বংশের বাইরে অন্য কাউকে এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার যোগ্য মনে করে না। কেননা, তারা অন্য সকল মানুষকে পশু, অচ্ছুত ও মুক্তির অনুপযুক্ত মনে করে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, ধর্মপ্রবর্তকগণ এই নিয়মের প্রবর্তন করেননি। এসব পরবর্তীতে দুনিয়ালোভী ধর্মজাজকগণ তৈরি করেছে। আর এসব ভ্রান্ত নেতৃত্ব ইহুদি এবং হিন্দুদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান।

তো বলছিলাম ইহুদিদের জন্য সবসময় সংখ্যালঘু হওয়া বড় দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। আর এই সমস্যার সমাধানের জন্যই তারা সবসময় কারও আশ্রয়প্রার্থী হয়ে থাকত। কুরআনে কারিমের সুরা হাশরে তাদের কাপুরুষতা ও কূটবুদ্ধির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার আলোচনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই নিজেদের অভ্যাসবশত খ্রিষ্টানদের হাতে দীর্ঘদিন নির্যাতিত হওয়ার পর ইহুদিরা তাদের ওপর এমন এক আক্রমণ করেছে, যা তাদের ধর্মীয় ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে এমন একটি দল তৈরি করেছে, যারা ইহুদিদের সমর্থক। আর তা ছিল এমন এক প্রতিশোধ, যার সামনে সত্যিকার খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ বোকা বনে গেছেন। আজ আমরা যাদের খ্রিষ্টানবিশ্ব বলে জানি, তারা মূলত ইহুদিদের বিকৃত সেই খ্রিষ্টান সমাজ।

## প্রতিবাদের জীবাণু

ইহুদিরা প্রথম যে কাজটি করেছিল তা ছিল খ্রিষ্টানদের এমন একটি দল তৈরি করা, যারা প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ, যেকোনো প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি বা কাঠামো, বিশ্বাস-দর্শন, ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মৌখিক এবং ব্যবহারিক প্রতিবাদ এবং ভিন্ন মতাবলম্বন। যখন কোনো দল বা জাতির মধ্যে এ মানসিকতা ভালোভাবে তৈরি হয়ে যায়, তখন নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত যেকোনো মতবাদ বা আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মানসিকতা জেগে ওঠে। প্রতিবাদের এই বিষাক্ত জীবাণু কোনো ক্ষেত্রেই নিজের কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করে না। তাই ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোটেস্ট্যান্ট নামের খ্রিষ্টানরা প্রতিবাদের মানসিকতা থেকে যেভাবে খ্রিষ্টবাদের কেন্দ্রবিন্দু ক্যাথলিক চার্চ থেকে আলাদা হয়েছিল, সেই প্রতিবাদের ধারাবাহিকতায় আজ পর্যন্ত তারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে চলছে। প্রোটেস্ট্যান্ট-নামী দলটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা

Scanned by CamScanner

সবাই একমত—ঐতিহ্য হোক কিংবা বিশ্বাস, যেকোনো স্বীকৃত মতামতের ব্যাপারে একমত থাকা যাবে না।

হ্যাঁ, অবশ্যই একটি বিষয় নিয়ে তাদের সবগুলো উপদল একাত্মতা পোষণ করে, আর তা হচ্ছে ইহুদিজম, তাদের প্রপাগান্ডা, তাদের প্রতিজ্ঞা, তাদের রীতি-নীতি, তাদের লক্ষ্য। এমনকি ইহুদি চেতনার সহযোগিতা ও বিরোধীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং ইহুদিদের সাথে বিরোধ তৈরি করাকে প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করার শামিল মনে করা। আর আমেরিকায় এ ধরনের খ্রিষ্টানের সংখ্যাই বেশি।

## পোপ সাহেবের সামনে একটি প্রশ্ন

ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিধি-বিধানের বিপরীতে প্রতিবাদী হয়ে উঠার পর দ্বিতীয় এই মতবাদের প্রচার করা হয় যে, গির্জা ও ধর্মগুরুর কী প্রয়োজন? পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আমরা নিজেরাই পড়তে পারি। মহান আল্লাহর বান্দাদের মাঝে তৃতীয় বান্দার উপস্থিতি কেন স্বীকার করতে হবে? প্রত্যেক ব্যক্তির নিজে গবেষণা করে কুরআন হাদিস... ... ও দুঃখিত, পবিত্র কিতাব বোঝার অধিকার রয়েছে। যখন এই মতবাদ অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন খ্রিষ্টানদের জনৈক মেধাবী ব্যক্তি স্কোফিল্ড-এর মাধ্যমে বাইবেলের নতুন ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করে ব্যাপক পরিমাণে প্রচার-প্রসার করা হয়।[১৫৯] স্কোফিল্ডের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বিভিন্ন জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবে ইহুদি ধর্মবিশ্বাস প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন যেহেতু ঘটনাক্রমে পুরাতন বাণী কঠিন এবং নতুন বাণীগুলো সহজ ছিল, তাই কঠিন মূলপাঠের বিপরীতে সহজ টিকা-টিপ্পনিগুলো বেশি প্রচার লাভ করে। আর এভাবেই এই নতুন বাইবেলের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের মধ্যে ইহুদি রীতিনীতি ও বিশ্বাস প্রবেশ করতে শুরু করে। উগ্র খ্রিষ্টান পাদরিদের মনেও ইহুদিদের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা তৈরি হয়। আর এভাবেই প্রাচীন খ্রিষ্টবাদের বিরোধিতা, মনগড়া মতবাদের অনুসরণ এবং খ্রিষ্টধর্মীয় নেতাদের মতবাদের পরিবর্তে মনগড়া মতবাদ অনুসরণের ফলাফল

---

[১৫৯] ঠিক যেমন কয়েক বছর ধরে আরবি মূলপাঠ ব্যতীত শুধু কুরআনে কারিমের অনুবাদ সমগ্র পাকিস্তানে এ জন্য বিতরণ করা হচ্ছে, যেন কুরআনে কারিম পাঠের বিপ্লব সাধিত হয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ যে, উলামায়ে কিরাম যথাসময়ে সচেতন হয়ে এ বিষয়টি রুখে দিয়েছেন। অন্যথায় যদি প্রতিটি নতুন চেতনাশীল ব্যক্তি নিজস্ব তাফসির বাজারজাত করতে শুরু করতো, তাহলে ফিতনা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত।

Scanned by CamScanner

হিসেবে ২৮ অক্টোবর ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের এই দুর্ঘটনা সামনে আসে। আর সেদিন যে রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা খ্রিষ্টান মৌলবাদীত্বের ধারক-বাহক ছিল, তারাও ইহুদিদের সামনে মাথা ঝোঁকাতে বাধ্য হয় এবং ভ্যাটিকান সিটির একটি ফরমান 'নস্ট্রা ইটেইট' (Nostra aetate)-এর মাধ্যমে ইহুদিদের একটি স্বীকৃত ধর্মবিশ্বাস ও ইবাদাতের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়।

ইতিপূর্বে সমগ্র খ্রিষ্টানবিশ্বের একটি ধর্মবিশ্বাস ছিল যে, অভিশপ্ত ইহুদিরাই তাদের প্রভু তথা হজরত ইসা আ.-এর হত্যাকারী 'জুয়িশ ডিয়েসাইড' (Jewish deicide)। তাই ইহুদিদের অভিশাপ দেওয়া তাদের ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত ছিল। এই ধর্মবিশ্বাস এবং ইবাদাত প্রাচীনপন্থী খ্রিষ্টান তথা রোমান ক্যাথলিক চার্চেই বাকি ছিল, যা পোপের একটি আদেশেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 'গুড ফ্রাইডে' নামে একটি অনুষ্ঠান শতাব্দী ধরে খ্রিষ্টধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল। যেখানে প্রকাশ্যে ইহুদিদের অভিশাপ দেওয়া হতো, সেটিও বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং হজরত ইসা আ.-কে হত্যার দায় থেকে ইহুদিদের নিষ্কৃতি দেওয়া হয়।

এই জায়গায় এসে আমরা পোপের কাছে এ প্রশ্ন করব না যে, কোনো বিশ্বাস বা ইবাদাতকে রহিত করা বা নিষিদ্ধ করার অধিকার কোনো মানুষের আছে কি নাই? কিন্তু তার কাছে সমগ্র পৃথিবীবাসীর এ প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে যে, একটি ঐতিহাসিক সত্যকে তিনি কীভাবে অস্বীকার করবেন? পৃথিবীর ইতিহাসে এ কথা স্বীকৃত যে, ইহুদিরা সত্যিকারের মাসিহ হজরত ইসা আ.-কে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছিল। তাঁকে অবৈধ সন্তান বলেছিল। নাউজুবিল্লাহ। তাঁকে হত্যা করার ফাতওয়া দিয়েছিল। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে বেঁধে রাস্তায় অত্যন্ত বেআদবিপূর্ণ আচরণ করে মিছিল করেছিল।

খ্রিষ্টান ধর্মমতে, ইহুদিরা হজরত ইসা আ.-কে হাতে-পায়ে সাত ইঞ্চি পেরেক গেঁথে শূলীতে চড়িয়ে ছিল। ইসা আ.-এর ব্যাপারে ইহুদি কতৃক ক্রুশে চড়ানোর আকিদা তাদের ধর্মের এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ, যে ক্রুশ ব্যতীত খ্রিষ্টবাদের কল্পনাই করা যায় না। এমনকি চারো বাইবেলে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। এই ঐতিহাসিক সত্যকে পোপ সাহেব বা অন্য কেউ কীভাবে পরিবর্তন করবেন?

Scanned by CamScanner

# ইসরাইলি আলিমদের দল

এতক্ষণের আলোচনা ছিল বাইবেলের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত। পরবর্তীতে এরচেও জঘন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। মার্টিন লুথারের পূর্বে পবিত্র গ্রন্থ শুধু ইঞ্জিলকে কেন্দ্র করেই ছিল। সে তাওরাতকেও এর অংশ বানিয়ে দেয়। তার এই পরিকল্পনার ফলে খ্রিষ্টানরাও তাওরাতের সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তাওরাতকে ঐশী বাণী হিসেবে গ্রহণ করে সরাসরি তাওরাতমুখি হতে শুরু করে এবং তাওরাতকে পুরাতন চুক্তিনামা এবং ইঞ্জিলকে নতুন চুক্তিনামা নাম দিয়ে পবিত্র কিতাবের[১৬০] নতুন পরিভাষা আরম্ভ করে।[১৬১]

তাওরাত এবং বিশেষত তার বিকৃত অংশ খ্রিষ্টানদের মধ্যে এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, তাদের মধ্যে এক ভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে তারা ধীরে ধীরে এ কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, ইসরাইল মূলত ইহুদিদের পৈতৃক ভূমি এবং ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বাইবেলের ভবিষ্যদ্‌বাণীর বাস্তবায়ন। ইসরাইলের বিরোধিতা মূলত বাইবেলকে অস্বীকার এবং খোদার উপর খোদাগিরি করার শামিল। এমনকি 'পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি' কর্তৃক ইদানীং বাইবেলের যেসব কপি ছাপিয়ে বিতরণ করা হচ্ছে, তার শেষাংশে কল্পিত সুলায়মানি কাঠামোর মডেল সংযুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে।[১৬২] এই ধারণা ধীরে ধীরে এতটাই প্রকট হচ্ছে যে, বর্তমানে ব্রিটেন ও আমেরিকার খ্রিষ্টানদের মনে ইহুদিদের মহাব্বত; বরং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মানসিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা, তাদের মতে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে একত্রিত হয়ে এমন কিছু ঘটাতে যাচ্ছে, যা এতদিন ধরেও খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছিল না। অর্থাৎ, সেই পবিত্র অঞ্চল থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করা, যেখানে হজরত ইসা আ. দ্বিতীয়বার আগমন করবেন। শুধু তাই নয়, খ্রিষ্টানরা যদিও ইহুদিদের ব্যাপারে বিভিন্ন বাজে ধারণা পোষণ করে, তবুও তারা বর্তমানে এ কথা বিশ্বাস করছে যে, 'ঈশ্বর আমেরিকার উপর সন্তুষ্ট এ জন্য যে, তারা ইহুদিদের উপর সন্তুষ্ট।' এই মতবাদের ভিত্তি তাওরাতের ওই বাণী, যা

---

[১৬০] কিতাবুল মুকাদ্দাস।

[১৬১] আমাদের আশেপাশেও দেখবেন, খ্রিষ্টানরা 'মাকদিস কিতাব' পাঠ করার দাওয়াতে কথা বলেই দিয়ে থাকে যে, সব কিতাবই সবার পাঠ করা উচিত।

[১৬২] বর্তমানে পাকিস্তানেও ইসরাইলি আলিমদের একটি দল তৈরি হয়েছে। আজকাল তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইয়াহুদি পণ্ডিতদের সাথে কথা বলার পর তাদের প্রচারিত বিভিন্ন প্রবন্ধ নিজেদের নামে এ মর্মে ছাপাচ্ছে যে, মাসজিদে আকসা মূলত ইয়াহুদিদের অধিকার; বরং একধাপ এগিয়ে তারা 'মাসজিদে আকসা' শব্দকে বাদ দিয়ে 'সুলায়মানি কাঠামোর অঞ্চল' বলে মন্তব্য করে।

Scanned by CamScanner

বাইবেল অধ্যয়নে ইচ্ছুক প্রতিটি ছাত্রকে শেখানো হয়। যেখানে বলা হয়েছে 'হে ইসরাইল! যে তোমাকে সম্মান করবে আমি তাকে সম্মানিত করব, আর যে তোমাকে অভিশাপ দেবে আমি তাকে অভিশপ্ত করব।'

আমেরিকাতে ইহুদিদের সবচে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী খ্রিষ্টান আইনজীবী জিরি পালওয়েল নিজের বক্তব্যে এ কথা বলে বেড়াত যে, 'ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি খ্রিষ্টানের উচিত ইহুদিদের নিরাপত্তা দেওয়া। যদি আমরা তাদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম হই, তাহলে ঈশ্বরের কাছে আমাদের মর্যাদাহানি হবে।'

তাদের দৃষ্টিতে সকল আরবরা খ্রিষ্টানবিরোধী 'এন্টিক্রাইস্ট' (Antichrist), তাই শুধু ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে নয়; বরং মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর অংশ থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া উচিত। কেননা, ঈশ্বর ইহুদিদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন, মুসলমানরা তার পথে অন্তরায়।

'বৃহত্তর ভূখণ্ড' অংশটি হয়তো পাঠক লক্ষ্য করেননি। মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর অঞ্চল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরাক, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন এবং সাউদি আরব মদিনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত যে সীমারেখা ইসরাইলের পার্লামেন্টে অবস্থিত মানচিত্রে দেখানো হয়েছে।

## রক্তখেকো চামচিকা

ইহুদিদের মিথ্যাচারের সাফল্য দেখতে পেয়েছেন। তারা ছিল ইসা আ.-এর শত্রু অথচ তারা কৌশলে এ কথা প্রচার করে যে, মুসলমানরা হজরত ইসা আ.-এর শত্রু। তাই আজ ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তাদের চিরস্থায়ী শত্রুতা ভুলে গিয়ে এ কথার উপর একাত্ম হচ্ছে, হয়তো মুসলমানদের ধ্বংস করো অথবা অধীনস্থ বানিয়ে নাও। নিজেদের শত্রুতা আমরা হজরত ইসা আ.-এর আগমনের পর সমাধান করব। তিনি যদি খ্রিষ্টবাদকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেন, সেটা সবাই মেনে নেব আর যদি ইহুদিবাদকে বিজয়ী করেন, তাহলে সেটাও মেনে নেব। বর্তমানে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাধারণ খ্রিষ্টানদের মধ্যে এ ধারণাটি প্রবল এমনকি তাদের শীর্ষ ব্যক্তিদের মধ্যেও এ জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাই একটি সময় ছিল এমন যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ইহুদিদের রক্তখেকো 'ভ্যাম্পায়ার' (Vampire) হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। অথচ পরবর্তীতে একটি সময় আমেরিকান প্রেসিডেন্টরা ইহুদিদের বিকৃত মতবাদকে প্রচণ্ডভাবে সমর্থন করতে শুরু করে।

Scanned by CamScanner

রোনাল্ড রিগ্যানের মত প্রেসিডেন্টের অধিকাংশ পলিসি স্কোফিল্ড বাইবেলের ভবিষ্যদ্‌বাণীর উপর নির্ভরশীল ছিল। তার বিশ্বাস ছিল যে, আর্মেগেডনের[১৬৩] তার প্রথম শাসনামলে সংঘটিত না হলেও দ্বিতীয় শাসনামলে অবশ্যই সংঘটিত হবে। তার পরিকল্পনাবিদদের অনেকেই মৌলবাদের এমন কঠিন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা জলবায়ু দূষণ, পরিবার-পরিকল্পনা ও স্বেচ্ছামৃত্যুর মতো বিষয়ে আলোচনা করাকেও নিজেদের সময় অপচয় বলে ভাবত। তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ছিল, নিজেদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন খাতে খরচ কমিয়ে দিয়ে তা আর্মেগেডনের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত।

রিগ্যানের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল জর্জ বুশ সিনিয়র। সে এসব ক্ষেত্রে আরও বেশি ভবিষ্যদ্‌বাণীতে বিশ্বাসী ছিল। স্বাধীনচেতা রহস্যময় চরিত্রের অধিকারী বিল ক্লিনটন তো স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল, ইসরাইলের সমর্থনে যেকোনো রণক্ষেত্রে কাজ করতে পারাকে সে নিজের সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করবে। জর্জ বুশ জুনিয়র তো তার বাবার চেয়েও একধাপ এগিয়ে ছিল। এখন এ কথা স্পষ্ট যে, সে ইহুদিদের কোলে লালিত-পালিত প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানদের কট্টর ইহুদি সমর্থক সংগঠন ইভানজেলিস্টের সাথে সম্পর্ক রাখে। একবার সে এক বিমানযাত্রার প্রাক্কালে কোনো পাদরি না থাকায় কন্ডোলিজা রাইসের মাধ্যমেই প্রার্থনা কার্যক্রম পরিচালনা করে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন একবার সে একে ক্রুসেডযুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করে। যদিও পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে কথাটিকে ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে।

## সস্তা পণ্য এবং ঋণের পাহাড়

অবস্থার ভয়াবহতা এতটাই তীব্র হয়েছে যে, বর্তমানে মুসলমানদের শত্রু বিবেচনা করার ক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করে। উভয় জাতি মিলে মুসলমানদের উপর ধ্বংসের এমন কলাকৌশল অবলম্বন করে, যা তারা একসময় একে অপরের ওপর প্রয়োগ করতো। যেমন :

১. পুরুষ-মহিলা অবাধে মেলামেশার সুযোগ তৈরি করা।
২. সামান্য লালসার বিনিময়ে শাসকদের ক্রয় করা।
৩. বড় অঙ্কের ঋণের মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্রকে নিজেদের আয়ত্তে আনা।
৪. প্রচারমাধ্যমের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করা।

---

[১৬৩] সত্য মিথ্যার সর্বশেষ রণক্ষেত্র।

Scanned by CamScanner

৫. অশ্লীলতা ও নোংরামির প্রচার প্রসার করা।

৬. সুদ, জুয়া ও ঘুষের ব্যাপক প্রচার করা—যেন কারও দুআ কোনো কাজে না আসে।

৭. শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন বিশেষ করে ইহুদিদের প্রতারণা এবং তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধসমূহের আলোচনা সরিয়ে দেওয়া।[১৬৪]

৮. আগা খানের অনুসারী, বাহায়ি ও কাদিয়ানিদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন।[১৬৫]

৯. মুসলমান ছাত্রদেরকে ইহুদি জ্ঞানপাপীদের কাছে অধ্যয়ন করার পর মুসলমান দেশসমূহেই রপ্তানি করা।

১০. জনসাধারণকে উলামায়ে কিরামের কাছ থেকে ইসলামি জ্ঞান লাভের পরিবর্তে তাদের ফার্মে প্রতিপালিত ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে ধর্মচর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করা।

১১. অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে উলামায়ে কিরামকে ব্যস্ত রাখা।

১২. শাখাগত বিভিন্ন বিধানকে ধর্মের মূল রূপে উপস্থাপন করা।

১৩. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সকল ক্ষেত্রে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা।

আর তাই দেখা যায় এখন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও মানুষ ফ্রিজ ব্যবহার করছে। লাচ্ছি-মাঠার পরিবর্তে পেপসি, সেভেনআপ পান করছে। মাথার চুলে মেহেদি দেওয়ার পরিবর্তে কেমিক্যালযুক্ত হেয়ার কালার ব্যবহার করছে।

## ভেতরের শত্রু

এই যুগের শত্রুদের কাছে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে এবং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেভাবে বেধড়ক তা ব্যবহার করছে, এতদিনে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ইসলাম যেহেতু শুধুমাত্র কিছু রীতিনীতি ও প্রার্থনার নাম নয় যে, ইহুদিজমের সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলাম একটি চলমান জীবন্ত ও কার্যকারী ধর্ম। মুসলমান জনসাধারণ,

---

[১৬৪] যেমন পাকিস্তানের নতুন সিলেবাসমতে ষষ্ঠ শ্রেণির বইতে গাজওয়ায়ে আহজাবের আলোচনা পরিবর্তন করার পাশাপাশি গাজওয়ায়ে খায়বারের স্থলে খায়বারের সন্ধি শিরোনাম দেওয়া হয়েছে।

[১৬৫] ইসরাইলের অভ্যন্তরে শুধু এদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার অনুমতি রয়েছে।

Scanned by CamScanner

উলামায়ে কিরাম কুরআন ও মসজিদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একদিকে তাঁদের মাদরাসা ও খানকাসমূহ নিয়মিতভাবে তাদের রুহানি খাদ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে, অন্যদিকে তাদের উলামায়ে কিরাম অত্যন্ত সচেতনতার সাথে বাতিলকে চিনে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। এ জন্য মুসলমানদের মধ্যে আজও ইসলামি চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। বাতিলের বিরুদ্ধে উলামায়ে কিরামের কঠিন প্রতিরোধ তাদের ভিত কাঁপিয়ে তোলে। আর মুজাহিদিনদের কথা তো না বললেই নয়, যারা তাদের শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে ইসলামের আলোকে শুধুমাত্র জ্বালিয়ে রাখেননি; বরং তার আলো ধীরে ধীরে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। যার ফলশ্রুতিতে ইহুদিরা কাসাব্লাংকা থেকে সুলায়মানি কাঠামোর আকৃতিতে নির্মিত ইসরাইলের পার্লামেন্ট পর্যন্ত সফর সহজে করতে পারলেও সেখান থেকে অল্প দূরত্বের মসজিদে আকসা পর্যন্ত যেতে প্রতি কদমে তাদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।[১৬৬]

আর সেই আক্রমণের ধারাবাহিকতাকে নষ্ট করতে ইসরাইল মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন আদায় করাকে অত্যন্ত জরুরি মনে করছে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনের এই সমস্যাকে মুসলমানদের ধর্মীয় সমস্যা নয়; বরং আরবের রাজনৈতিক সমস্যা প্রমাণে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। দাজ্জালের অনুসারীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার নামের মৌলিক অর্থের বাস্তবতা প্রমাণে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আজ মুসলমানদের সামনে পরীক্ষার সময় এসেছে—তারা সুদ, জুয়া, অশ্লীলতা ও মিথ্যার এই তুফানে ভেসে যাবে নাকি নিজেদের সাথে কুরআন ও সুন্নাহের বন্ধনকে বজায় রেখে হারাম উপার্জন ও হারাম খাদ্য থেকে বেঁচে থাকবে।

হে মুসলমানগণ, স্মরণ রাখুন আজ যার সাথে হারাম-সংশ্লিষ্ট হবে, কাল বাতিলের বিরুদ্ধে যে সবল হতে পারবে না। এক হাদিসের বর্ণনামতে, দাজ্জালের বিরুদ্ধে মুসলমানদের দলের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পলায়নপর হবে; যাদের আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। আর তারাই হবে ওই সমস্ত লোক, যারা বহিঃশত্রুর ওপর বিজয়ী হতে চান; কিন্তু নিজেদের অন্তরের শত্রুর উপর বিজয়ী হতে পারেন না।

---

[১৬৬] কাসব্লাংকা শব্দের অর্থ সাদা বিল্ডিং। ইয়াহুদি ধর্ম শাস্ত্রমতে, এটি হবে তাদের পবিত্র শহরের কেন্দ্রবিন্দু। অবশ্য আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের বাসস্থানের নামও হোয়াইট হাউজ।

Scanned by CamScanner

# গাস এমিউনিম (Gush Emunim)

'স্টেনলে গোল্ড প্লেট' ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার একটি মধ্যবর্তী ইহুদি পরিবারের সন্তান। শিক্ষাদীক্ষায় তেমন উচ্চ পর্যায়ের না হলেও সে ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত কট্টর মানসিকতার ছিল। প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করার পর তাকে ব্যবসায় পারদর্শী করে তোলার জন্য ইহুদি ব্যবসায়ীদের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়। গোল্ড প্লেট যখন উচ্চপর্যায়ের ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে আসা যাওয়া শুরু করল, তখন যুগসচেতন চতুর ব্যবসায়ীরা তার বাবাকে রিপোর্ট দিলো যে, তার ছেলে অত্যন্ত মেধাহীন। ব্যবসায়িক রীতিনীতি আয়ত্ত করার মতো ক্ষমতা তার নেই। গোল্ড প্লেটের কৃপণ লোভী বাবা এই মন্তব্যে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তার ইচ্ছে ছিল, শেষজীবনে তার আশেপাশে পর্যাপ্ত ভোগ-সামগ্রী ও অর্থবিত্ত থাকবে। যদিও সে এসব অর্জন করতে পারেনি; কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল, তার ছেলে এই অপূর্ণ ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করবে। সে অনেক চেষ্টা করে; কিন্তু গোল্ড প্লেটের মাথায় এসব বিদ্যা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বিদ্যমান ছিল না। গোল্ড প্লেট বখাটেপনা শুরু করে এবং ইহুদিদের এমন সন্তানদের সাথে চলাফেরা শুরু করে, যারা জঘন্য অন্যায়গুলোকেও এ বিশ্বাস নিয়ে করতো যে, 'তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের সন্তান'। তার পিতা-মাতা জানত না, তার সন্ধ্যা ও বিকেল কোথায় কাটত এবং ধীরে ধীরে তার বাসায় আসা-যাওয়া কমে গেল। একদিন তার পিতা শুনতে পেল, সে 'গাস এমিউনিম'-ওয়ালাদের সাথে মিলে বিশ্বাসীদের দল 'ব্লক অব দ্য ফেইথফুল' (Block of the Faithful)-এ যোগদান করত দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পৈতৃক পুণ্যভূমির দিকে দেশান্তরী হয়েছে। এখন সে সেখানে ইহুদিদের নতুন বসতিতে বসবাস করে, যাদের কিনা হজরত ইসা আ.-কে প্রাথমিক সংবর্ধনা দেওয়ার সৌভাগ্য হবে।

বিশ্বাসীদের দল বলতে কী বোঝায়? এই উগ্র দক্ষিণপন্থী জায়নবাদী সংগঠন যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মসজিদে আকসার আঙিনায় পবিত্র পাথরের ওপর নির্মিত চত্বরকে ধ্বংস করে সেখানে গাঢ় লালবর্ণের দোষমুক্ত গরু জবাই করা।

ইহুদিদের আচার-ব্যবহার অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। যখন হজরত মুসা আ. তাদেরকে গরু জবাই করতে বলেছিলেন, তখন তারা প্রশ্ন করতে করতে তাঁকে

Scanned by CamScanner

বিরক্ত করে ফেলেছিল। অহেতুক প্রশ্ন করে ঠাট্টা-মশকরার মাধ্যমে নবিকে উত্ত্যক্ত করছিল। আর এখন হাজারও বছর পর সেই গরু জবাই করার সাধ জেগেছে। ইহুদি পণ্ডিতদের মতে, এই জবাইটি তাদের বিশ্বাসমতে হজরত ইবরাহিম আ. তাঁর পুত্র হজরত ইসা আ.-কে জবাই করার স্মরণে হবে।[১৬৭] তারা 'জেরুসালেম টেম্পল ফান্ড'-জাতীয় বিভিন্ন সংগঠন বানিয়ে রেখেছে যারা 'টেম্পল মাউন্ট'কে পবিত্র করে সেখানে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের নিমিত্তে বিশ্বব্যাপী ইহুদিদের কাছ থেকে লাখ লাখ ডলার চাঁদা একত্রিত করেছে। এই সংগঠনের সদস্যরা বেশিরভাগ জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে[১৬৮] এমন ভূমিতে বসবাস করে, যেখান থেকে মুসলমানদের গুম-খুনের মাধ্যমে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে দখল করা হয়েছিল। ইসরাইল সরকার এসব বসতির চতুর্পার্শ্বে অলঙ্ঘনীয় উঁচু উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করে দিচ্ছে। উগ্রতা ও উন্মাদনায় এসব সংগঠনগুলোর মস্তিষ্ক বৈকল্যের অনুমান এর মাধ্যমেই করা যায় যে, তাদেরই একটি অভিশপ্ত সংগঠন 'স্টের্ন গ্যাং' শরণার্থী শিবিরে অবস্থানরত মুসলিম নারী-পুরুষ-শিশুদের এত জঘন্য নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, যা পশ্চিমা মিডিয়ায় প্রচারিত হলে তারাও শিউরে উঠে। যার ফলে ডেভিড বেন গুরিয়ানের মতো উগ্রপন্থী ইহুদিও এদের অবৈধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। অথচ ইসরাইলের এসব শাসকরাই নিজেদের শত্রুতা ও মুসলিম-বিদ্বেষের বদনামে প্রসিদ্ধ রয়েছে। মুসলমানদের কথা না হয় বাদ থাকুক।

এই বিষাক্ত হিংস্র পশুদের অমানবিকতা এ পর্যায়ের ছিল যে, তাদের এক উগ্র সদস্য আল কুদুস শহরের কিং ডেভিড হোটেলে, যেখানে ব্রিটেনের কূটনৈতিক ও সামরিক সদস্যরা অবস্থান করছিল, সেখানে ২২ জুলাই ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এ জন্য বোমা হামলা করেছিল, যেন তারা অতি দ্রুত ফিলিস্তিনের ভূমি ত্যাগ করে এবং ইসরাইলিদের ওপর তাদের সহানুভূতিমূলক কর্তৃত্বের সমাপ্তি ঘটে। এই আক্রমণে ব্রিটিশ দূতাবাস এবং অস্থায়ী সামরিক হেডকোয়ার্টার ধ্বংস হয়ে যায়। ১০০-এর অধিক ব্রিটিশ সৈন্য নিজেদের হাতে প্রতিপালিত সাপের দংশনে ধ্বংস হয়ে যায়, যা এই অভিশপ্ত জাতির প্রতি উপকারীদের নিয়তি। ব্রিটিশ দূতাবাসে বোমা রাখা এই সদস্যটি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সেই বখাটে দেশান্তরী গোল্ড প্লেট। সে তার উগ্রপন্থী সঙ্গীদের সাথে নিয়ে ফিলিস্তিনে

---

[১৬৭] ইয়াহুদি ধর্মবিশ্বাসমতে, হজরত ইবরাহিম আ.-এর ছেলে হজরত ইসহাক আ.-কে পাথরের উপর রেখে কুরবানি করা হয়েছিল। তাই তিনি হচ্ছেন জাবিহুল্লাহ। যদিও ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ মতের সত্যতা পাওয়া যায় না।

[১৬৮] West Bank.

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন মসজিদ ধ্বংস করার লক্ষ্যে চাঁদা সংগ্রহ করতো। যেন এসব হামলার ফলশ্রুতিতে এমন রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হয়, যা মাসিহের আগমনকে ত্বরান্বিত করবে।

পাঠক হয়তো আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, এই সংগঠনগুলোতে ইহুদিদের সাথে খ্রিষ্টানদের কী যোগসাজশ? যার উত্তরে বেশ কিছু তথ্য আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে দিয়েছি, আরও কিছু তথ্য সামনের অধ্যায়গুলোতে উল্লেখ করা হবে। এভাবে হয়তো অধিকাংশ পাঠকই কোথাও বুঝতে পারছেন না যে, টেম্পল মাউন্টকে পবিত্র করার কী উদ্দেশ্য? এর উত্তরে ওই পাহাড়টির পরিচয় জানতে হবে, যার ব্যাপারে ইহুদিরা ধারণা করে যে, এই পাহাড় যার আয়ত্তে থাকবে বায়তুল মাকদিসও তাদের আয়ত্তাধীন হবে। এই পাহাড়ের গুরুত্ব তাদের ওই বক্তব্যের মধ্যে ফুটে ওঠে, যেখানে তারা বলেছিল, 'ইসরাইল পূর্ণাঙ্গ হবে না জেরুসালেম ব্যতীত আর জেরুসালেম পূর্ণাঙ্গ হবে না সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ ব্যতীত।' সেই কাঠামো ওই পাহাড়ের উপর নির্মাণ করা হবে আর যেহেতু এই পাহাড়ের উপর প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর প্রসিদ্ধতম অত্যন্ত সুন্দর ইসলামি স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনাগুলোর একটি স্থাপনা অবস্থিত রয়েছে, সেজন্য ইহুদিদের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই ইসলামি স্থাপনার ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত এই পাহাড় থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। এই পাহাড়টি প্রাচীন জেরুসালেমে অবস্থিত। যার নাম হচ্ছে 'জিওন বা জায়ন' (zion) পাহাড়।

ইহুদি ধর্মমতে, এই পাহাড়ের উপর হজরত দাউদ আ. একটি উপাসনালয় নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে তিনি আল্লাহর ইবাদাত করতেন। হজরত ইসা আ. বনি ইসরাইলের নবি ছিলেন, তাই তখন থেকেই এই পাহাড়কে পবিত্র মনে করা হয়। ইহুদিরা এই পাহাড়কে নিজেদের বৈশ্বিক বিপ্লবের একটি চিহ্ন বলে গণ্য করে। এই শব্দ থেকেই 'জায়নিজম' (Zionism) শব্দটি গঠিত হয়েছে।

ইহুদিদের পাঁচটি বৈশ্বিক উদ্দেশ্য রয়েছে। যাদের মধ্যে ইমানের ন্যূনতম বোধ রয়েছে তাদের বোঝা উচিত, ইসরাইলকে সমর্থনের মাধ্যমে তারা মূলত তাদের পাঁচটি বৈশ্বিক উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। আর এভাবেই ইহুদিদের সহযোগিতা করার মাধ্যমে তারা ইহুদিদের শাসনব্যবস্থার পথ ক্লিয়ার করছেন। কিন্তু ইহুদিদের সহযোগিতার এই আগ্রহ তাদের বেশি দিন থাকবে না অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন তারা দুঃখ করে ভাববে, ইশ, যদি এর পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করতাম!

Scanned by CamScanner

জায়নবাদীদের মৌলিক পাঁচটি লক্ষ্য এই—

১. ফিলিস্তিনভূমিতে পৃথিবীর সকল ইহুদিদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তাদের এ লক্ষ্যটি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে উপার্জিত হয়েছে।

২. জেরুসালেম শহরকে জায়নবাদী শাসনব্যবস্থার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা।

৩. সকল ইসলামি রাষ্ট্রসমূহকে জাতিগত, ভাষাগত ও দলগত দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট ছোট টুকরোয় বণ্টন করে দেওয়া। আমেরিকা ও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সেগুলোর শাসক নিয়োগ দেওয়া এবং তাদের সকল ক্ষেত্রে যেমন খনিজশিল্প, কলকারখানা, পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী; যেমন : বিদ্যুৎ গ্যাস এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থাসহ সকল মৌলিক চাহিদাসমূহ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ইহুদি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর আয়ত্তাধীন করে নেওয়া।

মধ্যপ্রাচ্যকে ১২টি ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত করে তাদের ওপর এমন শাসকদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা জানেও না তাদের তেলের লাগাম বাস্তবে অন্য কারও হাতে।

এই কথাগুলো কেউ রূপকথা মনে করবে আবার কেউ এতে নিজেদের দেশের অবস্থার ছাপ লক্ষ্য করবে। যার রূপরেখা পশ্চিমা নীতিনির্ধারকরা প্রস্তুত করে রেখেছে এবং সম্প্রতি একজন মুসলমান এবং পাকিস্তানি গবেষক ড. আবুল মায়ালি সাইদ তার *দ্য টুইন এরা অব পাকিস্তান : ডেমোক্রেসি এন্ড ডিকটেইটরশিপ (The Twin Era of Pakistan : Democracy and Dictatorship)* নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'নতুন সহস্রাব্দের শুরুতেই পাকিস্তান বেশ কয়েকটি ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হবে। প্রথম বিচ্ছিন্ন টুকরোটি হবে পাকিস্তানের সবচে উন্নত খনিজ ও শিল্প-কারখানায় পরিপূর্ণ 'দ্য রিপাবলিক অব বেলুচিস্তান'। দ্বিতীয়টি করাচি এবং হায়দারাবাদ নিয়ে 'লিয়াকতপুর' বা 'জিন্নাহপুর'। তৃতীয়টি সিন্ধু অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রাম নিয়ে 'সিন্ধুদেশ'। চতুর্থ অংশ উত্তরাঞ্চলের সাথে আজাদ কাশ্মিরকে সাথে নিয়ে 'কাশ্মির দেশ'। এই গ্রন্থটি 'ভিনটেইজ প্রেস' ম্যানহাটন নিউ ইয়র্ক থেকে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানে এসে পৌঁছেছে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের স্বাধীনতাকামীদের মনোবল বাড়িয়ে চলেছে।

Scanned by CamScanner

৪. জায়নবাদীদের চতুর্থ লক্ষ্য অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তা হচ্ছে, বায়তুল মাকদিসকে শহিদ করে সেখানে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ করা। আর সেই লক্ষ্যে সর্বমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এক দিকে গোল্ড প্লেটের মতো সন্ত্রাসী ও 'স্টার্ন গ্যাং'-এর মতো সন্ত্রাসী সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের পরিকল্পনার প্রারম্ভিক বাধা-বিপত্তি দূর করা।

আরেক দিকে জায়নবাদী মিডিয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ইহুদি দখলদারিত্বের বাস্তবতা থেকে অন্যান্য মুসলমানদের বিমুখ করা। তাই কখনো তাকে মুক্তিসংগ্রাম আবার কখনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়। কখনো ফিলিস্তিনকে জবর দখল করা সম্পত্তি বা ছিনতাইকৃত সম্পদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। কখনো তাকে ফিলিস্তিনিদের ধ্বংসের মাধ্যমে পরাশক্তিগুলোর হিংস্র খেলার নাম দিয়ে ঘটনার বাস্তবতাকে খাটো করা হয়।

আশ্চর্যজনকভাবে এই ঘটনা থেকে ধর্ম ও ধর্মীয় অংশকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং অনেকেই এ কথা যানেও না যে, ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের সংঘর্ষ মূলত একটি ধর্মীয় সংঘর্ষ; যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব নয়; বরং এটি সত্য ও মিথ্যার এমন সংগ্রাম, যেখানে প্রতিটি ইমানদারের ইমানের পরীক্ষা হবে। এটি শয়তান ও রহমানের এমন মহাযুদ্ধ যেখানে প্রতিটি ইমানদার ব্যক্তি প্রশ্নের আওতায় আসবে।

তৃতীয়ত, মুসলমানদের মধ্যে এমন ইহুদি মৌলভীদের তৈরি করা হচ্ছে, জারা ইনিয়ে-বিনিয়ে এই কথা বুঝাচ্ছে যে, ফিলিস্তিনের পবিত্রভূমি মূলত ইহুদিদের পৈতৃক সম্পত্তি এবং তাদের এই পৈতৃক অধিকারকে অস্বীকার করা মূলত আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করার নামান্তর।

চতুর্থত, কৌশল ও প্রতারণার খেলা। প্রত্নতত্ত্বের খুঁজে মসজিদে আকসার মেঝে বড় বড় সুড়ঙ্গ কেটে সেখানে ইহুদি ধর্মের উপাসনা আরম্ভ করা এবং এর মাধ্যমে ইহুদি পণ্ডিতরা ইহুদিদের এভাবে আশ্বস্ত করে যে, বর্তমানে মাটির নিচে এবং অচিরেই মাটির উপরে এর ধারাবাহিকতা আরম্ভ হবে। মাটির নিচের এই কর্মযজ্ঞকে মাটির উপর আনার চেষ্টা যার মাধ্যমে সর্বশেষ স্তরের বাস্তবায়ন ঘটবে তাকে

Scanned by CamScanner

ইহুদিদের ভাষায় 'গাস এমিউনিম' (Gush Emunim) বলা হয়। যা এই ভয়ংকর প্রচেষ্টার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গতার পর বাস্তবায়িত হবে।

৫. জায়নবাদীদের পঞ্চম লক্ষ্য—বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ফিলিস্তিনের পর পূর্ণাঙ্গ সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, কুয়েত এবং ইরাক ও সাউদি আরব, মিসর, তুরস্কের একাংশ যার অন্তর্ভুক্ত হবে; যা 'বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুত মাসিহের[১৬৯] মর্যাদার উপযোগী হবে। এবং সেখানে দাজ্জাল 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বা 'নতুন বিশ্ব নিয়ম' বাস্তবায়ন করবে। মুসলমান গবেষকগণ বার বার সতর্কবার্তা দিয়ে আসছেন যে, ইসরাইল নামের সাপ এসব দেশসমূহকে অচিরেই দংশন করবে। কিন্তু দূরবর্তী দেশগুলো যদিও ইসরাইলের অপকর্ম নিয়ে কিছুটা চিন্তিত; কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলো খাদেমুল হারামাইনের নেতৃত্বে বুশ-ব্লেয়ার জুটির কাছেই আশ্রয় খুঁজছে, যাদের নিজেদের জীবনকাঠিই ইহুদিদের হাতে।

জায়নবাদীদের হাতে প্রতিপালিত এসব উপনিবেশবাদীরা নিজেদের স্বার্থে এসব শাসকদের সাথে দুমুখো সাপের ন্যায় আচরণ করছে। বিশ্বের শয়তানি শক্তি এ কথা স্পষ্ট ঘোষণা করছে, আমরা সর্বশেষ যুদ্ধে নেমেছি এবং সবার পক্ষ থেকে নেমেছি।[১৭০]

অপশক্তি তার সর্বময় প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে; কিন্তু সত্যের সেনানীরা আজ পর্যন্ত অপশক্তির প্রপাগান্ডা সম্পর্কে অবহিত নয়। কে তাদের বোঝাবে যে, নিজেদের আশেপাশেও একটু খোঁজখবর নিন? কে তাদের বোঝাবে যে, পাহাড়ের নিচ দিয়ে শত্রুরা এগিয়ে আসছে। আজ বাতিলের এই বাহিনীকে মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্য নিজ নিজ অবস্থানে থেকে প্রতিহত করতে সক্ষম। যদি আজ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে ভবিষ্যতের ভয়াবহ বিপদ কি করে প্রতিহত করা সম্ভব হবে?

## সোনালি গম্বুজের প্রতিবিম্ব

'ড. ল্যাম্বারর্ড ডলফিন' (Dr. Lambert Dolphin) একজন মার্কিন বিজ্ঞানী। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত 'স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর সাথে

---

[১৬৯] টেকনোলজির মাধ্যমে খোদাদ্রোহীদের নিজের আয়ত্তে নেওয়া নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রধান দাজ্জাল।

[১৭০] প্রেসিডেন্ট বুশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।

Scanned by CamScanner

সম্পর্কিত। তিনি স্থাপত্য কর্মের মাটি পরীক্ষার জন্য এক্সরের মতো একটি রাডার আবিষ্কার করেছেন। এই রাডারটি মাটি পরীক্ষায় ব্যবহার হয় এবং যার ফলাফলের ওপর যথেষ্ট ভরসা রাখা যায়। তার আবিষ্কৃত যন্ত্রটির কর্মপদ্ধতি এই যে, কোনো এলাকার মাটি পরীক্ষার জন্য প্রথমে আকাশ থেকে ফটোগ্রাফি করা হয়। অতঃপর মাটির নিচের ফাটল ও অন্যান্য তথ্য জানার জন্য অত্যাধুনিক 'থার্মাল ইনফারেড ইমাজিনারি' (Thermal Infrared Imaginary) পদ্ধতি ব্যবহার করে মাটির নিচে রাডার প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে মাটির নিচে শব্দ পরীক্ষা করা হয়। এই ভৌগোলিক ও মাটি পরীক্ষার আলোকে ইঞ্জিনিয়াররা পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারেন।

ড. ডলফিন অত্যন্ত উগ্রপন্থী 'ডিসপেনসেইশনালিস্ট' (Dispensationalist) ছিলেন। তার প্রসিদ্ধি শুনে মসজিদে আকসার স্থানে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণে ইচ্ছুক সংগঠন 'জেরুসালেম টেম্পল ফাউন্ডেশন' এ ক্ষেত্রে তার সহযোগিতা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ফাউন্ডেশনের ইচ্ছা ছিল ড. ডলফিন এবং তার দল যেন সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে মসজিদে আকসার জমিনের একটি সার্ভে করে। বাহ্যত তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এলাকার মাটির নিরীক্ষণ করা; কিন্তু বাস্তবে মসজিদে আকসা এবং তার স্থাপনাগুলো কতটা মজবুত—এর জরিপ করা ছিল তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। তারা জানতে চাচ্ছিল কীভাবে কোন্ দিক থেকে মাটি খুঁড়ে কৃত্রিম ভূকম্পন তৈরির মেশিনের মাধ্যমে কতটা কম্পন তৈরি করলে অল্পসময় পরেই স্থাপনা নিজেই মুখ থুবড়ে পড়বে এবং সমগ্র বিশ্ব এই দুর্ঘটনাকে ইহুদিদের কুকীর্তির পরিবর্তে কুদরতের কারিশমা মনে করবে।

ড. ডলফিনের কাছে তার এবং তার দলের আসা-যাওয়া, জেরুসালেমে অবস্থান এবং যাবতীয় খরচ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। ড. ডলফিন যদিও নিজে একজন খ্রিষ্টান ছিল এবং ইহুদিদের এই প্রপাগান্ডা বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহর আদেশে হজরত ইসা আ.-এর পুনরুত্থানের পূর্বে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ করা উচিৎ। সে এ ব্যাপারে ইহুদিদের কাছে পর্যাপ্ত ফান্ড আছে জানতে পেরে তাদেরকে সাড়ে ১০ লাখ ডলার খরচ হবে বলে জানায়। এই সংগঠনকে 'ক্যালভারি চ্যাপেল' (Calvary Chapel) নামের একজন ইহুদি ব্যবসায়ী এই শুভ কাজের জন্য সমুদয় অর্থ যোগান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তাই ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ড. ডলফিন তার দলবল ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম নিয়ে এ কাজের জন্য রওনা দেয়।

Scanned by CamScanner

ড. ডলফিন মাটি পরীক্ষা করার এই রাডার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে কয়েক সপ্তাহ এই পবিত্র ভূমিতে অবস্থান করে। এ দীর্ঘ সময়ে সে বায়তুল মাকদিসে বিভিন্ন স্থানের মাটি খনন, এক্সরে করা ও মাটি পরীক্ষা করার পাশাপাশি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। পরিকল্পনার মূল পর্বে যখন মসজিদে আকসার অত্যন্ত নিকটে মাটি খনন করা ও শব্দ পরীক্ষা করার কাজ আরম্ভ করে, তখন ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মধ্যে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। মুসলমানদের প্রতিরোধকামী প্রতিক্রিয়ায় শহরের পরিবেশ উত্তপ্ত হতে থাকে এবং ডক্টর ও তার টিমের ওপর আত্মঘাতী হামলার আশঙ্কা তৈরি হয়। অবস্থার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে ইসরাইল সরকার এই ফাউন্ডেশনকে দেওয়া খননকার্যের অনুমতি বাতিল করে এবং ডক্টর ও তার দলকে অতিসত্বর দেশে ফিরে যেতে আদেশ দেয়।

ডক্টর ডলফিন ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে গেলেও তাদের এ তৎপরতা কি থেমে যায়? অবশ্যই না।

বায়তুল মাকদিসের জায়গায় সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ ইহুদিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য। তাদের ধারণামতে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে কাঠামো নির্মাণ করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মুক্তিদাতা দাজ্জালের আগমন ঘটবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত দাজ্জালের আগমন ঘটবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না এবং তাদের বিজয় সংঘটিত হবে না। এ জন্যই এখনো প্রায় একডজন সংগঠন এই পবিত্র মসজিদকে শহিদ করে সেখানে ইহুদি উপাসনালয় নির্মাণে অত্যন্ত তৎপর। এর জন্য লাখ লাখ ডলার চাঁদা একত্রিত করা হয় এবং তাদের অনুসারীদের জন্য নিজেদের ওয়েবসাইটে কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির তথ্য সরবরাহ করা হয়। সর্বমুখী এ তৎপরতায় প্রতিটি ইহুদি; চাই সে রাজনীতিবিদ, সন্ত্রাসী, ব্যবসায়ী অথবা কোনো ক্যাসিনোর ক্যাশিয়ার—নিজ নিজ অবস্থান ও সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করে।

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস থেকে আজ পর্যন্ত উগ্রপন্থী ইহুদিরা মুসলমানদের এই পবিত্র মসজিদে ১০০ বারের ওপর হামলা করেছে। আর এসব হামলার জন্য সেই তারিখটি নির্ধারণ করা হয়েছিল এ জন্য যে, এটি ছিল ১৩৮৭ খ্রিষ্টাব্দের সফর মাস। এটি ছিল সেই মাস, যখন আজ থেকে ১৩৮০ বছর পূর্বে মুসলমানরা খায়বারের গাদ্দার ইহুদিদের উপর বিজয়ী হয়েছিল। এই হামলায় অস্ত্রসজ্জিত ইহুদি পণ্ডিতগণ সবার আগে আগে অবস্থান করছিল।

Scanned by CamScanner

শোমেন গোরেন নামের একজন ইহুদি রাব্বিকে যখন ইসরাইলের প্রধান রাব্বি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, তখন তার অন্যান্য যোগ্যতার পাশাপাশি ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বায়তুল মাকদিস হামলায় ৫০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসীর নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাটিকেও বিশেষ বিবেচনায় দেখা হয়। এই হামলায় ইসরাইল সরকার পরিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। তারা ইসরাইলি সৈন্যদের মাধ্যমে হামলা করে সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের তাৎক্ষণিকভাবে উসকানি দিতে চায়নি। তাই তারা উগ্রপন্থী ইহুদিদের মাধ্যমে এসব কাজ সমাধা করিয়ে তাদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে রেখেছিল। আর এ জন্যই ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত ইসরাইলের শীর্ষ রাব্বি এসব উগ্র সংগঠনের বিরুদ্ধে কখনো মুখ খোলেনি। ইসরাইলের কোনো সরকারি কর্মকর্তা রাজনৈতিক দলের নেতা; চাই সরকারদলীয় বা বিরোধী দলের—কেউই এ হামলার কোনো নিন্দা জ্ঞাপন করেনি। নিজেদের বোকামির কারণে যদি এদের কেউ কখনো গ্রেফতার হয়ে যায়, তাহলে তার সাথে জাতীয় হিরোর ন্যায় আচরণ করা হয়। এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার কারণে তাদের কারও বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদে শাস্তি হয় না; বরং ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট এসব শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। এসবের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, প্রশাসন এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুধু পছন্দই করে না; বরং এসবে সহযোগিতা করে।

বায়তুল মাকদিসের পবিত্র ভূমিতে সংঘটিত সশস্ত্র হামলায় এমন ইহুদি রাব্বিরা অংশগ্রহণ করতো, যারা সরকারিভাবে নিযুক্ত ছিল এবং সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও বেতন-ভাতা ভোগ করতো। এসব ইহুদি নেতারা মিডিয়ার সামনে জনসাধারণকে শান্তির বাণী শোনাত এবং আরবদের[১৭১] সাথে সুন্দর আচরণের উপদেশ দিত। কিন্তু ইহুদিদের সামনে তাদের উসকানি দেওয়া এবং এদের সন্ত্রাসী দলগুলোকে সন্ত্রাসবাদে উদ্বুদ্ধ করতো। তাদের বক্তব্যের মৌলিক কথাগুলো ছিল এমন—পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে নির্বাসিত মানুষদের একত্রিত করা এবং নিজেদের স্থায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজেদের উপাসনালয় এবং কুরবানি দেওয়ার জায়গা প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষত নিউ ইয়র্ক[১৭২] থেকে ইসরাইলে যাওয়া ইহুদিরা এ ব্যাপারে বেশি কট্টর।

---

[১৭১] মুসলমানদের সাথে তাদের দ্বন্দ্বকে মিডিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে আরবদের সাথে দ্বন্দ্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হতো, যেন পৃথিবীবাসীকে ইয়াহুদি ও স্থানীয় আরবের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হিসেবে মেনে নেয়।

[১৭২] তাদের ভাষায় জিও ইয়র্ক।

Scanned by CamScanner

আসুন, এ ব্যাপারে তাদের মতবাদগুলো দেখা যাক।

- ববি ব্রাউন ব্রুকলিনের অধিবাসী। শুধু মাসিহকে স্বাগতম জানানোর জন্য সে ব্রুকলিনের বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে অধিকৃত ফিলিস্তিনের একটি গ্রামে বসবাস করাকে বেছে নিয়েছে। 'টেকোয়া' (Tekoa) টিকোয়া নামের এই গ্রামটি বায়তুল লাহামে অবস্থিত। সে একবার সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছিল—'মাউন্ট মরায়া (Mount Moriah-এর উপর মসজিদে আকসার উপস্থিতি এই পৃথিবীর জন্য সবচে বড় বোঝা। জেরুসালেমের যেকোনো ছবিতে তাকালেই এ মসজিদটি দৃষ্টিগোচর হয়। আর তাকে তো বিধ্বস্ত হতে হবেই।[১৭৩] একদিন সেখানে আমরা আমাদের উপাসনালয় তৃতীয়বারের মতো প্রতিষ্ঠিত করবই। আর এটি আমরা অবশ্যই করব যাতে সমগ্র আরব এবং পৃথিবীবাসী অনুধাবন করে যে, পুরো জেরুসালেম; এমনকি পুরো ইসরাইলেই আমাদের কর্তৃত্ব রয়েছে।'
- রবার্ট ফ্রায়েডও আমেরিকা থেকে ইসরাইলে যাওয়া একজন ইহুদি। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করে দেওয়া একটি মহাযুদ্ধের সূচনা করবে—এই বিষয়টাকে আপনি ভাবছেন না?' তখন সে বলেছিল, 'অবশ্যই, এমন একটি যুদ্ধ আমরা কামনা করি। কারণ, তাতে আমরা বিজয়ী হব। অতঃপর আমরা সকল আরবদের তথা ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ইসরাইল ভূমি থেকে বহিষ্কার করব এবং তখন আমরা নিজেদের উপাসনালয় নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করব।'
- রোজান হিওর নামের ইহুদি সংগঠনের এক কেন্দ্রীয় নেতা বিশ্বব্যাপী ইহুদিদের কাছ থেকে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য চাঁদা একত্রিত করে। সে একবার প্রকাশ্যে বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে বলেছিল, 'ইহুদি উপাসনালয় নির্মাণের জন্য মসজিদে আকসা ধ্বংস করলে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে তা-ই হোক। এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা।'
- ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এহুদা ইটজোন নামের এক ইহুদি সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছিল। সে মসজিদে আকসাকে গোপনে ধসিয়ে দিতে মিনাখামলোনি নামের ইসরাইলি সেনাবাহিনীর একজন রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারের সাথে মিলে গোপন পরিকল্পনা করছিল। বিমানবাহিনীর এক পাইলটকেও তার সাথে নিয়েছিল, যেন সে মসজিদে আকসার

---

[১৭৩] বায়তুল মাকদিসের সোনালি গম্বুজের প্রতি ইয়াহুদিদের হিংসা ও বিদ্বেষ এই একটি বাক্যতেই ফুটে ওঠে।

Scanned by CamScanner

উপর বিমান নিয়ে আকাশ থেকে হামলা করতে পারে। এদিকে স্থলপথেও বোমাসজ্জিত ইউনিট মসজিদে আকসার অঙ্গনে প্রবেশ করতে প্রস্তুত ছিল। হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই তারা গ্রেফতার হয়। মামলা চলাকালীন ইটজোন বলেছিল যে, 'ইসরাইল সরকার যেহেতু পৃথিবীপৃষ্ঠে মুসলমানদের থেকে পবিত্র করছে না, তাই এটি আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।' সে নিজের কাজে মোটেও লজ্জিত ছিল না এবং আদালতকে বলেছিল, 'আমাদের মসজিদে আকসা এবং বোরাক দেয়ালকে অবশ্যই সরাতে হবে।'

এই হচ্ছে অবস্থা, যা থেকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা যায় যে, মসজিদে আকসা বর্তমানে কতটা ভয়ংকর পরিস্থিতিতে রয়েছে। আজ সেটি বড় ধরনের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ। নিরীহ ফিলিস্তিনিরা তাদের আহত দেহকেই মসজিদে আকসার চতুর্পার্শ্বে দুর্গ হিসেবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কিন্তু তারা কতকাল এভাবে এর হেফাজত করে যাবে? এটি আজ শুধু তাদের নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের আত্মমর্যাদার বিষয়। কিন্তু আজ ফিলিস্তিনের এই দুঃখে অংশীদার হওয়ার কেউ নেই। কেউ আজ ফিলিস্তিনের অশ্রু মুছে দিতে আগ্রহী নন। মুসলমানদের আজ বিপদ-আপদে আক্রান্ত হওয়ার একটি বড় কারণ এই যে, তারা তাদের পবিত্র স্থানগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছে না। তারা তাদের নিপীড়িত ভাইদের ব্যাপারে এমন কঠোর মনের পরিচয় দিচ্ছে, যার পরিণাম ভাবতেও ভয় লাগে।

রবিউল আউয়াল মাসে আমাদের এদিকে মক্কা মুকাররমা ও মসজিদে নববির প্রতিকৃতি বানানো হয়। যেহেতু এই পবিত্র স্থানগুলোর সাথে ভালোবাসা প্রকাশ করা মুসলমানদের ইমানি পরিচয়। আর তাই সবাই নিজেদের মানসিকতা অনুযায়ী ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়ে থাকে; কিন্তু ওই মসজিদে আকসার কী হবে, যা আজ ইহুদিদের দখলে এবং কেউ তাকে স্মরণ করছে না। বাস্তবতা হলো, মুসলমানদের পবিত্র স্থান দুটি নয়; বরং তিনটি। বায়তুল্লাহ, মসজিদের নববি এবং বায়তুল মাকদিস। প্রথম দুটি স্থানে মুসলমানরা উপস্থিত হন এবং সেখানে মনোমুগ্ধকর ছবি তাদের কাছে বিদ্যমান। অনেক মসজিদেই মসজিদে নববির অনুকরণে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। ফয়সালাবাদের একটি ফ্যাক্টরির পাশে নির্মিত মসজিদের মিনারের নির্মাণশৈলী এতটাই চমৎকার, যার নির্মাণের প্রশংসা করতেই হবে। আর এসব মুসলমানদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয়

Scanned by CamScanner

দিতে হলে তৃতীয় পবিত্রতম স্থানটিকেও ভুলে যাওয়া চলবে না। এই আলোচনাকে আমাদের ভুলে যাওয়া চলবে না। কেননা, এই মসজিদ-সংক্রান্ত বিষয়েই ভবিষ্যতে আমাদের ইমানের সর্বোচ্চ পরীক্ষা হবে। মুসলমানদের ঘর, অফিস এবং বৈঠকখানা এই মসজিদের ছবি দিয়েও সুসজ্জিত থাকা উচিত। এ ছাড়াও মসজিদের গম্বুজ নির্মাণে বায়তুল মাকদিসের সেই প্রসিদ্ধ সোনালি গম্বুজের অনুকরণও করা যেতে পারে, যাতে নতুনত্বের পাশাপাশি এই পবিত্র ঐতিহ্যের সাথে আমাদের বন্ধন প্রকাশ পাবে। যে বন্ধনকে আজ শত্রুরা ভুলিয়ে দিতে চায়।

ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মুসলমানদের এমন প্রজন্ম চলে যাচ্ছে—যারা নিজেদের চোখে কখনো বায়তুল মাকদিসকে দেখেছিল। স্পেনের কর্ডোভা মসজিদের মতো মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম হয়তো এ কথা জানবে না যে, বায়তুল মাকদিস কী ছিল; যা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, নাজাফ এবং কারবালার ইসলামি নিদর্শনসমূহ মুসলমানদের কাছে পাওয়া যায়; কিন্তু ফিলিস্তিনকে এতটা ইয়াতিম করে দেওয়া হয়েছে যে, তার কোনো প্রতিকৃতি পাওয়া যায় না। মুসলিম দেশগুলোতে নতুনত্ব ও আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে অনেক মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। নতুন নির্মিত কোনো মসজিদের মূল গম্বুজ যদি সোনালি গম্বুজের অনুকরণে তৈরি করা হতো, তা অবশ্যই নতুন প্রজন্মকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে পারত। আর যদি মসজিদের কাঠামো সোনালি গম্বুজের চত্বরের ন্যায় অষ্টভুজ আকৃতির হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

*জরবে মুমিনে* মসজিদে আকসার বিভিন্ন ডিজাইনের এবং বিভিন্ন দিক থেকে নেওয়া এত পরিমাণ ছবি ছাপা হয়েছে, যা দেখে যেকোনো ইঞ্জিনিয়ার সহজেই এর নমুনা তৈরি করতে পারবেন। আর কেউ যদি চায়, তাহলে মসজিদে আকসার ছবিসম্বলিত ভিডিও পাওয়া যাবে। আর এই গম্বুজ যদি মসজিদের মূল কাঠামোর মধ্যখানে নির্মাণ করা হয়, তাহলে এতে বেশি খরচও হবে না।

যে জাতি নিজেদের ঐতিহ্য ও স্মারকসমূকে সংরক্ষণ করতে পারে, তাকদিরের ফয়সালাতেও তারা নিজেদের স্থায়িত্ব লিখে নিতে পারে। আর যারা নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য ভুলে যায়, তাহলে আল্লাহ নিজের ধর্মের জন্য কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর হেফাজতের জন্য অন্য কাউকে নির্বাচিত করে নেবেন।

Scanned by CamScanner

# তাওরাত কী বলে

- মাওলানা সাহেব, আসসালামু আলাইকুম।

- ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

- কেউ কেউ এ কথা বলেন যে, ইসরাইলি ইহুদি রাষ্ট্র নয়; তবে ইহুদিদের রাষ্ট্র।

- শব্দের এই খেলার মাধ্যমে তাদের উদ্দ্যেশ্য কী?

- ইসরাইলের প্রতি ঘৃণা কমানো ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য হতে পারে!

- তাওরাতের বর্ণনামতে, ইহুদিদের মন্দ কাজের জন্য যেহেতু আল্লাহ তাদের ঘৃণা করেন; ইসরাইলের প্রতি ঘৃণা কমানোর তাদের কি আবশ্যকীয়তা দেখা দিয়েছে? তারাও কি সেই অভিশাপের অংশ নিতে চায়, যা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, নবিদের সাথে বেআদবিকারী একটি প্রতারকগোষ্ঠী অর্জন করেছিল?

- আচ্ছা আপনি এ ব্যাপারে কিছু দিকনির্দেশনা দিন।

- প্রথমে এটা বলুন, এই লোকগুলো সাধারণ মানুষ নাকি আলিম।

- দেখতে আলিম মনে হয়। আর সেজন্যই তো আমরা চিন্তিত হয়েছি।

- তাহলে তো ইসরাইলি মাওলানা।

- ইসরাইলি মাওলানা?

- জি হ্যাঁ। বর্তমানে উলামায়ে সু-এর একটি নতুন প্রকার মাঠে এসেছে, যারা নোংরামি ও নিকৃষ্টতার দিক থেকে উলামায়ে সু-এর পূর্ববর্তী তিনটি দলের চেয়ে অগ্রগামী।[১৭৪]

- এবার আপনি এ বিষয়ে কিছু বলুন।

---

[১৭৪] পূর্ববর্তী দল তিনটি হচ্ছে, পেটপুজারি আলিম, দরবারি আলিম এবং কাঠমোল্লা।

Scanned by CamScanner

- আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন যে, ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাতা কারা?[১৭৫] তারা তো একে শুধু ইহুদি ও জায়নবাদী রাষ্ট্র বলে ক্ষান্ত হয় না; বরং তারা একে প্রতিশ্রুত ভূমি অথবা পৈতৃক সম্পত্তি আখ্যা দিয়ে বিশ্বব্যাপী এ লিফলেট বিতরণ করে যে, 'মাসিহকে স্বাগত জানাতে ইসরাইলে একটি ইট স্থাপন করুন বা একটি গাছ লাগান।' তাদের বিশ্বাসমতে, নীলনদ থেকে টাইগ্রিস নদী পর্যন্ত 'বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্রের' প্রতিষ্ঠা কাজে সহযোগিতা না করা ইহুদিরা ধর্মভ্রষ্ট ও ধর্মের গণ্ডিবহির্ভূত।

বিন গোরিয়ান বলেছিল, 'যে ইহুদি প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করবে না, সে ইসরাইলের প্রভুর দয়া থেকে বঞ্চিত হবে।'

মঁশে দায়ান ৬ জুন ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধের সমাপ্তিতে বলেছিল, 'এখন আমরা জেরুসালেম দখল করেছি, অচিরেই আমরা ইয়াসরিব[১৭৬] ও ব্যাবিলন অভিমুখে রওয়ানা হব।'

ওই পেটপূজারি আলিমদের আপনি জিজ্ঞেস করুন, 'ইহুদিরা ইয়াসরিব বলতে কোন শহরকে বোঝায়?' ইসরাইলের পার্লামেন্টে বৃহত্তর ইসরাইলের মানচিত্র রয়েছে তা আমরা প্রকাশ করেছি। এই মানচিত্রটিই এ কথা বোঝার জন্য যথেষ্ট যে, 'ইসরাইল ইহুদি রাষ্ট্র' নাকি 'ইহুদিদের রাষ্ট্র'।

- উনাদের বক্তব্য হচ্ছে, 'ইসরাইলের পার্লামেন্টে মুসলমানরাও রয়েছে।'

- আপনি তাদের এক-দুই জনের নাম বলুন।

- নিশ্চুপ।

- ইসরাইলের সরকারি দল 'অ্যাগোডাট লেবার পার্টি' (Agudat Labour Party)-এর গঠনতন্ত্রে লেখা আছে, 'ইসরাইল অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় একটি রাষ্ট্র নয়। তাওরাতের চিরস্থায়ী বিধানসমূহ ইসরাইল জাতি ও ইসরাইল রাষ্ট্রের ঐশী সংবিধান।'

- আপনি এ কথার কোনো রেফারেন্স দিতে পারবেন?'

- রেফারেন্স? আপনি ইন্টারনেট থেকে নিজেই খুঁজে নিতে পারেন। তবে আমাকে এ কথা জানিয়ে দেবেন যে, 'ঐশী সংবিধান বলতে কী বোঝানো হয়।'

---

[১৭৫] দুই ডাক্তারের গল্প অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[১৭৬] মদিনা মুনাওয়ারা।

Scanned by CamScanner

- উনারা এই কথাও বলেন যে, 'জেরুসালেম ও বায়তুল মাকদিসে মূলত ইহুদিদের অধিকার রয়েছে।'

- 'ফিলিস্তিনি ভূমির পৈতৃক অধিকার' শব্দটিই এ কথা বুঝিয়ে দেয় যে, তাদের এই ভূমিকে চিরস্থায়ী ইহুদি রাষ্ট্রের দাবি মিথ্যা।[১৭৭]

- আচ্ছা, আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব, তবে মসজিদে আকসার জায়গা তো ইহুদিদের পাওয়া উচিত। কারণ, এখানে তাদের নবি হজরত সুলায়মান আ.-এর সুলায়মানি কাঠামো নির্মিত ছিল।

- আপনি আমাকে প্রথম কথাটি পুরো করতে দিন। ফিলিস্তিনভূমি ইসরাইলিদের পৈতৃক অধিকার বলতে ওই মৌলবীরা কী বোঝায়? ভূমিগত অধিকার তো প্রমাণিত নয়। কেননা, ইহুদিরা সেখানে বহিরাগত হিসেবে বসবাস করতো। তাওরাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—'তাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষ হজরত ইবরাহিম আ. ইরাক থেকে এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন।' যখন তিনিই ফিলিস্তিনের মূল অধিবাসী নন; তাহলে ফিলিস্তিন কীভাবে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি হয়? আর যদি রুহানি অধিকারের দাবি করা হয়, তাহলে তাওরাতের বাণী অনুযায়ী 'তাদের পাপাচারের কারণে এ অঞ্চলের পৈতৃক অধিকার থেকে তাদের বিচ্যুত করা হয়েছিল। অন্যথায় তারা তো চিরকাল এখানেই বসবাস করতো। গোলাম-বাঁদি বানিয়ে কেন তাদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?'

- আপনি তাওরাত পড়েছেন?

- কয়েকবার। এবং মাঝে-মধ্যেই পড়ি। সব আলিমের এটি পাঠ করা উচিত। যদি ইতিহাসের নিরিখে ধর্মীয় স্থানের ওপর তাদের কর্তৃত্বের কথা বলা হয়, তাহলে আমি বলব, সেটিও প্রমাণিত নয়। কেননা, সুলায়মানি কাঠামো ইহুদিরা এখানে কোনো খালি স্থানে করেনি এবং বাস্তবতা এমন নয় যে, এখানে সুলায়মানি কাঠামোর পূর্বে অন্য কোনো স্থাপনা ছিল না। এখানে তো হজরত আদম আ.-এর যুগ থেকে উপাসনালয়ের অস্তিত্ব ছিল। কাবাগৃহের প্রাথমিক নির্মাণ হজরত আদম আ. করেছিলেন আর বায়তুল মাকদিস বায়তুল্লাহর নির্মাণের ৪০ বছর পর নির্মাণ করা হয়েছিল। ইহুদিদের আবির্ভাবের হাজার বছর পূর্ব থেকেই গৃহের অধিকার সত্যের সন্ধানীদের জন্য নির্ধারিত। মাঝখানে ইহুদিদের যুগ এসেছিল, যখন হজরত দাউদ ও সুলায়মান

---

[১৭৭] চিরস্থায়ী ইয়াহুদি রাষ্ট্র হলে তো তা হাতছাড়া হওয়ার কথা না।

Scanned by CamScanner

আ. নবি হিসেবে এসেছিলেন। অতঃপর যখন ইহুদিরা তাঁদের অবাধ্যতা ও তাঁদের সাথে বেআদবি করছিল, তখন এই নবিদের বদদুআ তাদের পেয়ে বসেছিল এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব হারিয়ে বহিষ্কৃত হয়েছিল। আর কিয়ামাত পর্যন্ত সময়ের জন্য সঠিক আসমানি ধর্মের অনুসারীদের জন্য এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়।

সারকথা, ইহুদিদেরও হাজার বছর পূর্বে এ অঞ্চলে ইবাদাতস্থান ছিল এবং ইহুদিদের পরেও একাত্মবাদে বিশ্বাসীদের ইবাদাতের জায়গা ছিল। ইহুদিরা শুধু ওই উপাসনালয়ের দাবি করতে পারে, যা তারা এখানে এককালে নির্মাণ করেছিল; কিন্তু মসজিদে আকসার ওপর নয়। কারণ, এটি তাদের নির্মিত নয়। ইহুদিদের হাজার বছর পূর্ব থেকে তা প্রতিষ্ঠা ছিল এবং তাদের পরেও কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলমানদের ইবাদাতগাহ হিসেবে নির্ধারিত।

- তারা এ মূলনীতি বর্ণনা করেন যে, 'প্রতিটি ধর্মের মৌলিক উপাসনালয় সে ধর্মের অনুসারীদের পাওয়া উচিত।'

- ইহুদিদের আবার মৌলিক নীতি! অবশ্য এই মূলনীতির উত্তর আমি দিয়েছি। যদি ইহুদিরা স্থান দখল করতে চাইত, তাহলে তাদের উচিত ছিল যখন হজরত মুসা আ. বারংবার তাদের এ অঞ্চলকে দখল করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তখন তো তারা বেআদবিমূলক উত্তর দিয়েছিল—'আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন; আমরা এখানেই বসে রইলাম।' যদি এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব এবং সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের ইচ্ছা থাকত, তাহলে তখন কেন তারা যায়নি?

- এখন যেহেতু তারা অধিকাংশ ফিলিস্তিন দখল করে নিয়েছে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তারা ফিরে যাবে না। তাই তাদের মেনে নেওয়াই উত্তম।

- ফিলিস্তিনের এই দখল তারা করেনি; বরং এটি তাওরাতে বর্ণিত তাদের সেই নিয়তি হিসেবে সংঘটিত হচ্ছে, যার ফলে তারা হজরত ইসা আ.-এর হাতে পরিপূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্য এ অঞ্চলে একত্রিত হচ্ছে। কেউ যদি তাদের এই অবৈধ দখলকে স্বীকৃতি দেয় বা তাদের এ দখলদারিত্ব মেনে নেয়, তাহলে তার ভাগ্যেও তাদের মতো শাস্তিই নির্ধারিত থাকবে।

- মাওলানা সাহেব, আপনি কেন এখানে বসেই ফিলিস্তিনের কথাবার্তা বলেন?

- আমি ওইসব ইমান-বিক্রেতাদের এ কথাই বলতে চাই, তারা কেন এখানে বসেই ইসরাইলের কথা বলে?

Scanned by CamScanner

এবার মূল উত্তর শুনুন। পৃথিবীব্যাপী বর্তমানে যত অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়, এগুলো মূলত ফিলিস্তিনভূমির শেষ বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি। যাকে 'আর্মেগেডন' (Armageddon) বলা হয় এবং যেখানে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুজাহিদদের বড় অংশীদারত্ব থাকবে।

জারকাবি ইরাক থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করতে গিয়ে শহিদ হন নাই; বরং তিনি মসজিদে আকসাকে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। 'জারকা' হতে 'বাকুবা' পর্যন্ত তাঁর জীবনকাহিনি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। তাঁর জীবনের প্রতিটি মোড় জেরুসালেম ও মসজিদে আকসাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। আফগানিস্তানের যুদ্ধ খনিজ-পদার্থে ভরপুর তাঁদের পাহাড়সমূহকে রক্ষার জন্য নয়; বরং তা মূলত 'জিয়ন' পাহাড়কে খোদাদ্রোহী ইহুদিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। বাবরি মসজিদের শাহাদাত মূলত মসজিদে আকসাকে নিশ্চিহ্ন করার রিহার্সেল। ইহুদি এবং হিন্দুরা ভাই ভাই। ইস, যদি আরব ও অনারব মুসলমানরাও ভাই ভাই হতো!

- মাওলানা সাহেব, আপনার কথাগুলো বুঝে আসছে না।

- যদি কেউ বুঝেও না বুঝে, তাকে সেটা বোঝানো সম্ভব নয়। অবশ্য তারাও চাচ্ছে না যে, এ বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে এখনি বুঝিয়ে দেওয়া হোক। তারা এ ব্যাপারে 'ধীরে চলো' নীতি অবলম্বন করতে চায়। হতে পারে, অনেকেই জিহাদ এবং তাকওয়া ভুলে গিয়ে হজরত মাহদির অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ থাকবে। কিন্তু জিহাদ ও তাকওয়া ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে তারা বা তাদের বংশধররা হয়তো হজরত মাহদির পবিত্র দলে স্থান পাবার যোগ্য থাকবে না।

Scanned by CamScanner

# নিকৃষ্ট শত্রু যখন উত্তম বন্ধু

আমেরিকায় যাতায়াত করা মানুষদের ব্যাপারে অনেকেই কৌতূহলী থাকে এবং তাদেরকে সেখানকার তেলেসমাতি জীবনযাপন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে থাকে। তাদের কৌতুহলের অবশ্য বিভিন্ন কারণ থাকে। আমার সাথে যদি পশ্চিমা শিক্ষিত কোনো ব্যক্তির দেখা হয়, তাহলে তাদের কাছ থেকে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে কৌতূহল বোধ করি। মজার কথা হচ্ছে, ওই তিনটি প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তরকে একত্রিত করলে একটি আশ্চর্যজনক চিত্র ফুটে ওঠে। সে তিনটি প্রশ্নের আলোচনা অন্য কখনো করব। তবে আজ আমি আপনাদের এ ব্যাপারে এক যুবকের মন্তব্য শোনাব। এই মেধাবী যুবক ৭ হাজার ছাত্রের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকায় গিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, 'কখনো কোনো ইহুদির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে কি না?'

সে আমাকে উত্তর দিলো, 'জি হ্যাঁ, আমার একজন ক্লাসমেট ছিল ইহুদি; যে কিনা আমার ভালো বন্ধুও ছিল।'

তার ধারণা ছিল, আমি তাকে এ কথা জিজ্ঞেস করব যে, 'ইহুদি আবার বন্ধু?' কিন্তু তাকে আমি এ ধরনের কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

আমি ইহুদিদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা জানি যে, তারা ব্যক্তিগত জীবনে ভালো ব্যবসায়ী এবং ভালো আচরণের হয়ে থাকে। তারা এতটাই অমায়িক হয় যে, মনের ভিতর ঝড়-তুফান চলতে থাকলেও মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকটি বলল, 'একদিন আমি তাকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'একজন মুসলমান; তা-ও আবার পাকিস্তানি; তার সাথে বন্ধুত্বের তাৎপর্য কী?' আমার কথা শুনে ইহুদি বন্ধুটি জোরে হেসে উঠল; যেন সে আমার কথায় মজা পাচ্ছিল। সে আমাকে উত্তর দিল, 'তোমাদের সাথে আমাদের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তোমরা মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করো; কিন্তু জাতিগতভাবে আমাদের অনুগত। অন্যদিকে আমরা ইহুদিরা তোমাদের সাথে জাতিগতভাবে শত্রুতা পোষণ করলেও ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুত্বপূর্ণ।'

Scanned by CamScanner

পাঠক লক্ষ্য করুন, ইহুদি যুবকটি একটি বাক্যে তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ও কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট করেছে। ইহুদিরা পৃথিবীতে যেখানে অবস্থান করুক এবং ব্যক্তিগত জীবনে যেমনই হোক—তাদের জাতিগত উদ্দেশ্যেকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায় না। তারা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায় না যে, তারা এমন একটি জাতির সদস্য, যারা ৪ হাজার বছরের অভিশপ্ত জীবন অতিবাহিত করে প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। যেখানে তারা বর্তমান স্থায়ী বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে নিজেদের বসতি স্থাপন করছে। আর এসব জঘন্য অত্যাচারের উপর মিথ্যার আবরণ জড়িয়ে প্রচার চালানোকে তারা প্রত্যেকে নিজেদের কর্তব্য ভাবে। জাতিগত এই অত্যাচার যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের সাধারণ জনগণকে নিজেদের বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তাতে অংশগ্রহণ করাকে প্রতিটি ইহুদি নিজেদের কর্তব্য মনে করে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিবেশী মুসলমানদের সাথে তাদের আচরণও অত্যন্ত নরম হয়। এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় মুসলমানদের মধ্যে। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অত্যাচার সম্পর্কে জানার পর প্রতিটি মুসলমানের ইহুদিদের ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেও জাতিগতভাবে ইহুদিদের সহযোগীদের তালিকায় মুসলমানদের নামটি সবার আগে অবস্থান করবে। এই ব্যাপারে উদাহরণের লিস্টে ফিলিস্তিনের নামটি সবার আগে থাকবে।

'ফিলিস্তিন জিন্দাবাদ' অথবা 'ফিলিস্তিন মুক্ত হওয়া' পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে এ জাতীয় স্লোগান দেওয়া লোকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু যখন হামাসের ইসলামি চেতনার কারণে তাদের অত্যাচার করা হচ্ছিল এবং ফিলিস্তিনি মুসলমানদের নরকের দুয়ারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন তাদের এ দুরবস্থা থেকে বের করার জন্য পৃথিবীবাসীর কেউই সামনে এগিয়ে আসেনি। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও মুসলমান জনসাধারণের ব্যক্তিগতভাবে ফিলিস্তিনিদের সাহায্যে দাঁড়ানোর মানসিকতায় কোনো ঘাটতি ঘটেনি। মুসলমান জনসাধারণের ভালো গুণগুলোর একটি এই যে, ব্যক্তিগত বিভিন্ন ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তারা বাতিলের সাথে সন্ধি করতে রাজি নয়। সমস্যা তাদের এমন শাসকদের নিয়ে, যাদের হাতে এখন ইসলামি বিশ্বের শাসনভার থাকলেও তারা মুসলমানদের চেতনার প্রতিনিধিত্ব করার চেয়ে পশ্চিমাদের আনুগত্যকে বেশি ভালোবাসেন।

পশ্চিমারা গত শতাব্দী থেকে নাগরিক স্বার্থের দিক থেকে সকল মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের প্রতি অনুভূতিহীন শাসকদের মুসলিম দেশসমূহের শাসক হিসেবে দেখতে পছন্দ

Scanned by CamScanner

করে। যারা বাহ্যিকভাবে দেশ ও জাতির ভালোবাসার দাবিদার হলেও পশ্চিমাদের স্বার্থে সকল ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে। হামাসের বিভিন্ন সফলতার পর তাদের উপর অমানবিক নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোর পরেও ইসলামি বিশ্বের এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা কী প্রমাণ করে?

উম্মাতে মুসলিমার জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের কাছে সবিনয় অনুরোধ করব, আল্লাহর ওয়াস্তে পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচারকে পশ্চিমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণাঙ্গরূপে বোঝার চেষ্টা করুন। ভাসা ভাসা কিছু তথ্যের আলোকে তাদের কৃষ্টি-কালচারকে বুঝে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে যাবেন না। আলজেরিয়ার পর ফিলিস্তিন পশ্চিমাদের এমন দ্বিমুখী আচরণের শিকার, সেখানে মানবতার ন্যূনতম মূলনীতিগুলোকর প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়নি। তবুও আমরা তাদের মানবতা ও ভদ্রতার গুণগান গেয়ে যাচ্ছি। আমেরিকার ইহুদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট (Madeleine Albright) [১৭৮] আমেরিকা কতৃক আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিল, 'আমেরিকা এমন কোনো রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে পারে না, যা গণতান্ত্রিক মূলনীতির বাইরে প্রতিষ্ঠিত।'

অনেকেই ভেবে ছিল, গণতান্ত্রিক পন্থার প্রবর্তক হওয়ায় আমেরিকা এ মন্তব্য করেছে। কিন্তু এখন গণতান্ত্রিক পন্থায় হামাস ক্ষমতায় এলে তাদের মাথাব্যথা কেন হয়? যার উত্তর ওই মহিলা বা তার স্থলাভিষিক্ত কেউ আজ পর্যন্ত দিতে পারবে না। দ্বিমুখী নীতির অধিকারী আমেরিকান কর্মপদ্ধতিকে আমাদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত। আলোচনা দীর্ঘায়িত হচ্ছে, তবে কয়েকটি কথা গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ করুন।

ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন আসা-ভরসায় পানি ঢেলে দেওয়ার জন্য পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। পশ্চিম এশিয়া, মিসর, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো ও ইন্দোনেশিয়ার শাসকদের কর্মকাণ্ড এর জ্বলন্ত প্রমাণ। এমনিভাবে মধ্যএশিয়ার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম দেশগুলো; যেমন : উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্তান ও আজারবাইজানে স্থানীয় ইহুদি ও কমিউনিস্টদের সহায়তায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা চালানো হয়। ইসলামি বিশ্বের মুসলমান শক্তিগুলোকে স্তিমিত করে দিতে তারা মূলত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করে—

---

[১৭৮] গল্ডা মির (Golda Meir) পর দ্বিতীয় প্রভাবশালী ইয়াহুদি নেত্রী, যার ইয়াহুদি সেবার ইতিহাস নজিরবিহীন।

Scanned by CamScanner

১. Neutralization (প্রভাবহীন বানিয়ে দেওয়া।)

২. Containment (তাদের শক্তি ও সামর্থ্যকে দুর্বল বানিয়ে দেওয়া।)

৩. Marginalisation (তাদেরকে একঘরে করে ফেলা।)

তিনটি পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আলাদাভাবে একটি অধ্যায়ের প্রয়োজন হবে। এখানে শুধু তৃতীয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলো। Marginalisation-এর অর্থ হচ্ছে, কাউকে একঘরে করে তার বাকরোধ করা। কোনো জাতি বা দেশ যদি বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধমকি সত্ত্বেও ইসলামি চেতনাবোধ থেকে ফিরে না আসে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলামি জাগরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকে, তাহলে পশ্চিমারা তাদের অবরোধ করতে শুরু করে। এই অবরোধ প্রকাশ্য-গোপনে, সরাসরি বা কারও মাধ্যমে হয়ে থাকে। নিজেদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কখনো এই অবরোধ পশ্চিমা দেশগুলো একে একে নিজেদের দায়িত্বে করে থাকে অথবা তাদের পক্ষ হয়ে তাদের গুরু আমেরিকা ঘোষণা করে। আবার কখনো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ থেকে অবরোধ ঘোষণা করা হয়। যার মৌলিক উদ্দেশ্য হয়, সামাজিকভাবে অচ্ছুত বানিয়ে রাখার মাধ্যমে ওই জাতির জীবন অতিষ্ট করে তোলা।

ইসলামি জীবনীশক্তিতে শক্তিশালী আফগানিস্তানের তালেবান প্রশাসন যাদের মধ্যে আফগানিস্তানকে পরিপূর্ণ ইসলামি অবস্থানে নিয়ে আসার সামর্থ্য ছিল, তারা কীভাবে আমেরিকার এই অবরোধের মুখোমুখি হয়েছিল। যতদিন নাজিবুল্লাহর সরকার ছিল আমেরিকা তাদের সহযোগিতা করতে তৎপর ছিল। যখন আর সে রইল না, তখন পশ্চিমাদের চেষ্টা ছিল তালেবানদের একঘরে করে এমন লোকদের শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে আনা, যাদের সচেতনতার সাথে রাজনৈতিক কূটকৌশল পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অতঃপর যখন তালিবানরা ক্ষমতায় চলে এসেছে, তখন তাদের কীভাবে একঘরে করা হয়েছে? বর্তমানে আফগানিস্তানে যা কিছু হচ্ছে তার সারকথা হচ্ছে— আমেরিকা চায়, যে কেউ আফগানিস্তানে ক্ষমতায় চলে আসুক, তবুও তালেবানরা যেন ক্ষমতায় না থাকতে পারে। ঠিক একই ধরনের আচরণ সুদানের সাথেও করা হচ্ছে।

ইসলামি বিপ্লবের পূর্বে সুদানকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করা হতো। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং তাদের শাখা দেশের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের দাতব্য কাজ পরিচালনা করতো। বিভিন্ন পশ্চিমা সংস্থা নিজেদের

Scanned by CamScanner

তত্ত্বাবধানেও ত্রাণ প্রদান করতো। কিন্তু ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হলে এসব সংস্থা ও সংগঠন নিজেদের সরিয়ে নেয়। সব ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ সুদানের ওপর অবরোধ আরোপ করতে শুরু করে। বিশ্বব্যাংকের ঋণের ক্ষেত্রে সুদের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আই.এম.এফ সুদানের সদস্যপদ স্থগিত করে। এমনকি বিভিন্ন পশ্চিমা রাষ্ট্র ধনাঢ্য আরব রাষ্ট্রগুলোকে চাপ দিচ্ছিল, যেন তারাও সুদানের ওপর অবরোধ আরোপ করে। যার ফলে অত্যন্ত ধনাঢ্য একটি রাষ্ট্র সেই স্পর্শকাতর সময়ে সুদান ও আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সহযোগিতা করা বন্ধ করে।

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির বাইরে আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে যাকে 'অ্যাগ্রেসিভ নিউট্রালাইজেইশন' (Aggressive Neutralization) অর্থাৎ, অস্বাভাবিকভাবে সরাসরি হামলার মাধ্যমে কোনো ইসলামি শক্তি বা ইসলামি রাষ্ট্রের এমন শক্তিকে নষ্ট করে দেওয়া, যার মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে যেকোনো সময় প্রত্যক্ষ বা প্ররোক্ষভাবে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সামর্থ্য রাখে। এ ধরনের একটি চেষ্টা ১৯৯২ সালে তাজিকিস্তানের ইসলামি বিপ্লবের সময় করা হয়েছিল।

তাজিকিস্তানের 'হিজবুন নাহদা' ইসলামি আইন বাস্তবায়নের দাবিতে কমলেশ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিল। কিন্তু ইহুদি ও কম্যুনিস্টরা মিলে কেজিবির[১৭৯] সহায়তায় শুধু মুসলমানদের ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলমানদের গণহত্যা শুরু করে। এতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয় এবং লক্ষাধিক মানুষ আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

বর্তমানে ইসলামি বিশ্বের কাছে উন্নত যাবতীয় সরঞ্জাম ও সামর্থ্য বিদ্যমান রয়েছে। 'জিওপলিটিক্স' (Geopolitics)-এর ভিত্তিতে মহান আল্লাহ মুসলমানদের এমন প্রাকৃতিক সম্পদ দান করেছেন, যার কারণে যেকোনো শক্তি তাদের অনুগত হতে বাধ্য। হয়তো মুসলিম উম্মাহকে যে নির্বাচিত বলা হয়, তার অর্থ এটাই। পরকালে তারা যেসব নিআমাতপ্রাপ্ত হবে, তা ইনশাল্লাহ আরও বেশি হবে। 'জিওপলিটিক্স'-এর দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

- আল্লাহ তাআলা এই উম্মাতকে এবং তাঁর পবিত্র স্থানসমূহকে পৃথিবীর সবচে মধ্যমপন্থী অঞ্চলগুলোতে তৈরি করেছেন। এই অঞ্চলকে 'উষ্ণ

[১৭৯] রাশিয়ার আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার নাম। -*সম্পাদক*

Scanned by CamScanner

পানির অঞ্চল' তথা 'ওয়ার্ম ওয়াটার বেল্ট' (Warm Water Belt)-ও বলা হয়।

- পৃথিবীর প্রায় সকল জলীয়প্রবাহ এ অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করে।
- মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এই অঞ্চলে অতিমাত্রায় বিদ্যমান।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানেও এই অঞ্চল ভরপুর। আর তাই হয়তো এ অঞ্চলে সবচে বেশি নবি-রাসুল এসেছিলেন এবং সত্য-মিথ্যার অধিকাংশ যুদ্ধক্ষেত্রগুলোও এই অঞ্চলে অবস্থিত।

কথা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। মূল লক্ষ্যে ফিরে আসা যাক। পশ্চিমারা ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক যুদ্ধ পরিচালনা করছে, যাকে এককথায় জীবন-মৃত্যুর লড়াইও বলা যায়। তারা আমাদের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আত্মসাৎ করতে চায়। কিন্তু আমরা বিশ্বাস রাখি—ইমানদাররাই এই যুদ্ধে বিজয়ী হবে। ইসলাম এবং পশ্চিমাদের এ দ্বন্ধ ইনশাআল্লাহ সত্যের বিজয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে। পশ্চিমাদের সহায়তায় ইহুদিরা যতই অত্যাচার করুক আর ইহুদিদের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ থেকে পবিত্র ভূমির সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার নির্যাতন মুসলমানরা যতই সহ্য করুক; দাজ্জালের আনুগত্যের হিসাব ইহুদিদের এখানেই দিতে হবে। সর্বশেষ আদালতের আগে আল কুদুসের পবিত্র ভূমিতে একটি আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে পাথর ও গাছের পেছনে থেকেও খুঁজে খুঁজে প্রতিটি ইহুদিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। আর এটাই নিশ্চিত সত্য। চিন্তার বিষয় তো ওই মুসলমানদের নিয়ে, যারা সত্য-মিথ্যার এ যুদ্ধেও দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। ফিলিস্তিনিদের আত্মত্যাগ দেখেও সেই কথা ভাবছে না যে, আল কুদুস রক্ষার এ যুদ্ধ পৃথিবীর সকল মুসলমানের ওপর ফরজে কিফায়া। নিজেকে মুসলমান দাবি করেও যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিসের সাথে নিজের সম্পর্ককে অস্বীকার করবে, তার উপর অবশ্যই ইহুদি ও ইহুদিদের দোসরদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি বর্ষিত হবে।

Scanned by CamScanner

শেষ পর্যন্ত ওই কিয়ামাতের পূর্ভাবাস লক্ষ করা যাচ্ছে, যা ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে শামে[১৮০] দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।[১৮১] ওই কিয়ামাতের উৎপত্তি মূলত আজ থেকে ৯০ বছর পূর্বে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ওই সময়ে হয়েছিল যখন তুরস্কে 'ট্রিটি অব ভার্সাই' (Treaty of Versailles)-এর অধীনে খিলাফাতে উসমানির সমাপ্তি ঘোষণা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল[১৮২] এবং খিলাফাতের অধীনস্থ সম্পূর্ণ অঞ্চলে জাতিসংঘের নজরদারির ঘোষণা করা হয়। সেদিন থেকে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উম্মাতে মুসলিমার উপর তিনটি বড় বিপদ এসেছিল। যেখানে মূলত প্রথমটি দ্বিতীয়টির পটভূমি তৈরি করেছিল। প্রথম কোনো বড় বিপদে মুসলিম জাতির কর্ণধারদের অবহেলার সুযোগেই দ্বিতীয় বড় বিপত্তি ধেয়ে আসত।

- প্রথম বড় বিপদ এভাবে সংঘটিত হয়েছিল যে, ইহুদিরা খিলাফাত শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারত। তারা এ কথা জানত—খিলাফাত শাসনব্যবস্থাই পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখার নিশ্চয়তা দেয়। অথচ তারা পুলিশের সহায়তায় দাজ্জালের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। তাই তারা প্রথমে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় এ কথা নিশ্চিত করতে চাইল, 'পৃথিবীর কোনো স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র যেন উসমানি খলিফাদের আশ্রয় না দেয় এবং খিলাফাত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা রাখার কোনো সহযোগিতা না করে।'

---

[১৮০] সিরিয়া।

[১৮১] অতীতে সিরিয়া বলতে বর্তমান সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ফিলিস্তিনকে বোঝানো হতো। ইতিহাসে বা হাদিসে যখন 'শাম' সম্পর্কে কোনো কিছু বর্ণনা করা হয় সেখানে এই চারটি এলাকাই উদ্দেশ্য হয়। ইসরাইলের উন্মাদ জায়নবাদী প্রশাসনও এই সম্পূর্ণ অঞ্চলকে নিজেদের পৈতৃক অধিকার বলে মনে করে। সিরিয়া ও জর্ডানের আরামপ্রিয় শাসকেরা জাতীয় প্রেরণা ও আত্মমর্যাদাবোধের নিজেদের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে যতই তাদের সেবা করুক; তাদের মনে রাখা উচিত, ইয়াহুদি পত্নী ঘরে রেখে অর্ধেক ইয়াহুদি; অর্থাৎ, খ্রিষ্টান বংশধর জন্ম দেওয়ার সক্ষমতা তাদের বেশি দিন থাকবে না। অচিরেই জায়নবাদী অপশক্তির রক্তচক্ষু তাদের দিকেই তাকাবে।

[১৮২] গণতন্ত্রের অবৈধতার আরেকটি প্রমাণ এটিও যে, খিলাফাতব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

Scanned by CamScanner

উসমানি খলিফার ইচ্ছা ছিল, যদি কোনো ইসলামি রাষ্ট্র তাঁদের আশ্রয় না দেয়, শেষ পর্যন্ত তিনি হারামাইন শরিফাইনে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু প্রথমে ব্রিটেনের এজেন্ট শরিফ হুসাইন ও পরবর্তীতে আবদুল আজিজ বিন আলে সাউদ তাঁকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। কেননা, এতে করে উসমানি খিলাফাতকে হারামাইন শরিফাইনের খেদমত থেকে বঞ্চিত করে আলে সাউদকে এর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য আলে সাউদ ও ব্রিটেনের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তা লঙ্ঘিত হতো।

খিলাফাতে উসমানিয়াকে পুনর্জীবিত করা যখন কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না, তখন মুসলমানদের একটি দল চেয়েছিল কোনোভাবে অন্য কোথাও খিলাফাতব্যবস্থা চালু করা।[১৮৩] কিন্তু 'ইন্টারন্যাশনাল জায়নিস্ট প্লান'-এর বুদ্ধিজীবীরা খিলাফাত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তাঁদের সকল কৌশলকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। আর এর ধারাবাহিকতা আজ[১৮৪] পর্যন্ত বাকি রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে আরব-আজমের উলামায়ে কিরাম চেয়েছিলেন, কোনোভাবে যেন একটি খিলাফাতসমৃদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করা যায়। যেখানে পৃথিবীর সকল মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হবে। যা মূলত তিনজন ব্যক্তির অপচেষ্টায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তাদের মধ্যে দুজন বাহ্যিকভাবে ইতিবাচক আচরণ করলেও তৃতীয়জন স্পষ্টভাবে নেতিবাচক আচরণ করেন। তাদের মধ্যে শরিফ হুসাইন এবং আগা খান তৃতীয় খিলাফাত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী থাকলেও তারা সেখানে নিজেদের নেতৃত্বের আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে বাদশাহ আবদুল আজিজ স্পষ্টতই খিলাফাত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিলেন। তার দৃষ্টিকোণ থেকে খিলাফাতের কখনো প্রয়োজন নেই।

ফ্রি মিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের নেতিবাচক আচরণে শেষ পর্যন্ত খিলাফাত-সমৃদ্ধ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। নেতিবাচক ভূমিকা রাখা এই তিনজনের মধ্যে শরিফ হুসাইনের সন্তানরা 'আল মামলাকাতুল হাশিমিয়া আল উরদুনিয়া'র নেতৃত্ব এবং শাহ আবদুল আজিজের সন্তানরা 'খাদিমুল হারামাইন

---

[১৮৩] ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সর্বশেষ উসমানি খলিফার ইনতেকাল হয়েছিল। আর উসমানি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটেছিল ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে। এর মধ্যে ১৫ বছরে জায়নবাদীদের ফ্রি মিশন এবং মুসলমানদের খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠা আন্দোলনের চরম যুদ্ধ চলছিল।

[১৮৪] আফগানিস্তানে তালেবানদের শাসন পতন পর্যন্ত।

Scanned by CamScanner

শরিফাইন'র উপাধি ভোগ করে। আর তৃতীয়জন আগা খান গতকাল পর্যন্ত 'ইমামে জামান' থাকলেও আজ থেকে ঈশ্বরের অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করছেন।

- মুসলিম উম্মাহের উপর দ্বিতীয় কিয়ামাত তখন আবির্ভূত হয়, যখন ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে ১৪ মে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে 'ইসরাইল' নামের বিষাক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বুকে ইসরাইল আবার তা-ও ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে মূলত পৃথিবীর বুকে ইবলিশ ও দাজ্জালের নেতৃত্বাধীন সাময়িক নয়; বরং বাস্তবিক সরকার ছিল। এটি মূলত কোনো ভূখণ্ডে কাউকে আশ্রয় দেওয়া নয়; ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলিদের পুনর্বাসনও নয়; বরং পৃথিবীতে আল্লাহর মনোনীত শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পর ইবলিসি শাসনব্যবস্থার আবির্ভাব ছিল।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দাজ্জাল ও ইবলিশের সমন্বিত শাসনব্যবস্থা ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পর আজ পর্যন্ত মুসলমান রাষ্ট্রসমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ইবলিশ ও দাজ্জালের শাসনব্যবস্থা ইসরাইলকে সহযোগিতাকারী দেশ।

২. ইবলিশ ও দাজ্জালের শাসনব্যবস্থা ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পর তাকে সমর্থনকারী।

৩. ইবলিশ ও দাজ্জালের শাসনব্যবস্থা ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পর তাকে গোপনে সমর্থন দানকারী।

৪. ইবলিশ ও দাজ্জালের শাসনব্যবস্থা ইসরাইলকে গোপনে-প্রকাশ্যে কোনোভাবেই সমর্থন না দেওয়া দেশ। অথবা একবার সমর্থন দেওয়ার পর সমর্থন উঠিয়ে নেওয়া দেশ। এই চতুর্থ প্রকারের দেশের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এবং এরাই প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ ও রাসুলের বিরোধিতা করা থেকে বেঁচে আছে।

ইবলিশ ও দাজ্জালের এ সমন্বিত প্রশাসন ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুল মাকদিস' দখল করে নেয় এবং তখন থেকে 'বায়তুল মাকদিস' ও 'কুব্বাতুস সাখরা'র উপর কার্যত তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। আর এটি ছিল তৃতীয় বড় বিপদের পটভূমি; যা থেকে এই উম্মাত সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

- উম্মাতে মুসলিমার উপর তৃতীয় কিয়ামাত তথা বড় বিপত্তি আবির্ভূত হয়েছিল ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে যখন হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর পবিত্র ভূমি

Scanned by CamScanner

মদিনা মুনাওয়ারার একটি অংশে কার্যত ইহুদি শক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ার অসংখ্য সৈন্য 'জাজিরাতুল আরবে' অবস্থান গ্রহণ করে। বাস্তবে রাসুল ﷺ-এর ইনতেকালের পর মুসলমানদের উপর আসা বিপদগুলোর মধ্যে সবচে বড় বিপদ ছিল এটি। ইহুদি-নাসারাদের এখানে অবস্থানের অনুমতি দিয়ে আল্লাহর রাসুল ﷺ যে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, হজরত উমর রা. যে প্রতিশ্রুতিকে আরও অগ্রগামী করেছিলেন; যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এই উম্মাতের জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত আবশ্যক ছিল—তা লঙ্ঘন করা হয়। আর যতদিন পর্যন্ত এ প্রতিশ্রুতি অরক্ষিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা গাদ্দার এবং ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসেবে বিবেচিত হব। সেই প্রতিশ্রুতির একটি অংশ ছিল—'ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের তোমরা জাজিরাতুল আরব থেকে বহিষ্কার করো।'

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে স্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে তাদের আরবভূমিতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। আজ যখন ফিলিস্তিন এবং লেবাননে দাজ্জালের সহযোদ্ধারা মুসলমানদের উপর জঘন্য অত্যাচার চালাচ্ছে,[১৮৫] নিজেদের পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে কার্যত ইসলামের একটি বিধানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যে ঘোষণার আওতায় উপরোক্ত হাদিস বা এমন যেকোনো হাদিস; যেখানে ইহুদি ও নাসারাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়েছে—সাউদি আরবের শিক্ষা সিলেবাস থেকে মুছে দেওয়া হয়।

যখন কুয়েত দখলের মানসে এসব সৈন্য বাস্তবিক অর্থে সাউদি আরবে প্রবেশ করে, তখন নিজের অসহায়ত্ব ঢাকতে সাউদি সরকার একে 'নিজেদের সাহায্য করার আহ্বানে সাড়া দেওয়া' বলে প্রকাশ করে। এরচেও ভয়াবহ অবস্থা ছিল এই যে, তৎকালীন সময়ে বা বর্তমানেও একদল উলামায়ে সু কুরআন-হাদিস, ইজমা-কিয়াস খুঁজে ইহুদি ও নাসারাদের আরব ভূমিতে অবস্থানের স্বপক্ষে দলিল সরবরাহ করতে থাকে। হয়তো এভাবেই নিজেদের ধারণামতে তারা হারামাইনের নিরাপত্তাকে আরও বৃদ্ধি করে চলছেন!!

আমাদের অজ্ঞতা এবং বোকামি এটাই যে, ইসরাইল যখন পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে লড়াই করে, আমরা তাকে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক যুদ্ধ বলে বিবেচনা করি। অথচ মূলত সেটা আঞ্চলিক যুদ্ধ নয়; বরং ইমান-আকিদা ও আদর্শের

---

[১৮৫] অথচ তাদের দায়িত্ব ছিল এ অত্যাচারের প্রতিরোধ করা।

Scanned by CamScanner

যুদ্ধ। এটাই দাজ্জালের যুদ্ধ যেখান থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা 'আর্মেগেডন'-এর উৎপত্তি হবে। এটি ইবলিশের অনুসারীদের দাজ্জালের আবির্ভাবের তীব্র আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। ওরা সবাই মিলে ইবলিশের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে চায়; কিন্তু উম্মাতে মুসলিমাহর উচিত মহান আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়ন করা। এটাই আমাদের সাথে মহান আল্লাহর ওই প্রতিশ্রুতি, যার বিনিময়ে আমাদেরকে নির্বাচিত উম্মাত উপাধি দেওয়া হয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতির অর্থ ছিল পৃথিবীর বুকে মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। যতদিন পর্যন্ত এ কাজে লিপ্ত থাকবে, ততদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য বহন করবে। আর যখনই এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকবে, সম্মানজনক এই পদ থেকেও তাদের বহিষ্কার করা হবে। অতঃপর তাদের নিয়তিতে সেই লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা জুড়ে দেওয়া হবে, যা এতদিন পর্যন্ত ইহুদিদের নিয়তি ছিল।

আরবের ধনাঢ্য শাসনকর্তা হোক বা আজমের ভীতসন্ত্রস্ত শাসনকর্তা হোক; ইসরাইলের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উপর এ নির্যাতনের ব্যাপারে যদি তারা মুখ না খুলেন, তাহলে অচিরেই হয়তো তাদের ওপর চতুর্থ মহাবিপদ চলে আসবে। যা হয়তো সত্য-মিথ্যার ফয়সালাকারী হবে এবং পৃথিবীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ যেসব স্বার্থ তারা ভোগ করেছিল, তাও তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যে বিপদ থেকে হয়তো ওরাই নিস্তার পাবে, যারা ফিলিস্তিনের মুসলমানদের বিপদকে নিজের বিপদ, কষ্টকে নিজের কষ্ট, তাদের দুঃখকে নিজেদের দুঃখ বলে বিবেচনা করে। পৃথিবীবাসী বিশ্বাস করুক বা না করুক, বাস্তবে জয় নিরীহ ফিলিস্তিনিদেরই হবে, যারা দাজ্জালি ট্যাংকের বিপরীতে দাউদি পাথর নিয়ে লড়ে যাচ্ছে। এটি মূলত ইমানদারদের জন্য একটি পরীক্ষা যে, তারা নিজেদের কর্মপদ্ধতি কোন্ দিকে নিবিষ্ট করে।

Scanned by CamScanner

# অত্যাচারীদের কে বোঝাবে?

স্কুলফেরত ছেলেটির মন সর্বদা একটি স্থানেই নিবন্ধ থাকত। স্কুলব্যাগ রেখে কোনোমতে খেয়ে সামান্য বিশ্রাম করে কাঁচি নিয়ে ঘরের পেছনে চলে যেত; যেখানে পৃথিবীতে তার একমাত্র কাঙ্ক্ষিত স্থান বিদ্যমান ছিল। সে ছোট বাগানে কয়েক ধরনের গাছের সমারোহ করে রেখেছিল। তার সর্বোচ্চ চেষ্টা ছিল এই অঞ্চলে পাওয়া যাওয়া সবকটি গাছ যেন তার বাগানে বিদ্যমান থাকে। যার কিছু সে বিভিন্ন নার্সারি থেকে ক্রয় করেছিল এবং অন্যকিছু তার বন্ধুদের কাছ থেকে গাছের বিনিময়ে গাছ হিসেবে সংগ্রহ করেছিল। যদিও পিতা-মাতাকে রাজি করাতে তার অনেক কষ্ট করতে হতো।

এই বাগানই ছিল তার জন্য পৃথিবী। দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তবর্তী সোনালি উর্বরা এই বাগানটি ফুলে-ফলে ভরে ছিল। সুন্দর রুচি ও উৎকৃষ্ট বিন্যাসের এই বাগানটির সৌন্দর্য দেখে যে কেউ 'হিশাম আল আদাওয়ি' নামের এই বাচ্চাটির প্রশংসা না করে পারত না। তার পিতা-মাতা এবং শিক্ষকরাও তাকে উৎসাহিত এবং তার এই কাজে বাধা প্রদান করতো না। ...কিন্তু একদিন ওই রক্তাক্ত দিন চলে এল, যেদিন এই নিষ্পাপ শিশুটিও কাচির পরিবর্তে বন্দুক হাতে উঠিয়ে নেয় এবং বাগানে পানি সেচের পরিবর্তে অগুন নিয়ে খেলতে শুরু করে।

একদিন হিশাম অসুস্থতার কারণে স্কুলে যেতে পারেনি। পরবর্তী দিন জ্বরের তীব্রতায় সে বিছানা থেকে উঠতে পারছিল না। বাগান থেকে একবার দেখে আসার তার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছিল; কিন্তু তীব্র ব্যথার কারণে অনেক চেষ্টা করেও সে যেতে পারেনি। তার দুঃখ ছিল যে, হয়তো গাছেরা তার অপেক্ষা করছে, ফুলেরা তার কানে কানে কথা বলতে আগ্রহী, ফুলের কলিরা তার জন্য চিন্তিত।

Scanned by CamScanner

পিতা তার চিন্তামগ্ন অবস্থা দেখে ব্যথিত হচ্ছিলেন। তিনি তার কাস্তে হাতে নিলেন এবং বললেন, 'তোমার পরিবর্তে আমি তোমার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করে আসছি।' নিজের কাস্তে পিতার হাতে দেখে হিশাম কিছুটা স্বস্তিবোধ করল। চোখ বন্ধ করে সে মাথা রেখে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করল; কিন্তু হয়তো সে ভাবতে পারেনি; এটা ছিল তার স্বস্তির শেষ নিদ্রা।

আজকের পর যদি তার নিদ্রা আসেও, তবুও তা হবে অগ্নিশিখাবেষ্টিত। ফুলের সুগন্ধের পরিবর্তে বারুদ ও রক্তের গন্ধই তার প্রিয় হয়ে উঠবে। ঘুমানোর পরিবর্তে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের জাগিয়ে দেবে, যা তাদের এক নতুন পথের দিশা দেবে। ফুলগাছ উৎপন্ন করার পরিবর্তে সে দেশ তো ধর্মের রক্ষায় নিজের সকাল-বিকেল ব্যয় করবে।

হিশামের অসুস্থতার পূর্বেই সীমান্তের অবস্থা খারাপ ছিল। মাঝে মাঝে হামলার সংবাদ আসত। কখনো কখনো মানুষেরা বিস্ফোরণের শব্দও শুনতে পেত। ধীরে ধীরে অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে শুরু করে এবং শহরবাসীর মুখে মুখে ইসরাইলি সৈন্যদের আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

যখন তার পিতা কাস্তে নিয়ে বাগানে যাচ্ছিল, তখন তার মা রান্নাঘরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তার পিতা বাগানে যাওয়ামাত্রই জোরেশোরে বিস্ফোরণের পাশাপাশি লাগাতার গুলির শব্দ শোনা গেল।

প্রথম বিস্ফোরণের তীব্রতা এত ছিল যে, মনে হচ্ছিল তাদের ঘর উড়িয়ে নেবে। হিশাম লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বাগানের দিকে দৌড়ে গেল। তার পিতা রক্তাক্ত অবস্থায় একটি গাছের পাশে পড়ে ছিলেন। তার হাত থেকে কাস্তে পড়ে যায় এবং তিনি ইসরাইলে সৈন্যদের গোলার আঘাতে মৃত্যু পথযাত্রী ছিলেন। হিশামের মা তার মাথা উঠিয়ে কোলে নিলেন এবং হিশাম বাবার পায়ের দিকে বসে গেল। পৃথিবীটা তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। গোলার বিস্ফোরণে শুধু তার বাগানই নয়, তার বাবাও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল। তার ভয়ানক মৃত্যু হিশামের মস্তিষ্কে এক ভয়াবহ ছাপ ফেলে যায়। শেষবারে তিনি চোখ খুলে হিশামের কাস্তের দিকে তাকিয়ে শুধু এতটাই বলেছিলেন, 'বৎস, আমি তোমার আগ্রহ পূর্ণ করতে বিন্দুপরিমাণ ত্রুটি করিনি; তুমি আমার প্রতিশোধ নিতে ত্রুটি করো না।'

Scanned by CamScanner

হিশাম নামের সেই ছোট্ট শিশুটি একদিনেই কয়েক বছর বড় হয়ে গেল। প্রতিশোধস্পৃহায় সে আশেপাশের সবকিছু ভুলে যেতে থাকে। তার মস্তিষ্কে শুধু একটি গুঞ্জনই ছিল—প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!!

প্রতিটি ওই ফুলের প্রতিশোধ—যাকে বসন্তকালে মুচড়ে দেওয়া হয়েছিল।

এমন ফুলকলির প্রতিশোধ—যাদের ফোটার পূর্বেই নিষ্পেষিত করা হয়েছিল।

এমন সম্মানিত বৃদ্ধদের প্রতিশোধ—যাদের মৃত্যুর পূর্বে অসহায় চোখে শুধু প্রতিশোধের তীব্রতা ছিল।

ওই মা-বোনের প্রতিশোধ—যাদের লাঞ্ছিত করা হয়েছিল।

শিশু বৃদ্ধ ও মহিলাদের প্রতিশোধ—যারা জায়নবাদীদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছিল।

ওই বৃদ্ধ হাতের প্রতিশোধ—মৃত্যুর পূর্বেও নিজেদের প্রিয় সন্তানের জন্য কাস্তে হাতে নিয়েছিল।

সেদিন থেকেই হিশাম প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে বাঁচতে থাকে। সেদিন সে ভাবল—

যদি আমার দেশের যুবকেরা প্রতিরোধযুদ্ধের জন্য রক্ত দেওয়া-নেওয়ার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হই, তাহলে—

সুন্দর ফুলের বাগানগুলো এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

সম্মানিত বৃদ্ধরা অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করবে।

ঘর ধ্বংস হয়ে কবরস্থান পরিপূর্ণ হতে থাকবে।

স্বাধীনতা ধ্বংস হবে, সম্মান লুণ্ঠিত হবে।

জায়নবাদী সন্ত্রাসীরা হিংস্র পশুর ন্যায় আত্মপ্রকাশ করবে।

বুশেরা ওদের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদের চালান পাঠাবে।

কন্ডোলিজা রাইসরা আমাদের নিরস্ত্রীকরণের দাবি জানাবে।

বিশ্বনেতৃত্ব ইসরাইলকে অস্ত্র পরিচালনার অনুমতি দেবে এবং আমাদের সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত করবে।

আমরা কি এমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হতে পারি না; যা পরিপূর্ণ প্রতিশোধ না নিয়ে স্তিমিত হবে না?

Scanned by CamScanner

সেদিনও ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরেকজন মুজাহিদ তৈরি হয়। আর এটা আমার বিশ্বাস, ফিলিস্তিন ও লেবাননের যেই বাড়িতে ইসরাইলের একটি গোলা নিপতিত হয়, সেখান থেকেই একজন হিশাম আল আদাওয়ি তৈরি হয়।

নিষ্পাপ শিশুরা কাস্তে রেখে ক্লাশিনকোভ হাতে তুলে নেয়। ফুলগাছে পানি দেওয়ার পরিবর্তে আগুন নিয়ে খেলতে শিখে যায়।

বিশ্বনেতৃত্বকে কে বোঝাবে—কেন সন্ত্রাসবাদ তৈরি হয়?

এই সন্ত্রাসবাদ ওই লোকদের মধ্যে তৈরি হয়, যাদের কেউ এভাবে নির্যাতিত হয়েছিল।

এসব তেমনই গোলাবারুদ থেকে তৈরি হয়, যেগুলো কোনো নিষ্পাপ ভালোবাসাকে ধ্বংস করেছিল।

যদি তোমরা নিরাপত্তা চাও, তাহলে অত্যাচারীদের থামাও।

কারও ভালোবাসাকে হত্যা করো না।

কারও স্বাধীনতা ধ্বংস করো না, কারও ইজ্জত নিয়ে খেলো না।

সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এবং সম্মানিত স্থানসমূহের ইজ্জত নষ্ট করো না।

তোমরা সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী বলে চিৎকার করবে আর একের পর এক নামকরা সন্ত্রাসী জন্ম নেবে।

জারকাবি, শামিল, দাদুল্লাহ এবং আদাওয়িরা জন্ম নেবে এবং আত্মমর্যাদার উপাখ্যান রেখে নিজেদের অমর করে রাখবে।

Scanned by CamScanner

# শেষ প্রত্যাবর্তন

## মুহতারাম মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

(আপনার ও *জরবে মুমিন* পরিবারের সুস্থতা কামনা করছি। মহান আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন।)

আমি আপনার পত্রিকা *কথ্যচিত্র* বিভাগের একজন নিয়মিত পাঠক। *ফিলিস্তিনের কান্না* ও *ফিলিস্তিনের একজন প্রেমিক* ধারাবাহিক পর্বগুলোর জন্য অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করি। বেশ কিছুদিন যাবৎ ধারাবাহিক আলোচনার নিয়মিত পর্ব প্রকাশিত না হওয়ায় অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তার অপেক্ষা করছিলাম। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ফিলিস্তিনভূমি-সংক্রান্ত নিবন্ধগুলোকে আলাদা পুস্তক আকারে প্রকাশ করার আপনাদের পরিকল্পনা আছে কি না? এ ছাড়াও আমার বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে, যে কারণে এ পত্র লেখা।

১. ইহুদিরা কীভাবে অনুধাবন করেছে যে, তারা এ পবিত্র ভূমির উত্তরসূরি?

২. ইহুদিরা হজরত মুসা আ.-এর ওপর অবতীর্ণ হওয়া তাওরাতে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও কীভাবে সুলায়মান আ.-এর মতো রাজত্ব কামনা করে? পৃথিবীব্যাপী এ ধরনের সাম্রাজ্যের ধারণা কীভাবে তাদের মধ্যে প্রোথিত হয়?

৩. ইহুদিদের বিশ্বাস মতে, তারাই হজরত ইসা আ.-কে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। বর্তমান খ্রিষ্টানবিশ্ব এ ব্যাপারে কোন্ মতবাদে বিশ্বাস রাখে? আমরা মুসলমানরা তো হজরত ইসা আ.-এর জীবিত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করি।

৪. দাজ্জালের পরিচয় কী এবং সর্বপ্রথম কোথায় আবির্ভূত হবে?

৫. আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের[১৮৬] 'স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি' (Special theory of relativity)-এর আলোচনায় বলেছেন যে, এ সূত্রের আবিষ্কার 'শবে মিরাজ'-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয়। আইনস্টাইনের বরাতে তিনি আরও বলেছেন, পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনো বস্তুর জন্য আলোর

[১৮৬] ধর্মীয় বিশ্বাসমতে ইয়াহুদি ধর্মের অনুসারী

Scanned by CamScanner

গতি তথা 'ভেলোসিটি অব লাইট' (Velocity of light)-এর চেয়ে অধিক গতিসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। অথচ আমাদের উলামায়ে কিরামের মতে, রাসুল ﷺ আলোর গতির চেয়ে দ্রুতগতিতে মিরাজে গমন করেছিলেন। এ রহস্যের সমাধান সম্পর্কে আপনার মতামত কাম্য।

ধন্যবাদান্তে,

**নুরুল ইসলাম।**

**উত্তর :** ১. এভাবে বলুন যে, দীর্ঘদিন ধরে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হওয়ার পরেও কীভাবে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনা জন্ম নেয় যে, তারা এই পবিত্র ভূমির উত্তরসূরি?

বাস্তবে মহান আল্লাহ এদের পূর্বসূরিদের এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করলেও তারা নিজেদের পাপকর্মের মাধ্যমে নোংরামিতে ভরিয়ে তোলে। যার শাস্তি হিসেবে ইরাকের তৎকালীন শাসনকর্তা বুখতেনাসারকে তাদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হয়। সে তাদেরকে পরাজিত করে দাসদাসীতে পরিণত করে ইরাকে নিয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর পরিপূর্ণরূপে অনুশোচনা ও তাওবা করার ফলশ্রুতিতে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে তাদেরকে মুক্ত করে এ অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অল্প কিছুকালের মধ্যেই সুদ, ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরিসহ যাবতীয় অন্যায় অভ্যাস তাদের মধ্যে পুনরায় বিস্তার লাভ করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা রাসুলগণ বারংবার তাদের সতর্কবাণী দিতে থাকলেও উন্মত্ত ষাঁড়ের ন্যায় তারা বেআদবি-অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে। শেষ পর্যন্ত হজরত ইসা আ.-এর আগমন হলে এ উগ্র সম্প্রদায় মর্যাদাবান এ নবিকে শুধু তাদের পাপ কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা পরবর্তীতে এ কাজের জন্য অনুশোচনার পরিবর্তে আনন্দ উদযাপনে লিপ্ত হয়। সীমালঙ্ঘনের চরমসীমায় পৌছলে হজরত ইসা আ.-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার পরবর্তী ৭০ বছর পর্যন্ত তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে চরম শাস্তিতে নিপতিত হয়। রোম সম্রাট টাইটিস তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। সুলায়মানি কাঠামোকে ধ্বংস করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তাদের এ অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করে। লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা নিজেদের নিয়তিতে নিশ্চিত করে তারা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে তারা দুই-দশক পূর্ণ জীবনযাপন

Scanned by CamScanner

করতে থাকে। অতঃপর খ্রিষ্টানরা ফিলিস্তিনে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। হজরত উমর রা.-এর যুগে মুসলমানরা বায়তুল মাকদিস বিজয় করেন। সেই সময় থেকে ফিলিস্তিনের অধিকার এবং মসজিদে আকসার কর্তৃত্ব মুসলমানদের অধিকারে রয়েছে। কিন্তু ইহুদিদের মস্তিষ্ক থেকে এ অঞ্চলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকারের মিথ্যা স্বপ্ন দূরীভূত হয়নি। নিজেদের পাপাচার থেকে তাওবা করার পরিবর্তে তারা তাদের বংশধরদের 'আগামী বছর জেরুসালেমে'র স্বপ্ন দেখাতে বিভোর। ইতোপূর্বে দুইবার এ অঞ্চল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর নিজেদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের অনুশোচনা ও তাওবার মাধ্যমে তারা এই অঞ্চলে পুনরায় এসেছিল। কিন্তু এবার নিজেদের পাপাচারের উপর অবিচল থেকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ অঞ্চলে অধিষ্ঠিত হয়েছে, যা মূলত এ অঞ্চলে তাদের শেষবারের প্রত্যাবর্তন। এবার তাদের নতুন করে কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না। উসমানি খিলাফাতের পতনের সুযোগে ইংরেজদের বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন দিয়ে তারা এ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। ধীরে ধীরে নিজেদের শক্তি ও অর্থের জোরে ফিলিস্তিনের নিরীহ মুসলমানদের নির্বাসিত করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদিদের এ অঞ্চলে এনে একত্রিত করে। অন্যায়-অবিচারের এ রক্তাক্ত উপাখ্যান ১৯১৭ সাল থেকে চলে আসছে। অত্যাচারের এ ধারাবাহিকতা যতদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুসলমানরা ফিলিস্তিনিদের পাশে তেমনিভাবে দাঁড়াবে না যেমনিভাবে পৃথিবীর তাবৎ ইহুদিরা ইসরাইলের পাশে দাঁড়িয়েছে।

আমরা ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছি যখন হাজার বছর পর অভিশপ্ত ইহুদিরা তাওবা করা ব্যতীত এ অঞ্চলে ফিরে এসেছে। তাই তারা এখন আর ফিরে যেতে পারবে না, এখনেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তারা এ অঞ্চলে চড়ামূল্যে জায়গা ক্রয় করতে থাকে। এভাবে জায়গা বিক্রি করার অবৈধতা সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম জনগণকে বোঝাতে থাকেন। এমনকি এ ব্যাপারে ভারতের হজরত আশরাফ আলি থানবি রাহ. থেকে ফাতওয়া চাওয়া হয়।[১৮৭] কিন্তু পার্থিব লালসার শিকার হয়ে স্থানীয় লোকেরা এ ফাতওয়ায় কর্ণপাত করেনি। যেমনটি বর্তমানে সাউদি আরবের তাবুক থেকে খায়বার পর্যন্ত অঞ্চলের ভূমিমালিকেরা এখন এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করছে না। ঠিক যেমনিভাবে পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের

---

[১৮৭] ইমদাদুল ফাতওয়া তৃতীয় খণ্ডের ৫৭ নং পৃষ্ঠায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

লোকেরা আগা খানের অনুসারীদের কাছে ভূমি বিক্রি করা থেকে বিরত থাকেনি।[১৮৮]

শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ ফিলিস্তিনভূমিকে স্থানীয় মুসলমান ও বহিরাগত ইহুদিদের মধ্যে অসম বণ্টনের বিরল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। যে প্রস্তাবনার পক্ষে শুধু তিনটি ভোট এসেছিল। শর্ত পূরণের জন্য ন্যূনতম আরও তিনটি ভোটের প্রয়োজন ছিল, যা ফিলিপাইন, হাইতি ও লাইবেরিয়ার মতো পশ্চাৎপদ দেশের উপর চাপ প্রয়োগ করে আদায় করে নেওয়া হয়। যে অসম বণ্টনের প্রস্তাবনায় ফিলিস্তিনের ৫৫ শতাংশ ভূ-ভাগ ৩৩ শতাংশ নাগরিক ইহুদিদের জন্য ধার্য করা হয়। আর বাকি ৪৫ শতাংশ জায়গা ৬৭ শতাংশ নাগরিক মুসলমানদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। অথচ তখন ফিলিস্তিনের মোট ভূখণ্ডের মাত্র ছয় শতাংশ জায়গা ইহুদিদের মালিকানায় ছিল। আর তাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার কোনোভাবেই ৩৩ শতাংশ ছিল না।

এই ছিল জাতিসংঘের ইনসাফ! আর এই ছিল ইহুদিদের জাতীয় নিবাস থেকে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সফর। এ জন্যই বলেছি যে, ইহুদিদের মতো ইহুদিদের দোসরদের পরিণামও অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। তাওবার পর প্রত্যাবর্তন করা ইহুদিদের যেখানে তাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা করা হয়নি সেখানে সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করে নির্মমতার প্রদর্শনীতে লিপ্ত ইহুদিদের কীভাবে ক্ষমা করা হবে।

যখন তারা এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমির মালিকানা লাভ করে তখন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা করে। যে রাষ্ট্রের ঘোষণা মূলত দাজ্জালের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর ছিল। কিন্তু এ সমস্যাকে ফিলিস্তিনি ও আরবদের সমস্যা হিসেবে অভিহিত করে পৃথিবীর মুসলমানরা এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করেনি। এভাবেই ইহুদিদের গোপন চক্রান্ত ও প্রকাশ্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। ধীরে ধীরে তারা ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুসালেম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যেখানে মসজিদে আকসা অবস্থিত এবং যার চত্বরে ওই পবিত্র পাথরটি রয়েছে, যার সাথে বেআদবি করায় তাদের অভিশপ্ত করা হয়েছিল। তাদের ধারণামতে, যে পাথরের নিচে *তাওরাতের* মূল কপি এবং বনি ইসরাইলের সেই শবাধার অবস্থিত; যেখানে বনি ইসরাইলের নবিদের দুর্লভ স্মারকচিহ্ন রয়েছে। যদি বাস্তবে সে স্মারকচিহ্নসমূহ সেখানে

---

[১৮৮] এখন বিরত হলেই বা আর কী।

Scanned by CamScanner

বিদ্যমান থাকেও, তবুও বাস্তবে মুসলমানরাই হবে এর উত্তরসূরি। কেননা, মুসলমানরাই সত্যিকারার্থে পূর্ববর্তী নবিগণের ওপর বিশ্বাস পোষণ করে এবং তাদের সম্মান করে। ইহুদিরা তাদের বংশের এই মর্যাদাবান নবিদের অবাধ্যতা ও তাদের সাথে বেআদবি করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করে তাদের হত্যা করে। যার ফলে বিভিন্ন নবি তাদের জন্য বদদুআ করেন। এরা আবার কীভাবে তাদের উত্তরসূরি হওয়ার দাবি করে?

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইসরাইলের ক্ষেত্রফল ছিল ৭৯৯৩ বর্গমাইল। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের যুদ্ধে যা ২৭ হাজার বর্গমাইল বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে জেরুসালেম দখল করার পর থেকে বারংবার মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করার নোংরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। নিরীহ ফিলিস্তিনিরা নিজেদের দেহের বর্মে পবিত্র এ মসজিদকে রক্ষা করে চলছে। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমানরা তাদের এই ত্যাগ সম্পর্কে বেখবর হয়ে খরগোশ-নিদ্রায় বিভোর। যদিও এ ব্যাপারে কারও ব্যথা অনুভব হয়, তখন সে এ আলোচনায় লিপ্ত হয় যে, মসজিদে আকসা বলতে নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থানকে বোঝানো হয় নাকি সম্পূর্ণ মসজিদ কম্পাউন্ডকে বোঝায়?

এখনতো ইসরাইলি আলিম ও জায়নবাদী ইসরাইলি মোল্লারা বায়তুল মাকদিসকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সংগ্রহ করা ডলার থেকে নিজেদের পারিতোষিক নেওয়ার পর ইহুদি পণ্ডিতদের দেওয়া সবক অনুযায়ী নতুন আলোচনা শুরু করছে। যে আলোচনায় নতুন বিতর্ক উত্থাপন করছে যে, ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি মুসলমানদের নাকি ওই ইহুদিদের, যাদের মহান আল্লাহ তিনবার সুযোগ দেওয়ার পর এই পবিত্র ভূমি থেকে চিরতরে বহিষ্কার করেছিলেন।

কখনো এ আলোচনা করা হয় এই পবিত্র ভূমি মূলত ইহুদিদের পৈতৃক ভূমি, যেখানে ইহুদিদের উপাসনালয় সুলায়মানি কাঠামো নির্মিত হয়েছিল। যার ফলে পবিত্র মসজিদে আকসা যা সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি অগণিত শহিদের রক্তের নজরানায় বিজয় করেছিলেন, তা উপঢৌকন হিসেবে ইহুদিদের দিয়ে দেওয়া উচিত। যেন কার্যত এ কথা দাবি করা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলামের জন্য জীবনবাজি রাখা বীরেরা বায়তুল মাকদিসের জন্য যা করেছিলেন তা ছিল নিতান্তই ভুল। ইসরাইলের ফাইভ স্টার হোটেলের মেহমানদারিতে ইহুদিদের প্ররোচনায় প্ররোচিত বিদ্বানদের ইহুদিঘেষা বক্তব্যগুলোই বাস্তব সত্য।

Scanned by CamScanner

এই দুঃখের আর কত বিবরণ শোনাব। মসজিদে আকসা ধ্বংস করার যত ধরনের পরিকল্পনা সম্ভব ছিল ইহুদিরা তার চেষ্টা করেছে। উন্মত্ত ইহুদিরা এই মসজিদকে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। মসজিদের চতুর্দিকে ২০ ফুট করে সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল। আকাশপথে মসজিদের ওপর বোমা বর্ষণের পরিকল্পনা করেছিল। ডিনামাইট দিয়ে মসজিদ উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। মুসলমানদের প্রবেশাধিকার সীমিত করে মসজিদের আশেপাশের যাবতীয় ভূমি ক্রয় করে উগ্রপন্থী ইহুদিদের নিবাস তৈরি করেছিল। তাদের বাসস্থান থেকে মসজিদের নিচ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ বানিয়ে প্রযুক্তির সহায়তায় কৃত্রিম ভূমিকম্প তৈরি করে মসজিদ বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তারা এ পর্যন্ত পরিকল্পনা করেছিল, কীভাবে মসজিদকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করা যায়, যেন তার চত্বরে অবস্থিত পাথর; যেটি মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল তা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। শুধু তাই নয়, এই মসজিদকে ধ্বংস করলে তার ধ্বংসস্তূপ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে এর হিসাবও তারা করে রেখেছে। সেই ধ্বংসস্তূপকে এখান থেকে দূরে নিয়ে যেতে কতটা সময় লাগবে, তা-ও তারা পরিকল্পনায় রেখেছে।

এই কথাগুলো রূপকথা মনে হবে। জর্জ বুশের বক্তৃতার রচয়িতা বিশিষ্ট মার্কিন লেখিকা 'গ্রেইস হ্যালসল' (Grace Halsell) ভ্রমণ শেষে স্বচক্ষে দেখা এসব বিবরণ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *ফোর্সিং গড'স হ্যান্ড (Forcing God's Hand)*-এ লিখেছেন। তিনি তার স্বচক্ষে দেখা এ বিবরণ দিয়েছেন যে, সেখানের ইহুদিরা বিশুদ্ধ রেশমের এমন পোশাক তৈরি করে রেখেছে, যা তাদের ধারণামতে মসজিদে আকসার স্থানে নির্মিত সুলায়মানি কাঠামো ও সম্মানিত পাথরের উপর নির্মিত দাজ্জালের কার্যালয়ে প্রথম সমাবেশে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতরা পরিধান করবে।

ব্রিটেনের সাম্রাজ্য থেকে দাউদ আ.-এর সিংহাসন এনে ইসরাইলের প্রতিস্থাপন করা দলটিও তাদের নিজস্ব পোশাক তৈরি করে রেখেছে। যেই পাথরের ওপর বসে তাদের ধারণামতে দাউদি বংশের শেষ শাসক 'কিং অব দ্য ওয়ার্ল্ড' মাসিহ দাজ্জাল 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে'র মাধ্যমে পৃথিবী শাসন করবে। তাদের বিবেকের প্রসংশা করতে হয় যে, তারা নিজেদের দাউদ আ.-এর বংশধর মনে করে; অথচ কর্মকাণ্ডে তারা শয়তানি শক্তির অধিকারী মানুষরূপী পশু। হজরত দাউদ আ.-এর মতো বরকতময় ব্যক্তিত্বের সাথে তাদের কী সম্পর্ক?

Scanned by CamScanner

কী লিখব আর কী দুঃখ করব! যেখানে সমগ্র পৃথিবী আজ ইহুদিদের পাশে দাঁড়িয়ে আর সকল ইহুদিরা ইসরাইলের সহযোগিতায় দাঁড়িয়ে, সেখানে উল্লেখযোগ্য কোনো মুসলিম শক্তি আজ ফিলিস্তিনিদের পাশে নেই। প্রথমে বলা হতো হামাস জঙ্গি সংগঠন, তারা ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নয়। কিন্তু যখন তারা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে, তখন তাদের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তাদের গৃহপালিত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাদের জন্য সকল পরিস্থিতি সংকীর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে। তাদের মন্ত্রী-এমপিদের অজ্ঞাত ইহুদিদের অপহরণের দায়ে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করা হচ্ছে; যা নিঃসন্দেহে অন্যায়-অবিচার।

অন্ধ শয়তান পৃথিবীবাসীর সামনে, কোটি কোটি আলোকিত মেধার মানুষের সামনে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু একটি চক্ষু এমন নেই যে ফিলিস্তিনের জন্য কান্না করবে। এমন একটি হৃদয় নেই, যা আল কুদুসের জন্য ব্যথিত হবে। এমন একটি হাত নেই, যা তাদের পাশে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসবে; বরং উল্টো তাদের জখমে লবণ ছিটানোর জন্য ওই ইসরাইলের স্বীকৃতি দেওয়ার আলোচনা করা হয়, যা মহান আল্লাহ ফেরেশতা ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কারও পছন্দ নয়। ফিলিস্তিনিদের ওপর অত্যাচারের নির্মমতার বাকি প্রয়াসটুকু ওইসব নামধারী ইসলামি গবেষকগণ করে যাচ্ছেন, যারা ফিলিস্তিনভূমির ওপর ইসরাইলের কর্তৃত্বের প্রমাণে নিবন্ধ লিখে যাচ্ছেন। যেসব নিবন্ধে ইহুদি পণ্ডিতদের সত্যায়ন নিয়ে নিজেদের ইমানের মূল্য নির্ধারণ করছেন।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদিদের লাঞ্ছনার এরচে বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে; যখন ফুটবল বিশ্বকাপে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন 'ঘানা'র মতো গরিব দেশের এক কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়কে ভাড়া করতে হয়েছিল। এই কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলারের দায়িত্ব ছিল—ইসরাইলের সুন্দরীদের একঝলকের বিনিময়ে বিশ্বকাপে ইসরাইলের পক্ষে পতাকা নিয়ে মাঠে নামা।

হায় মেরে মাওলা! পৃথিবীর সবচে ধনী সমাজব্যবস্থা ও সবচে মেধাবী দাবিদার এই হতভাগা জাতির জন্য আর কেউ এমন ছিল না যে, একজন কৃষ্ণাঙ্গ তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে।

ইহুদিদের পক্ষাবলম্বনকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে ওই লাঞ্ছনার অপেক্ষা করা উচিত, যা ইহুদিদের জন্য নির্ধারিত। চাই সে ইমান বিক্রিকারী আলিম হোক অথবা মেধা বিক্রিকারী বুদ্ধিজীবী অথবা দুনিয়ালোভী স্কলার অথবা ভোগবাদী

Scanned by CamScanner

সন্ত্রাসী। উলামায়ে কিরামের হত্যার শাস্তি ও পরকালের শাস্তি তো নিশ্চিত থাকবেই।

২. তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে তারা মনে করে, এ পৃথিবী শাসনের একমাত্র অধিকার তাদের; যেহেতু তারা আল্লাহর সন্তান এবং কোনো ভালো কাজ করা ব্যতীত তারা মহান আল্লাহর প্রিয়। অন্যদিকে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে তারা মানবরূপী পশু ও তাদের সেবক মনে করে। তাদের দুনিয়াবিলাসী পণ্ডিতেরা বংশীয় মর্যাদাকে উসকানি দিয়ে পাগলামির পর্যায়ে নিয়েছে। পরিশেষে হয়তো এই উন্মত্ততাই তাদের ডুবিয়ে দেবে।

৩. দুঃখের বিষয়, যেখানে তাবৎ খ্রিষ্টানবিশ্ব বিশ্বাস করে যে, ইহুদিরা হজরত ইসা আ.-কে অত্যন্ত নির্যাতন করে ক্রুশে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছিল। অতঃপর তার লাশ তিন দিন একটি কবরে প্রোথিত থাকলে মহান আল্লাহ তাঁর শরীরকে আকাশে উঠিয়ে নেন। এ ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে ইহুদিদের কর্তৃক হজরত ইসা আ.-এর সাথে বেআদবি ও খ্রিষ্টানদের কাপুরুষতার চিত্র ফুটে ওঠে। যেখানে তাদের নবির শত্রুরা তাদের জীবদ্দশায় নবিকেই হত্যা করতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে মুসলমানদের কারও শেষ নিঃশ্বাস বাকি থাকা পর্যন্ত তাঁদের নবির আশেপাশে কাউকে আসতে দেননি। শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আল্লাহর রাসুলের হেফাজতের এই উন্নত মূলনীতি খ্রিষ্টানদের বিবেক বুঝতে সক্ষম হয়নি।

কুরআনে কারিমের সত্য ভবিষ্যদ্‌বাণীমতে, ইহুদিরা হজরত ইসা আ.-কে হত্যা করার পূর্বেই মহান আল্লাহ তাকে আকাশে উঠিয়ে নেন। খ্রিষ্টানরা হজরত ইসা আ.-এর নিরাপত্তায় আত্মত্যাগ করতে আগ্রহী হয়নি। অন্যদিকে ইহুদিরাও তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। অথচ উহুদের যুদ্ধে অসহায় মুসলমানরা মানববর্ম তৈরি করে রাসুল ﷺ-কে শত্রুদের নাগাল থেকে বের করে এনেছিলেন। আর তাই মহান আল্লাহ ইহুদিদের ধ্বংস করার কাজ এই উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন করবেন।

কিয়ামাতের পূর্বে হজরত ইসা আ. দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করবেন। মুসলমানরা তার সাথে মিলে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং বীরত্বের এমন প্রদর্শনী করবে, যা তাদের পূর্বপুরুষরা রাসুল ﷺ-এর পাশে থেকে করেছিল। তারা হজরত ইসা আ.-এর ডানে-বামে, সামনে-পিছনে প্রতিটি দিকেই নিজেদের বীরত্বগাথা রচনা করবেন। নিজেদের শরীরকে বর্ম বানিয়ে

Scanned by CamScanner

সকল অস্ত্রের আঘাতে নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করে হজরত ইসা আ.-এর হেফাজত করবেন, যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষরা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর করেছিলেন। যে ধারাবাহিকতা বদর-উহুদে রাসুল ﷺ-এর সাহাবিরা শুরু করেছিলেন এবং বর্তমান পর্যন্তকার বীরপুরুষেরা তা বহাল রেখেছে। হজরত ইসা আ.-এর পুনরাগমনের পর যেসব খ্রিষ্টান তাকে অস্বীকার করবে, যাদের নেতৃত্বে থাকবে বড় শয়তান তথা কানা দাজ্জাল; তাদের হত্যা করবেন। বর্তমানে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ওপর নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালানো ইহুদিরা সেদিন তেলআবিব ও হাইফার রাস্তায় সমুদ্রের মরা মাছের ন্যায় মরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে।

৪. এ ব্যাপারে প্রারম্ভিক কিছু আলোচনা করা হয়েছে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনা অন্য পুস্তকে করার ইচ্ছা রয়েছে।

৫. শুধু আইনস্টাইন নয়; আরও বেশ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ইহুদি ছিলেন। ইহুদিরা বিজ্ঞান বিশেষ করে জেনেটিক সায়েন্স নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৫৮ জন ইহুদি নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তানি মুসলমানদের ক্রিকেটের রেকর্ড এবং ভারতীয় মুসলমানদের বলিউডের গান-বাজনা থেকে অবসর মিলছে না।

অবশ্য মিরাজের ঘটনা কোনো রহস্য নয়; এটি একটি মুজিজা তথা অলৌকিক কাণ্ড। মুজিজা বলা হয় আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসুলের এমন অলৌকিক কাণ্ড, যা পৃথিবীর যাবতীয় নিয়ম-কানুনের ব্যতিক্রমী হয়ে সংঘটিত হয়। যেহেতু অন্য কারও মাধ্যমে মুজিজা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়; তাই আমাদের তার অপেক্ষা করাও অনুচিত।

আমাদের জন্য ধারাবাহিক চেষ্টা করাই মুজিজা। বিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদাবোধই মুজিজার জন্ম দেয়। ইমান এবং আমলই সত্যিকারের মুজিজা। আমরা এই কথাগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে সক্ষম হলে অল্পসময়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে। এত দ্রুতগতিতে যে, আইনস্টাইনের সূত্র দূর থেকে এই গতি তাকিয়ে দেখবে।

Scanned by CamScanner

# ‘পশ্চিমা বিশ্ব সমগ্র ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের কর্তৃত্ব কামনা করে’

সাক্ষাৎকার : **শায়খ মুহাম্মাদ ইসাম**। খতিব, জামে মসজিদে আকসা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : **মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর**।

**জরবে মুমিন :** পাকিস্তানের জনগণ মসজিদে আকসার ইমাম ও খতিব শায়খ মুহাম্মাদ ইসামকে নিজেদের মধ্যে স্বাগত জানাচ্ছে। তারা ফিলিস্তিনের নিজেদের মুসলমান ভাই ও মসজিদে আকসার সংবাদ জানতে উদগ্রীব। পাকিস্তানি জাতি ফিলিস্তিনের সমস্যাকে সর্বদিক বিবেচনায় গুরুত্ব দিতে চায় এবং নিজেদের ফিলিস্তিনি ভাইদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এ কথা স্পষ্ট করতে চায় যে, পাকিস্তানিদের অন্তরাত্মা ফিলিস্তিনিদের সাথে এক সুতোয় গেঁথে আছে। যদিও আমাদের সম্মানিত মেহমান কোনো পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নন, তবুও যেহেতু আজ আমরা তাকে পাকিস্তানি জাতির সাথে পরিচিত করাচ্ছি; তাই অনুগ্রহপূর্বক তিনি যদি নিজের পরিচয় পেশ করেন।

**শায়খ ইসাম :** আমি একজন ফিলিস্তিনি শরণার্থী। আমার নাম মুহাম্মাদ ইসাম। ফিলিস্তিনের সমস্যা ও মসজিদে আকসার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে মুসলিমবিশ্বকে অবহিত করতে বর্তমানে আমি বিদেশ সফরে রয়েছি।

**জরবে মুমিন :** পাকিস্তানের অধিকাংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, আপনি মসজিদে আকসার ইমাম এবং সহকারী পরিচালক। এ ব্যাপারে আপনি আপনার পরিচয়টি স্পষ্ট করুন।

**শায়খ ইসাম :** জি হ্যাঁ! আমি মসজিদে আকসার ইমাম। মসজিদে আকসার সহকারী পরিচালক। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। ইহুদিরা বর্তমানে আমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের বিরোধিতা করে তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে। তাদের কালো আইন ও জায়নবাদী আগ্রাসনের ধারাবাহিকতায় মসজিদে আকসার বর্তমান পরিচালককে দেশ থেকে নির্বাসিত করেছে। যার ফলে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হচ্ছে।

Scanned by CamScanner

**জরবে মুমিন :** ইসলামি বিশ্বের কলামিস্ট ও লেখকদের ইতিহাস ও পরিবর্তিত বিভিন্ন ধাপ নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন। আপনি কি ফিলিস্তিনের অবস্থাসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরবেন?

**শায়খ ইসাম :** ফিলিস্তিন পৃথিবীর একটি পবিত্র ভূমির নাম। যেখানে মহান আল্লাহ অনেক নবির ওপর অহি প্রেরণ করেছিলেন। এই পবিত্র ভূমি ছিল হজরত ইবরাহিম ও হজরত লুত আ.-এর নিবাস। যেমনিভাবে মহান আল্লাহ হজরত ইবরাহিম আ.-কে বায়তুল্লাহর প্রতি দিকনির্দেশ করে তা নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি তাঁকে বায়তুল মাকদিসের দিকনির্দেশ করেছিলেন। যার ফলে তিনি বায়তুল্লাহ নির্মাণ ও সেখানে ইবাদাতের পাশাপাশি মসজিদে আকসায়ও ইবাদাত করেছিলেন। উভয় মসজিদই তাঁর ইবাদাতের স্থান ছিল।

হজরত ইবরাহিম আ.-এর ইনতেকালের পর ফিলিস্তিনের অবস্থা বিবর্তিত হতে থাকে। রোম, পারস্য সম্রাটসহ বিভিন্ন শাসকদের হাতে ফিলিস্তিনের আধিপত্য হাতবদল হতে থাকে। সর্বশেষ মহান আল্লাহ হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে এই ভূমি থেকে মিরাজে ভ্রমণ করান।

যার বর্ণনায় মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেছেন, 'আমি মসজিদে আকসার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বরকতময় করেছি।'[১৮৯] যার স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, ফিলিস্তিনের ভূমি সত্যিকারার্থেই বরকতময় ভূমি। হুজুর ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ ইসলামের শুরুলগ্নে প্রায় ১৭ মাস এই মসজিদে আকসা অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করতেন। তাই এটিই মুসলমানদের প্রথম কিবলা। মিরাজের ঘটনায়ও মসজিদে আকসা বিশেষ অবস্থান ও কেন্দ্রের মর্যাদা রাখে। বিশেষত এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, মিরাজের রজনীতেই নামাজ ফরজ হয়েছিল। অতঃপর ১৫ হিজরিতে এই সম্পূর্ণ ভূমি আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আসে এবং মুসলমানরা মসজিদে আকসা বিজয় করেন।

মসজিদে আকসা বিজয় করে হজরত উমর রা. সেখানের খ্রিষ্টানদের সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তা দেন। বস্তুত তখন সেখানে কোনো ইহুদির নিবাস ছিল না। হজরত উমর রা. তিন শ্রেণির লোকদের জন্য মসজিদে আকসার আশপাশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন।

---

[১৮৯] সুরা ইসরা : আয়াত-১।

Scanned by CamScanner

১। রোমানদের; যারা কিনা ইতোপূর্বে বায়তুল মাকদিস দখল করেছিল। যাদের বাস্তবে পবিত্র ভূমিতে কোনো অধিকার ছিল না। তাই তিনি তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন।

২। চোর-ডাকাতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। কেননা, এটি ছিল পবিত্র ভূমি।

৩। ইহুদিদের জন্য এ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়।

মূলত তখন এই অঞ্চলে কোনো ইহুদির নিবাস ছিল না। পরবর্তী সময়েও কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত মুসলমানরা এই পবিত্র ভূমির হেফাজত করেন।

প্রায় ৭০ বছর পর উমাইয়া শাসকগণ মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ করেন এবং কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণ করেন। মসজিদে আকসার চত্বরে অবস্থিত আয়তাকৃতির একটি পাথরের উপর যা নির্মাণ করা হয়। যে পাথরটি ভূমিপৃষ্ঠ থেকে দেড়মিটার উচ্চতা ও যা ৬০ বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের ছিল। পূর্ববর্তী নবিগণের যুগে কুরবানির পশু জবাই করা ও বিভিন্ন উপলক্ষে মানুষদের এখানে আসা-যাওয়া ছিল। মুসলমানরা এই পাথরের উপর একটি সুদর্শন গম্বুজ নির্মাণ করে, যা আপনারা *জরবে মুমিনের* কভার পৃষ্ঠায় প্রত্যক্ষ করেন।

অতঃপর মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে খ্রিষ্টানরা এই অঞ্চলগুলো দখল করে এবং মুসলমানদের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। যার ফলে তখন মসজিদে আকসায় আশ্রয় নেওয়া প্রায় ৭৫ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

অতঃপর সময়ের পরিবর্তনে মুসলমানগণ সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নেতৃত্বে এ অঞ্চল থেকে খ্রিষ্টানদের বিতাড়িত করে।

অতঃপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলমানরা এই পবিত্র ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ করে। সর্বশেষ ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এ অঞ্চলটি অভিশপ্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হস্তগত হয়। ওই দিন থেকে মসজিদে আকসা দখলের তৃতীয় যুগ আরম্ভ হয়, যার নেতৃত্বে ছিল ইহুদিরা এবং যাদের পেছনে ছিল ইংরেজদের শক্তি।

তখন থেকে ব্রিটেন, আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদিদের এ অঞ্চলে একত্রিত করতে শুরু করে। যারা মুসলমানদের সাথে কোনো ধরনের প্রতিশ্রুতির পরোয়া করেনি। তারা মুসলমানদের এলাকাসমূহ থেকে স্থানীয় জনগণকে অন্যায়ভাবে উৎখাত করে জবরদখলের মাধ্যমে নিজেদের রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়।

Scanned by CamScanner

**জরবে মুমিন :** আপনার কথার অর্থ হচ্ছে, ইহুদিরা নিজেদের শক্তির বলে নয়; বরং আমেরিকা ও পশ্চিমারা ইহুদিদের এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করেছে?

**শায়খ ইসাম :** জি হ্যাঁ, ফিলিস্তিনভূমি অতীতে উসমানি খিলাফাতের অংশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানি খিলাফাতের পতনের পর ইংরেজ ও তাদের দোসররা এ অঞ্চলে আগমন করে। ইহুদিদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী এ অঞ্চলে একটি জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদিদের এ অঞ্চলে এনে জড়ো করতে শুরু করে। অতঃপর তারা এ অঞ্চলে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা করে। যার ফলে প্রায় ৪ মিলিয়ন স্থানীয় ফিলিস্তিনের[১৯০] নাগরিকদের নির্বাসিত হতে হয়, যারা আরব রাষ্ট্রগুলোসহ ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। গাজা ও পশ্চিম তীর এ দুটি অঞ্চল ইহুদিদের আওতামুক্ত থাকায় ফিলিস্তিনের নাগরিকদের সে অঞ্চলে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের সামান্য আশা তখনো বেঁচে ছিল। কিন্তু জাতিসংঘ বা অন্য কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও কর্মসূচি সত্ত্বেও ফিলিস্তিনিরা আজ পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা করতে পারেনি। সেসব প্রস্তাবনা শুধু কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন কাশ্মির সমস্যা আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রস্তাবনা সত্ত্বেও সমাধান হয়নি। ঠিক যেমনিভাবে জাতিসংঘ বিভিন্ন প্রস্তাবনার আওতায় কাশ্মিরের স্বাধীনতার অধিকার দিয়ে রেখেছে; যা কোনোভাবেই আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ কাশ্মিরের ব্যাপারে তারাই ভারতীয়দের সব ধরনের অধিকার বাস্তবে দিয়ে রেখেছে। ঠিক তেমনিভাবে ফিলিস্তিনিদের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা পেশ করা হলেও বাস্তবিক অর্থে সেখানে ইসরাইলিদের অধিকারই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

**জরবে মুমিন :** যে দুটি অঞ্চল এখনো ইহুদিদের হস্তগত হয়নি, সেখানে কেন এখনো ইহুদিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি? তারা সেখানে পরাজিত হচ্ছে নাকি অঞ্চলগুলো দখল করতে আগ্রহী নয়?

**শায়খ ইসাম :** বাস্তবে পশ্চিমারা পুরো ফিলিস্তিনে ইহুদিদের কতৃত্ব দেখতে চায়। কিন্তু ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে গাজা এবং পশ্চিম তীর পর্যন্ত নিজেদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। তন্মধ্যে গাজা শহরটি, যার আয়তন মাত্র ৩৬০ বর্গকিলোমিটার। যেখানে প্রায় ১ লাখ লোক বিভিন্ন শহর থেকে এসে একত্রিত হয়ে বসবাস করতো। তাই তারা জনবহুল এই অঞ্চলটিকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে ঝামেলা

---

[১৯০] তখন ফিলিস্তিনের মোট নাগরিক ছিল ৭ মিলিয়ন।

Scanned by CamScanner

বাড়াতে চায়নি। অন্যদিকে পশ্চিম তীর অঞ্চলটি ছিল পাহাড়বেষ্টিত এবং সেখানের জনসংখ্যাও প্রায় ১ লাখ ছিল। কিন্তু ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিরা এ দুটি অঞ্চলকেও; সেখানে নিযুক্ত মিসরীয় ও জর্দানি বাহিনীকে সরিয়ে দিয়ে দখল করে নেয়। তখন থেকেই; বরং ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই স্থানীয় ফিলিস্তিনিরা একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোনো আরব দেশ বা জাতিসংঘও তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। বাধ্য হয়ে ফিলিস্তিনি জাতি নিজেরাই বিপ্লবের ডাক দেয়। এই বিপ্লবের ডাক বাস্তবায়ন করে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ইনতিফাদা শুরু হয়, যা সাত বছর দীর্ঘায়িত ছিল। যে সাত বছরে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলকে ফিলিস্তিন দখলের তিক্ত স্বাদ বুঝিয়ে দিয়েছিল। যার ফলে বাধ্য হয়েই আমেরিকা প্রতিবেশী আরব দেশসমূহকে শান্তি কমিশন গঠনে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। যে কমিশন ফিলিস্তিনিদের সহযোগিতা এবং তাদের দাবি আদায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত এই শান্তি কমিশনের বৈঠকের বাস্তবতা কী ছিল? বাস্তবিকই ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এ কমিশন বানানো হয়েছিল? অবশ্যই না; বরং ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ইসরাইলিদের বাঁচানোর জন্য এই শান্তি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। যে বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয় যে, ফিলিস্তিনিদের কিছু না কিছু দেওয়া হবে এবং তাদের কিছু ব্যক্তিবর্গকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। কিন্তু তা অত্যন্ত হাস্যকর প্রমাণিত হয়েছিল এ জন্য যে, সেই ফিলিস্তিনি হুকুমত এবং তার কার্যনির্বাহীরা প্রকারান্তরে আত্মঘাতী হামলাকারীদের হাঁত থেকে ইহুদিদের নিরাপত্তা-দেয়াল প্রমাণিত হয়েছিল। কেননা, ওরা ফিলিস্তিনের মুজাহিদ ও আত্মঘাতী হামলাকারীদের ওপর কঠিন দৃষ্টি রেখে ইহুদিদের সহযোগিতা করতো। ঠিক যেমনিভাবে কাশ্মিরি কিছু নামসর্বস্ব মুসলমান ভারত সরকারের সাথে আঁতাত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের ব্যবহৃত করে। যেভাবে আফগানিস্তানের কিছু গাদ্দার আমেরিকার সাথে মিলে তালেবানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে।

সারকথা, তারা ফিলিস্তিনেও একটি কারজাই সরকার গঠন করেছিল। তাদের উপর কারজাইরূপে একজন ইয়াসির আরাফাতকে নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যারা আল্লাহর পথের মুজাহিদ, তারা না ইসরাইলের আইনকে ভয় পায়, না নামসর্বস্ব সরকারপ্রধান ইয়াসির আরাফাতের আইন-কানুনের তোয়াক্কা করে। যার ফলে আমেরিকার সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় তারা ইয়াসির আরাফাতকে পরিবর্তন অথবা তাঁর পরিবর্তে তাঁর চেয়েও বড় গাদ্দার

Scanned by CamScanner

আবু মাজেন তথা মাহমুদ আব্বাসকে ক্ষমতায় আনতে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে। তাই তারা মাহমুদ আব্বাসের জন্য এমন একটি সরকার তৈরি করে, যারা তাদের স্বার্থ বাস্তবায়ন করবে এবং মুজাহিদদের তাঁদের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখবে।

**জরবে মুমিন :** মিডিয়ায় নিরাপত্তা দেয়াল নিয়ে বিভিন্ন লেখালেখি হয়। এর বাস্তবতা কী এবং ইসরাইলি বাহিনী কেন এর আশ্রয় নেয়?

**শায়খ ইসাম :** পশ্চিম তীর এবং গাজায় জিহাদি তৎপরতা বেশি থাকায় ইহুদিরা চিন্তা করেছে, জর্দান সীমান্ত থেকে একটি নিরাপত্তা দেয়াল তৈরি করার। যার মাধ্যমে পশ্চিম তীরকে মূলত একটি বৃহৎ কারাগারে পরিণত করা সম্ভব। যার ফলে ইহুদিরা সারাদেশে নিরাপদে চলাচল করতে পারবে এবং মুজাহিদরা সিরিয়া, জর্দান বা ফিলিস্তিনের কোথাও বের হতে পারবে না। এই হচ্ছে নিরাপত্তা দেয়াল বা সীমান্ত দেয়ালের তাৎপর্য। অন্যদিকে গাজাকে কেন্দ্র করে তারা এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা নেয়নি, যেহেতু তার একপাশে মিসরের সীমান্ত অবস্থিত; যেখানে ইসরাইলি বাহিনীর ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে সাগর এবং বাকি দিকগুলোতে ব্যাপক পরিমাণে ইসরাইলি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, যারা তাদের যেকোনো ধরনের কর্মতৎপরতা রুখে দিতে পারবে। নিরাপত্তা দেয়ালের নামে এই বিশাল কারাগার নির্মাণের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। বাধ্য হয়ে আমেরিকাও এ ব্যাপারে নিন্দা জ্ঞাপন করে। যদিও বাস্তবে এ নির্মাণকাজের ব্যয় অধিকাংশ তারাই সরবরাহ করে।

**জরবে মুমিন :** কেউ কেউ আপত্তি তোলেন যে, ইহুদিদের ওপর মুসলমানদের এ আক্রমণের ফলে ইহুদিরা ব্যাপকভাবে তাদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে, যার ফলে নারী-শিশুসহ মুসলমানরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে তো মূলত মুসলমানরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

**শায়খ ইসাম :** এ কথা দ্বারা যদিও ফিলিস্তিনিদের সহমর্মিতা প্রকাশ পায়; কিন্তু কাশ্মির-চেচনিয়াসহ অন্যান্য যেসব স্থানে এ ধরনের হামলা পরিচালিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে এ আপত্তিকারীদের মন্তব্য কী? আফগানিস্তানে মুজাহিদরা তো নিজেদের কর্মতৎপরতা বন্ধ করেছে; কিন্তু আমেরিকা কি বোমাবর্ষণ বন্ধ করেছে? কিছুদিন পূর্বেই আমেরিকা আফগানিস্তানে জনবসতিতে বোমা হামলা করে ৬ জন শিশুসহ ১৬ জন নিরাপরাধ বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তারা কি মুজাহিদ ছিল? মূলত শত্রুরা বোমাবর্ষণ করতেই থাকবে, চাই মুজাহিদরা

Scanned by CamScanner

কিছু করুক বা না করুক। হয়তো আপনারা শুনেননি যে, ফিলিস্তিনিরা ৫০ দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি দিয়েছিল; কিন্তু সেই ৫০ দিনে ইহুদিরা নিজেদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে বিরত থাকেনি; বরং এই যুদ্ধবিরতিকালীন সময়ে তারা অত্যাচারের নিজেদের পুরাতন রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল। এই আপত্তিকারীগণ কখনো ইয়াসির আরাফাত কতৃক ফিলিস্তিনিদের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার আপত্তি করেননি। একটু ভাবো তাহলে কে আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবে? কে বিশ্ববাসীকে ফিলিস্তিনের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করবে? ইনতিফাদার পূর্বে বিশ্ববাসী ফিলিস্তিনের সমস্যা সম্পর্কে কিছুই জানত না।

**জরবে মুমিন :** আমেরিকা কর্তৃক ইরাক দখলে ফিলিস্তিন সমস্যার কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে কি না? ইরাক সমস্যার ফলে বিশ্ববাসী ফিলিস্তিনের সমস্যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে কি না? নাকি এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে আরবদের মধ্যে চেতনার জাগরণ হচ্ছে?

**শায়খ ইসাম :** মুসলিম উম্মাহ তাদের এই শাসকদের উপস্থিতিতে কখনো জাগ্রত হবে না; বরং আপনি নিশ্চিত থাকুন, শাসকদের উপস্থিতিতে কোনোভাবেই তাদের চেতনাবোধ জাগ্রত হবে না। যখন ওই চেতনার জাগরণের কোনো সম্ভাবনা দেখা দেবে এই শাসকেরা তাদেরকে পুনরায় ঘুমের ওষুধ প্রয়োগে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

ইরাক সমস্যার একটি ইতিবাচক দিক এই যে, মুসলমানদের জিহাদের একটি নতুন ফ্রন্ট তৈরি হয়েছে। মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রকারী মার্কিনীরা এখন নিজেরাই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়েছে। দ্বিতীয় ইতিবাচক দিক হচ্ছে, মার্কিনীরা ইরাকের উপর চেপে বসায় অবচেতন ইরাকিদের চেতনার উদয় হয়েছে। আপনি হয়তো লক্ষ্য করবেন, ইদানীং ইরাকিরাও সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করেছে। হয়তো ইরাকি ও ফিলিস্তিনিদের এই জাগরণ সমগ্র আরববিশ্বকে জাগিয়ে দেবে, যার ফলে তাঁরা আত্মমর্যাদাবোধ ও ধর্মীয়ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। এসব ছিল ইরাক হামলার ইতিবাচক দিক।

অন্যদিকে এই হামলার নেতিবাচক দিকটি হচ্ছে, এতে করে ইসরাইলের দুঃসাহস বহুগুণে বেড়ে যাওয়ায় তারা নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয় নেতিবাচক দিক হচ্ছে, এতদিন আরব শাসকরা আমেরিকার ভয়ে কম্পমান ছিল; কিন্তু ইরাকে ঘাটি করার মাধ্যমে আমেরিকার যেহেতু তাদের আরও নিকটবর্তী হয়েছে, যার ফলে তাদের ভীতির মাত্রা আরও বেড়ে

Scanned by CamScanner

যাবে। এতদিন হয়তো আমেরিকার আদেশে তারা কাজ করতো, এখন থেকে আমেরিকার ইঙ্গিতই যথেষ্ট হবে। কিন্তু এ নেতিবাচক দিকগুলো সত্ত্বেও আরও একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। আমেরিকা অতি দ্রুত একে একে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ দখল করে যাচ্ছিল। প্রথমে ফিলিস্তিন অতঃপর আফগানিস্তান ও ইরাক। হয়তো পরবর্তী ধাপে ইরান-পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল। কিন্তু আফগানিস্তান ও ইরাকে তারা এমনভাবে ফেঁসে গেছে, যার কারণে সামনে এগোতে পারছে না। যার ফলে আমেরিকার অবস্থা এখন কাদায় আটকে যাওয়া গাড়ির মতো হয়ে গেছে।

**জরবে মুমিন :** মুসলমানরা এখন ফিলিস্তিনের সমস্যাকে অত্যন্ত গম্ভীরতার সাথে বিবেচনা করছেন, যেহেতু তাদের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের জন্য একধরনের চেতনা কাজ করে। যেহেতু ফিলিস্তিন মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তারা ইসরাইল কতৃক ফিলিস্তিনের আগ্রাসনকে শুধু ভৌগোলিক আগ্রাসনের দৃষ্টিতে না দেখে ধর্মের বিরুদ্ধে ইহুদিদের আগ্রাসন হিসেবে বিবেচনা করে। এই মুহূর্তে আপনি ফিলিস্তিন সমস্যার মুখপাত্র হিসেবে মুসলমানদের কি উপদেশ দেবেন? কোন্‌দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান? যার মাধ্যমে তারা পরিপূর্ণ নিশ্চিত হয়ে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কাজ করতে পারে।

**শায়খ ইসাম :** সর্বপ্রথম আমি ফিলিস্তিনের প্রশাসন ও বিভিন্ন দেশে তাদের নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের নিন্দা করছি। ইসলামি ও অনৈসলামিক বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হয়েও তারা ফিলিস্তিনের পক্ষে কী করছে? পাকিস্তানে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত কী দায়িত্ব পালন করছেন? ফিলিস্তিনের সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ফিলিস্তিনিদের পক্ষ হয়ে তিনি কোনো সেমিনার আয়োজন করেছিলেন কি না? যেহেতু তাদের প্রশাসন গাদ্দার ধোঁকাবাজ, সেহেতু তারাও এমনি হবেন। ফিলিস্তিনের সমস্যা তাদের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়; বরং ফিলিস্তিনিদের জন্য একত্রিত করা ধনসম্পদ থেকে নিজেদের ধনভান্ডার বৃদ্ধি করাই তাদের মূল লক্ষ্য। ভারতে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত ইসরাইলের পক্ষ হয়ে কাজ করছে, যে হিন্দুদেরকে ইসরাইলের সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যান্য আরব দেশসমূহেও যেসব ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত রয়েছেন, তারা নিজেদের দেশের জন্য কিছু করছেন না। অথচ তাদের উচিত ছিল প্রতিদিন না-হোক কমপক্ষে সপ্তাহে একবার হলেও প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে স্বজাতির অধিকার এবং জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের আহ্বান

Scanned by CamScanner

করা।[১৯১] একজন রাষ্ট্রদূতের জন্য হয়তো জিহাদে শরিক হওয়া কঠিন; কিন্তু একজন মুসলমান যুবকের জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া দুঃসাধ্য নয়। তারা সে যুদ্ধে স্বাচ্ছন্দে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

মুজাহিদদের সফলতার সংবাদ প্রচার করাও একধরনের জিহাদ। মুসলমানদের একতা ও পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তিও ফিলিস্তিনিদের মনোবল বৃদ্ধি করে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও বৈঠকে ফিলিস্তিনের সাথে একাত্মতা পোষণ এবং মুজাহিদদের পক্ষে কথা বলা তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

যেসব যুবকের রক্তে জিহাদি জজবা রয়েছে, যারা ফিলিস্তিনকে ভালোবাসে তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব, তারা যেন আল্লাহর দরবারে আমাদের মধ্যকার গাদ্দার-বেইমানদের ধ্বংসের দুআ করে। আমরা তাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আমরা আমাদের ভূমির এই যুদ্ধকে আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চালিয়ে যেতে চাই। মহান আল্লাহও হয়তো এই যুদ্ধের স্থায়িত্ব চান। যার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, পৃথিবীর সবচে বেশি পুরুষ শিশুর জন্মহার এই ফিলিস্তিনেই। যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমাদের শহিদদের স্থলাভিষিক্ত মুজাহিদ দান করেন। যা এই যুদ্ধে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সর্বশেষ *জরবে মুমিন* পত্রিকার উদ্যোগে ফিলিস্তিনের সংবাদ প্রচার করে তাদের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগকে মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

---

[১৯১] হয়তো একজন রাষ্ট্রদূতের জন্য এ কাজ করা অত্যন্ত কঠিন এবং দুঃসাধ্য।

Scanned by CamScanner

# ইসলামি বিশ্বের সামনে নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ

এ পৃথিবীতে পরিবর্তনটিই একমাত্র স্থায়িত্বশীল। প্রতিটি আগত সময় নতুন নতুন চাহিদা সামনে নিয়ে আসছে। পৃথিবী এখন এতটাই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়েছে যে, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিন মানুষের সামনে নতুন নতুন চাহিদা উপস্থাপন করছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী যুগের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতার সমন্বয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে মনোনিবিষ্ট হওয়া ছাড়া বর্তমান এ প্রযুক্তির যুগে সফল হওয়া সম্ভব নয়। নতুন শতাব্দী আমাদের কাছে দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সুন্দর আচরণের প্রত্যাশা করে। যেহেতু বর্তমান বিশ্ব কুফুরি বস্তুবাদী উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছে, তাই মুসলমানদের সম্মান, প্রতিপত্তি রক্ষা করে উন্নতির জন্য কঠিন পরিশ্রম ও দৃঢ় ইচ্ছা প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহের এমন যোগ্যতাসম্পন্ন মেধাবী যুবকের অভাব নেই; যারা নিজেদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী ও কুফুরকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবনের সঠিক লক্ষ্য ও সঠিক কর্মপদ্ধতির দিকনির্দেশনা না থাকায় যোগ্যতা ও মেধা যথাস্থানে ব্যয় হচ্ছে না। বস্তুবাদী, ভোগবাদী, ঐশী শিক্ষা, আল্লাহর দয়া, ইমানের আলো থেকে বঞ্চিত কুফুরি শক্তির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ নতুন শতকের আনন্দ উদযাপন করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা ইসলামের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই এবং মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে উপযুক্ত সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অপেক্ষা করছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, এই শতকে ইসলাম ও কুফুরের সেই মহা দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করবে। এ জন্য সকল মুসলমানের আল্লাহমুখী হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। নতুন শতাব্দীতে মুসলমানদের সামনে আসা চ্যালেঞ্জগুলোর মৌলিক কয়েকটি নিম্নরূপ। তাই প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

Scanned by CamScanner

## ১. খিলাফাত পুনর্জীবিতকরণ

খিলাফাতসমৃদ্ধ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এমন একটি মৌলিক কাজ, যা ব্যতীত পৃথিবীর মুসলমানরা অসহায় থাকবে। খিলাফাত শাসনব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমাদের অবস্থা সেই কর্তিত ঘুড়ির মতো হয়েছে, যার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রত্যেকেই নিজের অধিকার মনে করে।

খিলাফাত শাসনব্যবস্থা এমন একটি প্রতিষ্ঠান, মুসলমানদের একাত্মতার প্রতীক, যা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। বিশ্বের কুফুরি শক্তি বিশেষ করে ইহুদিদের কর্তৃক মুসলমানদের এই পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের পর মুসলমানরা অসহায় হয়ে পড়ছে। যেন কেউ তাদের কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের দস্তরখানে এনে দিয়েছে অথবা দুষ্ট কোনো পর্যবেক্ষকের হাতে ন্যস্ত করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি জাতি-গোত্র-ধর্মের মানুষদের স্বার্থের পক্ষে আওয়াজ ওঠানোর কেউ না কেউ আছে। কিন্তু মুসলমানরাই একমাত্র এমন, যাদের পাশে দাঁড়ানোর, তাদের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া বা তাদের ওপর অত্যাচার হতে দেখে প্রতিবাদ করার কেউ নেই। আর তা এ জন্য যে, তাদের ওপর খিলাফাতের ছায়া ও আমিরুল মুমিনিনের সহানুভূতি গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ১৯২২৪ খ্রিষ্টাব্দে সরে গিয়েছিল। তারপর থেকে মুসলমানরা এমন সিংহশাবকে পরিণত হয়েছে, যারা রাতের আঁধারে মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হায়েনার মুখে পতিত হয়েছে।

হে গৌরবময় পূর্বসূরিদের সন্তানেরা, এই বরকতময় শাসনব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমকে নিশ্চিত করো। ইসলামি সাম্রাজ্যের উন্নতি ও দৃঢ় রাখার চেষ্টা করো। সম্মান ও মর্যাদা পুনরায় ফিরে পাবে।

## ২. ইসলামি আইনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

খিলাফাত শাসনব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর মুসলমানদের সর্বপ্রথম যে বিপদ চেপেছিল তা ছিল ঐশীবাণী কর্তৃক নির্ধারিত আইনব্যবস্থার পরিবর্তে ইবলিসি নীতিমালার বিচারব্যবস্থা। অবস্থা এ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, বাদী-বিবাদী, বিচারক, সাক্ষী সবাই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালিত হয় ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রবর্তিত নীতিমালার আলোকে। ইসলামি খিলাফাতের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি পৃথিবীতে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা।

Scanned by CamScanner

খিলাফাতের এই মহান শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কুফুরি শক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে আর কোনো বাধা বাকি থাকেনি। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোতেও আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে নয়; বরং আল্লাহর দরবার হতে অভিশপ্ত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের আইনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। শরিয়তসম্মত জীবনব্যবস্থা সবাই অবলম্বন করতে চাইলেও কীভাবে তাদের ওপর কুফুরি জীবনব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার প্রতি কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, এ সবকিছুই হচ্ছে ইসলাম প্রদর্শিত খিলাফাত শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পরিণাম। উলামায়ে কিরাম যেভাবে ফাতওয়ার ব্যবস্থা চালু রেখেছেন, তা শুধু ব্যক্তিজীবনে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ। দীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেভাবে দারুল ইফতা চালু রয়েছে, ঠিক সেভাবেই দারুল কাজা তথা ইসলামি বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করাও জরুরি।

কী আশ্চর্য! প্রত্যেকেই আল্লাহর বিধানমতে চলতে চায়; কিন্তু পুরো দেশে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের একটি আদালতও নেই। ইসলামে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে আমাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে গেল? সরকার কর্তৃক হয়তো ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে না; কিন্তু এ শাসনব্যবস্থার প্রতিবাদ না করে কেন আমরা নিজেদের জন্য শরিয়তসিদ্ধ আদালত প্রতিষ্ঠা করছি না?

### ৩. হারামাইন শরিফাইন থেকে অমুসলিম সৈন্যদের বহিষ্কার

আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স মুসলমানদের এ তিনটি বড় শত্রু গত দশকে বিভিন্ন কৌশলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের পবিত্র ভূমিতে আস্তানা গেড়েছে। মুসলমানদের জন্য রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর পর এটি দ্বিতীয় সবচে হৃদয়বিদারক ও ভয়ংকর ঘটনা। শত্রুরা এ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করেছে এর জন্যই শুধু দুঃখ নয়; বরং দুঃখের বড় কারণ হচ্ছে, এই মহাবিপদ থেকে উম্মাতে মুসলিমার অচেতন থাকা। সচেতন ব্যক্তিরা এ বিপদ সম্পর্কে চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করছেন; কিন্তু ইসলামের সেনানীরা এ চিৎকারে কর্ণপাত করতে রাজি নন।

যদি কোনো মসজিদের কিবলা সম্পর্কে সংবাদ জানা যায় যে, মসজিদের মিহরাব সঠিক কিবলার দিকে অবস্থিত নয়। যদিও কিবলা থেকে সামান্য বিচ্যুতি নামাজের জন্য ক্ষতির কারণ নয়; তবু অধিকাংশ নামাজি এ ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। অথচ বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববি ও ইসলামের

Scanned by CamScanner

স্মৃতিচিহ্নগুলোতে আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুবাহিনী উপনীত হয়েছে। এদিকে বিশ্বব্যাপী সোয়াশ কোটি মুসলমান আজও তাদের নিজেদের বন্ধু ও অভিভাবক মনে করে।

মুসলমানরা কীভাবে নিজেদের সম্মানিত ও প্রিয় এই ভূমিসমূহের হেফাজত করবে, জিহাদ ও কিতালের ঐশী বিধান ও নববি পদ্ধতি অবলম্বন করে একইভাবে এই শত্রুদের দারুল কুফুরের দিকে তাড়িয়ে দেবে—তা হচ্ছে এই শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ। যা অচিরেই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে সবার সামনে উদ্ভাসিত হবে।

হে বায়তুল্লাহর মুহাফিজরা, যারা পবিত্র ভূমির পবিত্রতার শপথ করো! তোমরা কি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছ? অবশ্যম্ভাবী এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো?

### ৪. মসজিদে আকসা ও বাবরি মসজিদের মুক্তি

কর্ডোভার মসজিদ মুসলমানদের হাতছাড়া হওয়ার বেশি দিন হয়নি। মসজিদে আকসার আর্তনাদ মুসলমানদের শুনতে হচ্ছে। মসজিদে আকসার আর্তনাদ শোনার কিছুদিনের মধ্যেই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে হয়েছে। কর্ডোভার মসজিদের আর্তনাদ কানে আসা সত্ত্বেও আমরা জাগতিক ভোগ-বিলাসে এতটাই লিপ্ত থেকেছি যে, দেখতে দেখতে কাফিরদের অপবিত্র সত্তা মসজিদে আকসার আঙিনায় এসে পৌঁছেছে। মসজিদে আকসার সুদর্শন গম্বুজ আমাদের অনুভূতিহীনতার শোকগাথা গাইতে ছিল; এর মধ্যেই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সংবাদ আসে। আল্লাহর শত্রুদের যদি এখনো থামিয়ে দেওয়া না যায়, তাহলে আল্লাহই ভালো জানেন আর কত সর্বনাশ আমাদের দেখতে হবে। স্পেনের খ্রিষ্টান, ইসরাইলের ইহুদি ও ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেনি। এখন মুসলমানদের পালা—তারা এই চ্যালেঞ্জের উত্তর কীভাবে দেবে?

হে কর্ডোভার মিনার, আমরা তোমাকে সাক্ষী বানিয়ে মহান প্রভুর কাছে শপথ করছি, আমরা তোমার আঙিনায় তাকবিরের গুঞ্জন অবশ্যই ফিরিয়ে দেবো।

হে মসজিদে আকসার সোনালি গম্বুজ, আমরা তোমার মর্যাদা ও সম্মানের হেফাজত নিজের সর্বশেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও করব।

Scanned by CamScanner

হে বাবরি মসজিদ, তোমার বিচ্ছিন্ন প্রতিটি ইট যে পর্যন্ত স্বস্থানে পুনঃস্থাপিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ জীবন আমাদের জন্য বোঝাস্বরূপ।

তোমার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া মিম্বর থেকে উচ্চারিত সত্য বাণীর শপথ! তুমি দেখবে, কীভাবে তোমার সন্তানেরা তোমার হত্যার প্রতিশোধ নেয়।

হে মুসলমান যুবকেরা! আত্মমর্যাদাহীনতার অভিযোগ নিয়ে কতদিন আর চলবে। এবার ওঠো। ইমান ও বিশ্বাসের এক নতুন সফরে বেরিয়ে পড়ো; যার প্রারম্ভিকা বাবরি মসজিদের পুনঃস্থাপন এবং সমাপ্তি মসজিদে আকসা ও কর্ডোভার মসজিদের বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

## ৫. দখলকৃত মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের বিজয়

মুসলমানদের অধিকৃত যেকোনো ভূখণ্ড কাফিরদের হস্তগত হলে তার প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা মুক্ত করা ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিধান। যার অবহেলা করা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। দুঃখের বিষয়, আমাদের এমন আত্মমর্যাদাবোধ বেঁচে নেই, যার কারণে ইসলামি ভূখণ্ডকে উদ্ধার করতে না পারা আমাদের লজ্জার কারণ হতো। আশ্চর্যের বিষয়, অপবিত্র মাটি দিয়ে বানানো মূর্তিপূজক হিন্দু বেনিয়ারা অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে বিভোর। অথচ তাদের অতীত লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের ইতিহাসে পরিপূর্ণ। অন্যদিকে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সোনালি অতীতের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও আমরা অখণ্ড পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখছি না। কন্যাকুমারী থেকে খাইবার পর্যন্ত, মালাবারের সমুদ্র উপকূল থেকে হিমালয় পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভূমি কি কখনো মুসলমানদের ছিল না? যেখানে পুরো ভারত উপমহাদেশ মুসলমানদের ছিল, সেখানে আমরা কেন শুধু কাশ্মির নিয়ে আলোচনা করব? কাশ্মির থেকে দিল্লি পর্যন্ত, গজনি থেকে গাজা পর্যন্ত প্রতিটি ভূমি মুক্ত করা আমাদের দায়িত্ব। যে ভূখণ্ড এক মুহূর্তের জন্য ইসলামি শাসনের আওতায় ছিল, তার একটি ইঞ্চিও যদি হিন্দুদের হস্তগত থাকে, তাহলে আমারা দায়িত্বমুক্ত হব না। যে ব্যাপারে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কিয়ামাতের দিনে উত্তর দিতে হবে। আর এই সকল ভূখণ্ডকে বিজয় করাই হচ্ছে এই শতাব্দীর বড় চ্যালেঞ্জ।

Scanned by CamScanner

# তরবারির ছায়ায়

ইসলামপ্রিয় ভাইয়েরা! নতুন শতাব্দী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদের সামনে উপনীত হয়েছে। যেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমাদের একমাত্র করণীয় হচ্ছে, পবিত্রতা ও তাকওয়ার মাধ্যমে আমাদের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক অপবিত্রতা দূর করা। আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদাতের মাধ্যমে নিজেদের শোভিত করা। আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের গুণাবলি অর্জন করে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জিহাদ ও কিতালের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া। নিজেদের মনে এই কথা ভালোভাবে গেঁথে নেওয়া উচিত, আমাদের বিজয় একমাত্র তরবারির ছায়ায় সম্ভব।

Scanned by CamScanner

# বই পরিচিতি

আল আকসা। আল্লাহ তাআলার সম্মানিত ঘর। নবিগণের ইবাদতধন্য এবং স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক স্থাপনা। ইসলামি ঐতিহ্যের স্মারক। মুসলমানদের প্রথম কিবলা। সেই আকসা আজ কাতরস্বরে কাঁদছে। ইহুদিরা আকসাকে ধ্বংস করে সেখানে সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের কল্পিত মুক্তিদূত দাজ্জালের আগমনের। আল আকসার বিনাশ এবং সুলায়মানি কাঠামোর বিনির্মাণ যার প্রস্তুতিরই অংশ। তারা সগর্বে এর জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, নিয়মতান্ত্রিক মহড়া দিচ্ছে।

আল আকসা আজ মুসলমানদের হাতছাড়া হওয়ার পথে। অথচ এই আল আকসার সঙ্গেই মুসলমানদের ভাগ্য জড়িত। শেষ জামানায় একে কেন্দ্র করেই ঘটবে বড় বড় অনেকগুলো ঘটনা। শেষাবধি খিলাফাতের পতাকাও স্থাপিত হবে এই 'ইলিয়া' অঞ্চলেই।

ফিলিস্তিনিরা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে এই পবিত্র ঘরকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে। তাই তারা ইটের জবাবে পাটকেল এবং বুলেটের জবাবে পাথর-গুলতি হাতেই সম্মিলিত প্রতিরোধের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

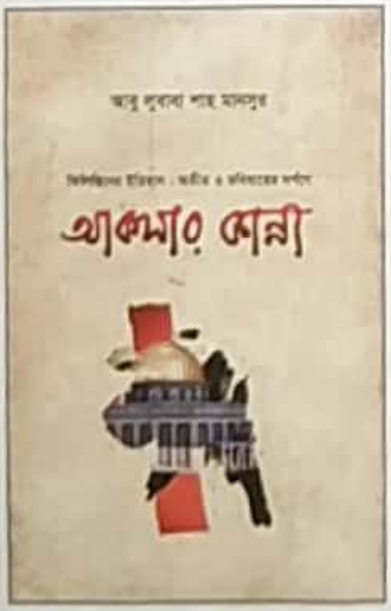
এদিকে মুসলমানরা আজ আরাম-আয়েশে বিভোর। খোদ হারামাইনই আজ হুমকির মুখে। সারাবিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর নেতৃত্বের আসনে চেপে আছে কুফফার গোষ্ঠীর ক্রীড়নকরা—খোদ তাগুত কিংবা তাগুতের দোসররা। তাদের অবাধ প্রচার-প্রচারণায় সিংহের জাতি মুসলিমদের চেতনা মিইয়ে গিয়ে পরিণত হয়েছে ভীতু শেয়ালে।

*আকসার কান্না* বইয়ে উঠে এসেছে বাইতুল মাকদিস এবং ফিলিস্তিনের ইতিহাস। উঠে এসেছে ইহুদিদের ভয়াবহ পরিকল্পনাগুলোর কথা; মুসলিম জাতির নেতৃত্বশূন্য অবস্থা এবং চরম হতভাগ্যের কথা। একটি বই যেন একটি ছোটখাটো এনসাইক্লোপিডিয়া। সচেতন-অচেতন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফিতনার এই যুগে এ বইটি অবশ্যপাঠ্য হওয়ার দাবি রাখে। আশা করি, বইটি মুসলিম তরুণ-যুবাদের আলস্যের চাদর ছুড়ে, নিদ্রার আড়মোড় ভেঙে পুনরায় জেগে উঠতে অনুপ্রাণিত করবে। পর্দার আড়াল সরিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরবে শিহরণজাগানিয়া সব অধ্যায়।

**আলী হাসান উসামা**
নির্বাহী সম্পাদক
কালান্তর প্রকাশনী

Kalantor Prokashoni

9 789849 047278




**AQSAR KANNA**
by **Abu Lubabah Shah Mansoor**
Translated by **Mohiuddin Qasemi**
Edited by **Abul Kalam Azad**
Kalantor Prokashoni
BD ৳ 360, US $ 16, UK £ 11
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
facebook.com/kalantorprokashoni
অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফি লাইফ, নিরালা
বইপার্ক, রেনেসাঁ

Scanned by CamScanner

আবু লুবাবা শাহ মানসুর

ফিলিস্তিনের ইতিহাস : অতীত ও ভবিষ্যতের দর্পণে

# আকসার কান্না



Scanned by CamScanner